এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য

স্বাধীনতার প্রথম দশক

স্বাধীনতোত্তর আমাদের সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থান ইত্যাদি নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত সেনা-কর্মকর্তাদের কেউ কেউ ইতোমধ্যে স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু সে-সব গ্রন্থের সঙ্গে মেজর জেনারেল (অবঃ) মইনুল হোসেন চৌধুরীর এ-বইটির তফাত হলো পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলোর যাঁরা লেখক তাঁদের প্রায় সকলেই ঘটনাপ্রবাহের হয় ভিকটিম নয় বেনিফিসিয়ারি। তাঁদের সে অবস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের রচনায়, কমবেশি, ঘটেছে। অন্যপক্ষে একজন দায়িত্বশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ, আইনানুগ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ সেনা-কর্মকর্তা হিসেবে লেখক শেষদিন পর্যন্ত পক্ষপাতহীনভাবে তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থেকেছেন। আর এই দায়িত্ব পালনের সূত্রেই খুব কাছ থেকে সবকিছুকে দেখার, উপলব্ধি করবার সুযোগ তাঁর হয়েছে। সময়ের উচিত দূরত্বে দাঁড়িয়ে নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে সে দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেছেন লেখক তাঁর *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক* গ্রন্থটিতে।

একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জাতীয় স্বার্থ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েও লেখক ঘটনার মূল্যায়নে তাঁর দৃষ্টিকে দেখেছেন অনাচ্ছন্ন, দায়বদ্ধ থেকেছেন ইতিহাসের প্রতি।

এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই রচনাটি যখন ধারাবাহিকভাবে একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই তা সবার আগ্রহ ও মনোযোগ আকর্ষণ করে। স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক চালচিত্র বুঝতেও বইটি পাঠকদের সহায়তা করবে বলে আমাদের ধারণা।

ISBN 984 410 175 1

মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী ১৯৪৩ সালে সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯৬৪ সালে নিয়মিত কমিশন লাভ করে পদাতিক ব্যাটালিয়নে নিয়োজিত হন। ১৯৬৫ সালে তিনি পাক-ভারত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং আজাদ কাশ্মীর সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি মেজর হিসেবে পদোন্নতি পান। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে জয়দেবপুর হইতে ২য় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সক্রিয় ভূমিকা নেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি ১ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক হিসেবে সম্মুখ সমরে নেতৃত্ব দেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অনন্য সাহসিকতার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীর-বিক্রম খেতাবে ভূষিত করেন।
১৯৭২-৭৩ সালে তিনি ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক, রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, ঢাকাস্থ ৪৬ ব্রিগেড ও লগ এরিয়ার অধিনায়ক এবং এডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের শেষদিকে তাঁকে লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশনে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা করা হয়। ১৯৭৭ সালে তাঁকে সেনাবাহিনীর এডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৭৮ সালে ব্রিগেডিয়ার পদে এবং ১৯৮০ সালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে তিনি মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পান।
১৯৮২ সালে জেনারেল মইনকে প্রেষণে ফিলিপাইনে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ করা হয়। পরে তিনি যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি লাওস, নিউজিল্যান্ড, ফিজি ও পাপুয়া নিউগিনিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার হিসেবে সমবর্তী দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ব্যাংককে অবস্থিত এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনে (ESCAP) বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন। থাইল্যান্ডে রাষ্ট্রদূত থাকাকালীন সামরিক বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য রাজকীয় থাই সরকার জেনারেল মইনকে সম্মানসূচক রাজকীয় থাই সেনাবাহিনীর স্পেশাল ওয়ার ফেয়ার এয়ারবোর্ন উইং প্রদান করে। ১৯৯৭ সালে তিনি অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন।
১৯৯৮-এ তিনি অবসরগ্রহণ করেন।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক

এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য

স্বাধীনতার প্রথম দশক

মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অবঃ) বীরবিক্রম

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

চতুর্থ মুদ্রণ
এপ্রিল ২০১৪
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০০

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮০৭৭১ ৯৫৬৮৭৭৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাস রোড, ঢাকা ১১০০

দাম
তিনশত টাকা মাত্র

ISBN 984 410 175 1

EK GENERAL-ER NIRAB SHAKHAY : by Major General Moinul Hossain Chowdhury. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Dhruba Esh. Price : Taka Three Hundred only.

উৎসর্গ

আমার মা—আমার মুক্তিযুদ্ধে
যোগদানের ফলে যাকে অবর্ণনীয় কষ্ট
সইতে হয়েছে
এবং
সেসব মায়েদের যাঁরা তাঁদের সন্তানদের
মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে উৎসাহিত
করেছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

মূলত আমার স্ত্রীর অনুপ্রেরণা ও ছেলেমেয়ের উৎসাহে আমি এই লেখা শুরু করি। শুরুতে ক্যানবেরায় কর্মরত ডঃ সাদেক স্বউৎসাহে আমার সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়া দূতাবাসে আমার স্নেহাস্পদ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা মুহম্মদ ইয়াহিয়া চৌধুরী— যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা— অনেক পরিশ্রম করে প্রাথমিক তথ্যাদি নিয়ে কম্পিউটারে ড্রাফট তৈরি করেন। দূতাবাসে আমার অধীনস্থ কর্মকর্তাগণও এই লেখার ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমানের আগ্রহ ও অনুপ্রেরণায় বইটি পূর্ণতা পেয়েছে এবং তাঁর পত্রিকায় গত শতাব্দীর শেষ মাসটি জুড়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন আকারে এটি প্রকাশ করেছেন। আমি তাঁর কাছে ঋণী।

এ ছাড়া প্রথম আলোর সহ-সম্পাদক শাহেদ মুহাম্মদ আলী দীর্ঘ ছয়মাস ধরে আমার সঙ্গে বসে পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনা করেছেন। এই তরুণ দেশপ্রেমিক সাংবাদিকের বিরল উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছাড়া এই লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা আমার পক্ষে অনেক কষ্টকর হতো। এই স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

সবশেষে বইটির প্রকাশনের দায়িত্ব নেয়ায় মাওলা ব্রাদার্সকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

ঢাকা — মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অবঃ) বীর-বিক্রম

ভূমিকা

আত্মসম্মান, স্বাধীনতা ও দেশের জন্য ১৯৭১ সালে জীবনের নয়টি মাস মুক্তিযুদ্ধে কাটিয়েছি। ওই সময় শত কষ্টের মধ্যে এক মুহূর্তও এর জন্য অনুশোচনা হয়নি। বরং আত্মত্যাগের মহান ভাবনা আর গর্ব নিয়ে এগিয়ে গেছি একধরনের মানসিক তৃপ্তির মধ্য দিয়ে। পরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনীতে ও ১৬ বছরের কূটনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু আর কখনো ফিরে পাইনি মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে অনুভূত সেই গর্ব, আত্মতৃপ্তি ও আনন্দ।

তবুও আজ যখন পেছনে ফিরে তাকাই তখন সেসব দিনের স্মৃতি শত ব্যথা ছাপিয়েও আমার ভেতরটা ভরে দেয় আনন্দে আর গর্বে। পাকিস্তানে প্রথম কর্মজীবন শুরু করা সত্ত্বেও আমার ভেতরে বাঙালি জাতিসত্তার উন্মোচন ছিল স্বাভাবিক। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন অফিসার থেকে মুক্তিযোদ্ধায় রূপান্তর ছিল এক অনিবার্য বাস্তবতায় বিশ্বের বুকে নিজের, দেশের ও জাতির অস্তিত্বের জানান দেওয়া। বাঙালি জাতিসত্তায় আমার বিশ্বাস আমাকে এই রূপান্তরে প্ররোচিত করেছিল।

সেদিন এক সহজ সরল দেশপ্রেমের আবেগে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু বিগত ২৮ বছরে বাংলাদেশে নানা পটপরিবর্তন আর একাধিক জাতীয় বিপর্যয় আমার সব বোধকে ছিন্নভিন্ন করেছে। ট্র্যাজেডি আর হতবুদ্ধিতা আজও আমাদের জাতীয় জীবনের নিত্য ঘটনা। বলতে দ্বিধা নেই, একাত্তরের আগে ও যুদ্ধকালীন সময়ে যাদেরকে কাছে থেকে দেখেছি, স্বাধীনতা-উত্তরকালে তাদের আচরণ আমাকে বিস্মিত করেছে। অনেক রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশিত লেখায় আত্মপ্রচার, ইতিহাসবিকৃতি ও সত্যের অপলাপ প্রত্যক্ষ করে মর্মাহত হয়েছি। বিগত ২৮ বছরে যেমন দেখেছি এক রক্তস্নাত নতুন দেশের অভ্যুদয়, তেমনি খুব কাছে থেকে দেখেছি তার স্বাধীনতা-উত্তর একাধিক ক্রান্তিলগ্ন। দেখেছি কীভাবে তোষামোদ, ভণিতা, মিথ্যাচার, স্বার্থপরতা আর

বিশ্বাসভঙ্গের হীন আবর্তে বাংলাদেশের স্বপ্নগুলো ক্রমাগত তলিয়ে যাচ্ছে। তবে হতাশাই আমাদের চূড়ান্ত প্রাপ্তী হতে পারে না। এগিয়ে যেতে চাই বলেই সত্য উন্মোচন অপরিহার্য।

মিথ্যাচার, ট্র্যাজেডি ও দ্রুত ফুরিয়ে-আসা সময়ের এই প্রেক্ষাপটেই দিতে চাই আমার এই জবানবন্দি। আমি মনে করি, সত্যপ্রচারের এটাই সঠিক সময়। সময়ের অমোঘ নিয়মে একদিন আমাদের সবার দিন ফুরিয়ে আসবে। তাই কাছে থেকে দেখা স্বাধীনতা-উত্তরকালের বহু নাটকীয় ঘটনা আজ লিখে যেতে চাই। মিথ্যাচারের খোলসকে খুলে ফেলে আসল ঘটনাগুলো সোজাসুজি তুলে ধরতে চাই। বলে যেতে চাই অনেক ঘটনা যা সরাসরিভাবে হয়তো কেউ বলেনি। অনেকেই অতীতের অতিরঞ্জন করেন, মিথ্যাকে অভিষিক্ত করেন সত্যে, নিজের স্বার্থে। আর সত্য নিক্ষিপ্ত হয় বিস্মৃতির আস্তাকুঁড়ে। আমার এই প্রচেষ্টা সেসব মুখচেনা আত্মপ্রচার থেকে ভিন্ন। সত্য উন্মোচন ছাড়া আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, নেই কোনো প্রাপ্তির স্বপ্নও।

মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অবঃ)

ঢাকা
১ ফেব্রুয়ারি ২০০০

স্বাধীনতাযুদ্ধের শেষ দিনগুলো

১ ডিসেম্বর, ১৯৭১। তারায় তারায় খচিত আকাশের নিচে কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের রাত। থমথমে নৈঃশব্দ্য ভেঙে থেকে থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝিপোকার ডাক। বিশাল বাঁশঝাড়ের অন্ধকারে জোনাকি পোকার রহস্যময় আনাগোনা।

স্থান, আখাউড়ার অদূরে তিতাস নদীর তীরঘেঁষা সিংগাইর বিল, মুকুন্দপুর ও আজমপুর। এই পুরো এলাকাটি তখন পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ পাঠান রেজিমেন্ট তথা ১২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স-এর দখলে। আর এই এলাকাকে শত্রুমুক্ত করার জন্য এখানে জড়ো হয়েছে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ৮০০ পোড়খাওয়া মুক্তিসৈনিক। এদের প্রায় সবাই ইতিমধ্যে নয় মাস ধরে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। মুকুন্দপুরের উল্টোদিকে তাদের অবস্থান। পেছনে আগরতলা বিমানবন্দর।

একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কোম্পানি অধিনায়কদের সঙ্গে আমি আক্রমণের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পরীক্ষা করছিলাম। আমার শরীরে তখন অজানা বিপদের অনুভূতি। এই তো চার মাস আগেই ময়মনসিংহের কামালপুরে মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের যুদ্ধে চোখের সামনে শহীদ হতে দেখেছি ৩৫ জন সহযোদ্ধাকে। যদিও প্রতিটি খড়িতে আঁকা (সেট পিস) যুদ্ধের আঙ্গিক ভিন্ন, ভিন্ন তার ক্ষেত্র ও পরিবেশ। অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এ-রকম যুদ্ধে রক্তপাত, একাধিক মৃত্যু এবং ক্ষয়ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। সহযোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম ভোর না হতেই হয়তো অনেকের মুখেই অমোঘ মৃত্যুর ছায়া পড়বে। আসলে অবচেতন মনে মৃত্যুচিন্তা যোদ্ধার নিত্যসঙ্গী। কিন্তু একজন অধিনায়ক মৃত্যুর এই ভাবনাকে ক্রমাগত পরাজিত করেন। তিনি সব ভয়কে লুকিয়ে রাখেন আশাবাদী আচরণের আড়ালে।

আগেই ঠিক করা ছিল, রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে ভারতীয় গোলন্দাজরা আমাদের আক্রমণে সহায়তা করার জন্য আগরতলা বিমানবন্দরের পেছন থেকে দূরপাল্লার ভারী কামানের গোলাবর্ষণ শুরু করবে। চারদিকের নৈঃশব্দ্য ভেঙে ঠিক সময়েই তা ঘটল। ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর লক্ষ্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১২নং এফএফ রেজিমেন্ট। আমাদের আক্রমণে সহায়তার জন্য সেদিন ভারতীয় বাহিনী গোলানিক্ষেপে কোনো কার্পণ্য করেনি। গোলাবর্ষণের প্রচণ্ডতা ও তীব্রতা ছিল এমন যে, অনেক দূরেও আমাদের পায়ের নিচের মাটি কাঁপছিল। আমার নেতৃত্বাধীন ব্যাটালিয়ন গোলাবর্ষণের সহায়তায় দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। শত্রুদের হটিয়ে তিতাস নদীর পাড়, মুকুন্দপুর, সিংগাইর বিল আর আজমপুর মুক্ত করাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। শত্রুবাহিনী থেকে ৪০০ মিটার দূরে থাকতেই পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে বন্ধ হয়ে যায় দূরপাল্লার কামানের গোলাবর্ষণ। এরপর আমাদের সৈন্য এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে শুরু হয় মেশিনগান আর রাইফেলের অবিরাম গোলাগুলি।

কুয়াশায় ঢাকা সে রাতে যুদ্ধ পরিচালনা ছিল অত্যন্ত কঠিন। ভোর না হতেই শুরু হয় পাকসেনাদের তুমুল পাল্টা আক্রমণ। দূরপাল্লার ভারী কামান, মেশিনগান ও দুটো 'এফ-৮৬ সেবর জেটের' সাহায্যে তাদের এই পাল্টা আক্রমণ ছিল এক কথায় প্রচণ্ড। ২ ডিসেম্বর সারাদিন ধরে এ যুদ্ধ চলে। শেষ অবধি আমাদের পিছু হটাতে না পেরে ৩ ডিসেম্বর ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ধরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে পালিয়ে যায়। ফলে সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল ও মহাসড়কের মনতলা, হরশপুর, মুকুন্দপুর থেকে শাহবাজপুর পর্যন্ত পুরো এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

সেদিনের সেই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে হারিয়েছি অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে। এর মধ্যে মনে পড়ে ব্রাবো (বি) কোম্পানির কমান্ডার লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামানের নাম। যুদ্ধ চলাকালেই তাঁকে আজমপুর রেলস্টেশনের পাশে সমাহিত করা হয়। এই মহান মুক্তিযোদ্ধার নামে ঢাকা সেনানিবাসে একটি সড়কের নামকরণ করা হয় ১৯৭২ সালে। কিন্তু সম্প্রতি এই সড়কটির নাম পরিবর্তন করে 'স্বাধীনতা সরণি' রাখা হয়েছে। বদিউজ্জামানকে যেখানে সমাহিত করা হয় সেই আজমপুর রেলস্টেশনের নামকরণ করা হয়েছিল তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর সুবেদার আজমের নামে। তিনি একজন পশ্চিম পাকিস্তানি ছিলেন। ষাটের দশকে ঐ সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তিনি নিহত হন। যাহোক, সুবেদার আশরাফসহ আরো আটজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আখাউড়া যুদ্ধে শহীদ হন, যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে সেদিন আমরা একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত করতে সক্ষম হই। এ ছাড়া ২০ জনেরও অধিক মুক্তিসৈনিক সে যুদ্ধে আহত হন। অন্যদিকে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর ১২ এফএফ-এর

তিনজন সৈনিক আমাদের হাতে বন্দি হয়। আর পালানোর আগে তাদের ফেলে যেতে হয় ১২টি মৃতদেহ।

ওই যুদ্ধের সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে। উদ্দেশ্য ছিল, পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় ট্যাঙ্ক ও সেনাবাহিনী যেন অতি সহজে এ এলাকা দিয়ে প্রবেশ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও মেঘনা নদীর পাড়ের আশুগঞ্জ পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারে। তাই এ যুদ্ধের গুরুত্ব অনুধাবন করে ভারতীয় বাহিনীর তৎকালীন পূর্বাঞ্চলের জিওসি মেজর জেনারেল গনজালভেস এ সম্পর্কে নভেম্বর মাসের শেষ দিকে আমার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এর পরের তিনদিন অর্থাৎ ৪ থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা শাহবাজপুর এলাকায় ছিলাম। সীমান্তবর্তী অঞ্চল বিধায় যুদ্ধের প্রথম দিকেই বেশির ভাগ লোক ভারতে এবং কিছু লোক দূরদূরান্তে গ্রামাঞ্চলের দিকে চলে যায়। ফলে ওই সময় পুরো এলাকাটি প্রায় জনশূন্য ছিল। তাই সৈনিকদের খাবারদাবার জোগাড় করা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। তবুও স্থানীয় দু'একজন যাঁরা ছিলেন তাঁরা সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

ঢাকা দখলের অভিযান

৭ ডিসেম্বর আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে আসি এবং প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করি। ভারতীয় বাহিনী এই সময়টাতে আশুগঞ্জে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ১১ তারিখ পর্যন্ত আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও তার আশপাশে অবস্থান গ্রহণ করি। পাকবাহিনী তখন পাকিস্তানের ২৭ ব্রিগেডের জাঁদরেল ব্রিগেডিয়ার সাদউল্লাহ্‌র নেতৃত্বে আশুগঞ্জ ও ভৈরববাজারে অবস্থান নেয়। সাদউল্লাহ্‌কে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানতাম। তাঁর সঙ্গে ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৪ ডিভিশনে একসঙ্গে চাকরি করেছি। তিনি পাক সেনাবাহিনীতে একজন অত্যন্ত সাহসী ও স্বনামধন্য অফিসার হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

আমরা ওই কদিন পুরো এলাকায় পেট্রোলিং করি এবং আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি। ৯ ডিসেম্বর দুপুরে ভারতের ১০ বিহার রেজিমেন্ট আশুগঞ্জে পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়। ওই আক্রমণ পাকিস্তানিরা বেশ ভালোভাবে প্রতিহত করে। এই সংঘর্ষে ভারতীয় বাহিনীর বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়। ১০/১১ ডিসেম্বর রাতে পাকবাহিনী ভৈরব ব্রিজটি বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয় এবং আশুগঞ্জ থেকে মেঘনা অতিক্রম করে ভৈরবে গিয়ে অবস্থান নেয়। ভৈরবে তারা শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলে।

১২ তারিখ ভোরে ভারতীয় বিমানবাহিনী ভৈরবে পাকবাহিনীর অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। বেশকিছু হেলিকপ্টার ওইদিনই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তৎকালীন নিয়াজ স্টেডিয়ামে অবতরণ করে এবং ভারতীয় ১০ বিহার রেজিমেন্টের সৈন্যদের নরসিংদী নিয়ে যেতে থাকে।

আমাকে বলা হলো, আমি যেন নৌকাযোগে মেঘনা নদী পার হয়ে আমার পুরো রেজিমেন্ট নিয়ে ভৈরব বাজার এড়িয়ে নরসিংদী পৌঁছার চেষ্টা করি। ওইদিনই সকাল ১১টায় আমরা নৌকা জোগাড় করে আরো দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে গিয়ে পুরো রেজিমেন্ট নিয়ে মেঘনা নদী পাড়ি দিই। এ সময় পাকবাহিনী আমাদের লক্ষ্য করে দূরপাল্লার কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। দিনের বেলায় এই গোলাগুলির ভেতর দিয়ে আমরা নদী পার হই এবং মেঘনার পশ্চিম পাড়ে এসে উঠি। এরপর রেললাইন ধরে হেঁটে নরসিংদী পৌঁছাই। আমরা নরসিংদী রেলস্টেশনের আশপাশে অবস্থান নিই। ভারতীয় বাহিনী হেলিকপ্টারে এসে আগেই সেখানে অবস্থান গ্রহণ করে।

লম্বা পথ পাড়ি দেওয়ায় সৈন্যরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ওই রাতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা (বর্তমান সংসদ সদস্য) রাজিউদ্দীন রাজু আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ১ ডিসেম্বরের পর এটাই ছিল আমাদের জন্য একটি পরিপূর্ণ এবং ভরপেট খাবার। তবে এর আগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ভাত খাওয়ার সুযোগ হয়েছিল।

১৩ তারিখ বিকেলে আমি লেফটেন্যান্ট সাঈদ (বর্তমানে মেজর জেনারেল)-এর নেতৃত্বে ঢাকার দিকে একটি টহল দল পাঠাই। টহল দল ফিরে এসে আমাকে জানায়, ঢাকা থেকে লোকজন গ্রামের দিকে চলে আসছে। তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে বুঝতে পারি, পাকবাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ঢাকায় এসে জড়ো হচ্ছে এবং ঢাকার চারদিকে অবস্থান গ্রহণ করছে।

ঘটনা বিশ্লেষণ করে আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ি। বলতে গেলে পুরো রাতই আমার নিদ্রাহীনভাবে কাটে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, ঢাকা দখলের জন্য বোধ হয় আমাদের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ (স্ট্রিট ফাইটিং) করতে হবে। শহরের ভেতরে এ ধরনের যুদ্ধ সম্পর্কে যাঁদের ধারণা আছে, তাঁরা হয়তো বুঝতে পারবেন, এ ধরনের যুদ্ধ কীরকম ভয়াবহ। এতে উভয়পক্ষই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং বেসামরিক নাগরিকরাও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধের তীব্রতায় পুরো শহর পরিণত হতে পারে ধ্বংসস্তূপে।

সমগ্র নরসিংদী এলাকায় মিত্রবাহিনীর দুই ব্যাটালিয়ন ও আমার এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য মোতায়েন ছিল সে সময়। ৪ ডিসেম্বর ভারতের যুদ্ধঘোষণার পর থেকেই ঢাকা দখলের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয় তারই প্রেক্ষাপটে আমাদের সেনারা সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে,

অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় সরকারের মতৈক্যের ভিত্তিতে সে সময় সিদ্ধান্ত হয় যে, অপারেশন 'জ্যাকপট' (ঢাকা অভিযানের সাংকেতিক নাম) চলাকালীন এলাকায় দুই বাহিনীর মধ্যে যে অফিসার ওই এলাকায় সিনিয়র হবেন, তিনিই যৌথবাহিনীর অধিনায়ক হবেন। মূলত প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতীয় বাহিনীর অফিসার সিনিয়র থাকায় তাঁরাই অধিনায়ক ছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় ৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতীয় যৌথবাহিনীর কমান্ডার হিসেবে ব্রিগেডিয়ার মিশ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমার সঙ্গে যোগ দেন।

ভারতীয় কমান্ড অগ্রাহ্য করে

১৩ ডিসেম্বর ব্রিগেডিয়ার মিশ্র আমাকে নরসিংদীতে অবস্থান করে সেখানকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখতে বলেন। আমি তাঁর কথায় কোনো সাড়া না দিয়ে আমার ব্যাটালিয়ন নিয়ে রাতের বেলায় সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকি। আমার মনে পড়ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বার্লিন দখলের জন্য মিত্রবাহিনীর প্রতিযোগিতার কথা। সেখানে কে আগে পৌঁছে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে তা নিয়েই রুশ ও অন্যান্য মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়েছিল। তাই আমরা ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম।

১৪ তারিখ দুপুরবেলায় আমরা ঢাকার অদূরবর্তী ডেমরায় পৌঁছাই। আমার সঙ্গে নিয়মিত বাহিনী দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ৮০০ সৈনিক ছিল। ৩নং সেকটরের কিছু মুক্তিযোদ্ধা, যারা আমাদের সঙ্গে রায়পুরায় যোগ দেয় তারাও ডেমরায় সমবেত হয়। আমরা ডেমরা শিল্পাঞ্চলের পেছনে অবস্থান গ্রহণ করি। সেখানে পাকবাহিনীর সঙ্গে আমাদের থেমে থেমে গোলাগুলি চলতে থাকে। তবে পাকবাহিনীর অবস্থান ছিল বেশ দুর্বল। ভারতীয় বাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন তখন আমাদের দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থান নেয়। অন্য একটি ব্যাটালিয়ন নরসিংদীর পূর্বদিকে টঙ্গী বরাবর অবস্থান নেয়।

১৫ তারিখ রাতে আমি সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট আনিসের (বর্তমানে ডাক্তার) নেতৃত্বে ২০/২৫ সদস্যের একটি ফাইটিং পেট্রোল বাড্ডার দিকে পাঠাই। তারা সেখানে আধা ঘণ্টার মতো অবস্থান করে এবং ১০/১৫টি ৮১ মিলিমিটার মর্টারের গোলা ঢাকার দিকে তথা গুলশানের দিকে লক্ষ্য করে ছোড়ে। কিন্তু পাকবাহিনী এর কোনো পাল্টা জবাব দেয়নি।

১৬ ডিসেম্বর সকালে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে অবস্থানরত সাংবাদিকদের মাধ্যমে জানতে পারি, পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। একটু পরে সে খবরের সত্যতা সরকারিভাবে জানতে পারি। আমার

সৈন্যরা পায়ে হেঁটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নরসিংদী হয়ে ডেমরা পৌঁছে এবং পথে পথে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করে স্বভাবতই ছিল ক্লান্ত ও দীর্ঘ পথযাত্রায় দুর্বল। তাই সকালে ডেমরার একটি বাড়িতে ভারী কামান ও গোলাবারুদ রেখে আমরা ডেমরার প্রধান সড়কে উঠি। আমাদের পরনে খাকি পোশাক। কারণ, যুদ্ধকালীন কোনো সৈন্য ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় না থেকে বেসামরিক পোশাকে যুদ্ধবন্দি হলে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী কোনো সুযোগ-সুবিধা পাবে না, বরং দুষ্কৃতকারী হিসেবে গণ্য হবে। তা ছাড়া শৃঙ্খলা এবং সার্বিক নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত বাহিনীর পোশাক থাকা একান্ত আবশ্যক। যাহোক, ডেমরা থেকে আমরা খাকি পোশাকে ডানদিকের রাস্তা ধরে যাচ্ছিলাম। বাঁদিকের রাস্তায় দেখি অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনী। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন মেজর আমাকে জড়িয়ে ধরেন। তাঁর সঙ্গে আমি পাকিস্তান মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে পরিচিত। ভগ্ন-মনোরথ মেজর আমাকে বোঝাতে চাইছিলেন যে, তাঁর রেজিমেন্ট সাধারণ জনগণের ওপর কোনোরূপ নির্যাতনমূলক আচরণ করেনি। কোনোরূপ প্রত্যুত্তর না করে আমি আমার পথে ঢাকার দিকে চলতে লাগলাম। একটু পরে দেখি ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং মেজর হায়দারকে (পরে ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে নিহত) নিয়ে গাড়ি করে বেসামরিক পোশাকে ঢাকার দিকে যাচ্ছেন। এদিকে ওইদিনই এয়ার ভাইস মার্শাল আবদুল করিম খন্দকারও কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন মিত্রবাহিনীর সঙ্গে। ঢাকায় আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের ছবিতেও তাঁদের দেখা যায়। উল্লেখ্য, ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিং ১৯৮৪ সালের অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের সংঘর্ষে ভারতীয় বাহিনীর হাতে মন্দিরের ভেতরে নিহত হন। ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ছিলেন উগ্রপন্থী শিখনেতা সন্তু ভিন্দ্রানওয়ালের সামরিক উপদেষ্টা।

সন্ধ্যার দিকে আমরা ঢাকা পৌঁছাই। রাস্তার দুপাশের বাড়ির ছাদে অসংখ্য কৌতূহলী জনতা আমাদের স্বাগত জানায়। অনেকে অবশ্য আমাদের খাকি পোশাকে দেখে অবাকই হয়। কারণ, আমাদের এবং পাকিস্তানি বাহিনীর উভয়ের পোশাকই ছিল খাকি। ফলে তারা কিছুটা ভীতসন্ত্রস্তও ছিল। যাহোক, আমাদের চিনতে তাদের কিছুটা সময় লাগে।

মুক্ত নগরী ঢাকা

সন্ধ্যায় আমরা ঢাকা স্টেডিয়ামে পৌঁছি। স্টেডিয়ামের পথে পথে রাস্তাঘাট ছিল জনশূন্য। যদিও পাকিস্তান আর্মি আত্মসমর্পণ করেছিল তথাপি লোকজনের

মধ্যে ভয়-ভীতি, আতঙ্ক ও সন্দেহ ছিল। তাই রাস্তাঘাটে লোকজনের চলাচল ছিল না। ঢাকা স্টেডিয়ামে পৌঁছার পূর্বে সন্ধ্যায় জানতে পারি, ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল (বর্তমানে শেরাটন হোটেল)-এর আশপাশে পাকিস্তান আর্মি উৎসুক জনসাধারণের ওপর গুলি চালিয়েছে। ফলে কিছু লোক হতাহত হয়েছে।

আমি ঠিক করলাম আমরা ঢাকা স্টেডিয়ামেই অবস্থান নেব। কারণ, ঢাকা স্টেডিয়াম সুরক্ষিত, আচ্ছাদিত এবং ৮০০ লোকের থাকাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি এখানে বিদ্যমান। তদুপরি ক্ষুধা এবং দীর্ঘ পথ চলার কারণে সবাই পরিশ্রান্ত ছিল। তাই ঢাকা স্টেডিয়ামে আমাদের অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করি। ৩০ নভেম্বরের পর থেকে যুদ্ধপরিস্থিতি ও সুষ্ঠুভাবে রসদপত্র পরিবহণের অভাবে আমাদের ভালোভাবে খাওয়াদাওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তা ছাড়া পায়ে হেঁটে ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে আমাদের চলতে হয়েছে। তাই একই সঙ্গে পর্যাপ্ত রসদ নিয়ে পথ চলাও সম্ভব ছিল না।

১৬ ডিসেম্বর রাতেই লেফটেন্যান্ট সাইদ (বর্তমানে মেজর জেনারেল) ও কয়েকজন সৈনিকসহ আমি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে যাই। তখন হোটেলটি ছিল নিরপেক্ষ এলাকা। সেখানে রেডক্রসের পতাকা উড্ডীয়মান ছিল। সেখানে গিয়ে দেখলাম পরিস্থিতি থমথমে, শান্ত ও নীরব। হোটেলে গিয়ে উপস্থিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করলাম। তাদেরকে বেশ ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। আমাদের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র দেখে হয়তো তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। নিরপেক্ষ এলাকা হওয়ায় আমাদের সেখানে অস্ত্র নিয়ে ঢোকা উচিত হয়নি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি বেশ লজ্জিত হয়ে পড়ি।

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনের রাস্তায় তখনও রক্তের দাগ ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে কী হয়েছিল তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেনি। ধারণা করা হচ্ছে, বিজয়ের পর উৎসুক জনতা হোটেলের সামনে ভিড় জমায়। পলায়নরত পাকিস্তানিরা তখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গুলি ছোড়ে। আমরা গিয়ে সেখানে কাউকে পাইনি। পরে আমরা হোটেল থেকে ফিরে আসি।

পরদিন (১৭ ডিসেম্বর) অতি প্রত্যুষে ঢাকা স্টেডিয়ামে তৎকালীন বিখ্যাত শাড়ির দোকান পাবনা স্টোরের মালিক (নাম মনে নেই) আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসেন। প্রায় ৮০০ সেনা-কর্মকর্তা ও সৈনিকের জন্য খাবার তৈরি করতে প্রায় সারারাত লেগে যায়। অবশ্য বাকি যে তিন দিনের মতো আমরা সেখানে ছিলাম সে সময় জনসাধারণ এবং ঢাকার তৎকালীন জেলা প্রশাসক আহমেদ ফরিদের (পরে সচিব ও রাষ্ট্রদূত, বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন) সহযোগিতায় খাবারের বন্দোবস্ত হতো।

সকালেই স্টেডিয়াম থেকে দেখতে পাই শহরে প্রচুর লোকসমাগম। তাদের অনেকেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং গাড়ি করে ও পায়ে হেঁটে শহরময়

ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের দেখে মনে হয়নি গত ৯ মাসে কখনও তারা বৃষ্টিতে ভিজেছে বা রোদে ঘেমেছে। তাদের বেশভূষা, চালচলন ও আচরণে যুদ্ধের কোনো ছাপ ছিল না।

১৭ ডিসেম্বরে লুটপাট

দুপুরবেলায় জিন্নাহ এভিনিউতে (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ) লুটপাট আরম্ভ হয়। আমি এবং আমার অধীনস্থ সকল সৈনিক স্টেডিয়াম থেকেই তা প্রত্যক্ষ করলাম। কিন্তু এ সময় আমাদের করণীয় কিছুই ছিল না। কারণ, ঢাকা শহরের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের ভার অর্পিত ছিল ভারতীয় বাহিনীর হাতে। পরে জানতে পারি, নিউমার্কেট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু এলাকায়ও ওইদিন লুটতরাজ হয়। এ লুটতরাজের জন্য অন্যদের সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীকেও দোষারোপ করা হয়। তবে আমাদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির ফলে ঢাকা স্টেডিয়াম এলাকায় কোনো প্রকার লুটতরাজ হয়নি। সে সময় ভারতীয় বাহিনীর অবস্থান ছিল রেসকোর্স ময়দান (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান), ঢাকা সেনানিবাস, বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ মার্কেট, মোহাম্মদপুর ও মিরপুরসহ অন্যান্য কিছু এলাকায়। সে সময় বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনীর মধ্যে শুধু আমার দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টই ছিল ঢাকা শহরে। তখন পর্যন্ত আর কোনো বাংলাদেশী নিয়মিত বাহিনী ঢাকায় এসে পৌঁছেনি।

ওই সময়টাতে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। নরসিংদী থেকে নিজ দায়িত্বে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করায় তারা হয়তো আমার ওপর অসন্তুষ্ট ছিল। আমার সঙ্গে তাদের আচরণে আমি তা বুঝতে পারি।

দুপুরের পর আমি ঢাকা সেনানিবাসে গেলাম। আমার সঙ্গে কয়েকজন সৈন্য ছিল। আমরা সেখানে ঘণ্টাখানেক ঘোরাফেরা করি। সেনানিবাসে সর্বত্রই তখন ভারতীয় বাহিনীর উপস্থিতি। আমাকে দেখে বরং তারা অবাকই হলো। কয়েকটি ব্যারাকে গিয়ে দেখি সেখানে বন্দি পাকিস্তানি সৈনিক। জেনারেল রাও ফরমান আলীসহ অন্য কিছু সেনা-অফিসারকে তৎকালীন স্কুল রোডের (বর্তমানে স্বাধীনতা সরণি) এক বাড়িতে দেখলাম। পরে আমি সেন্ট্রাল অর্ডন্যান্স ডিপোতে (আর্মির কেন্দ্রীয় গোলাবারুদ ও রসদপত্রের স্টোর) গেলাম। আমাকে ডিপোতে প্রবেশ করতে বেশ বেগ পেতে হলো। পরিচয় প্রদানের পর কর্মরত ভারতীয় মেজর আমাকে ডিপোতে প্রবেশ করতে

দিলেন। সেখানে প্রচুর রসদপত্র ও আনুষঙ্গিক স্টক থাকার কথা থাকলেও তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ছিল না। আমি কিছু তাঁবুর ব্যবস্থা করলাম আমার সৈনিকদের জন্য। সন্ধ্যার দিকে আমি সেনানিবাস ত্যাগ করি।

ঢাকা স্টেডিয়ামে পৌঁছে দেখি, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুজন কর্মকর্তা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁরা ব্যাংকলুটের আশঙ্কা ও নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলেন বলে আমাকে অবহিত করেন। আমি যেন ব্যাংকের সঠিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি, সে অনুরোধও জানান। আমি তাঁদেরকে স্থানীয় পুলিশস্টেশন তথা রমনা থানার সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দিই যদিও আমি জানি আইনশৃঙ্খলার অস্তিত্ব নেই। ব্যাংকের পূর্বাপর অবস্থা সম্পর্কেও আমি অবহিত নই। তা ছাড়া ঢাকা শহরের নিরাপত্তার দায়িত্বে তখন ভারতীয় বাহিনী। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা না জেনে দায়দায়িত্ব নিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

অস্ত্রশস্ত্র ভারতে পাচার

এর পরে আরো কয়েকদিন আমি ঘনঘন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যাই। অর্ডন্যান্স ডিপোও পরিদর্শন করি। লক্ষ করি, সেখানকার রসদসামগ্রী ও অন্যান্য স্টক ক্রমাগত কমছে। আমি আগে থেকেই ব্যবস্থাকৃত কিছু তাঁবু নিয়ে চলে আসি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত আইডিএস বুলেটিনের (ভলিউম ৯, নং ১) ১২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত রেফারেন্স থেকে জানা যায়, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের অন্তত চারটি ডিভিশনের অস্ত্রশস্ত্র, ভারী কামান, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ও যানবাহন ভারতে নিয়ে যায়। পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রতিবাদ করলে টোকেন হিসেবে কিছু পুরানো অস্ত্র ফেরত দেওয়া হয়।

এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিগেডিয়ার মিশ্রর, যাঁর কথা আগেই বলেছি, ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে কোর্ট মার্শাল হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফ্রিজ, আসবাবপত্র, ক্রোকারিজ ইত্যাদি সামরিক-বেসামরিক সামগ্রী ট্রাকে করে ভারতে পাচার করেছিলেন। ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে ঢাকা সেনানিবাসের গেটে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুইজন সদস্য একটি মালভর্তি ট্রাক আটক করে যা ভারতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে

অভিযোগ ওঠে। পরে পাচারের জন্য ব্রিগেডিয়ার মিশ্রর নেওয়া ওইসব মূল্যবান জিনিসপত্রের একটি লিস্ট ঢাকা থেকে ভারত সরকারের গোচরে আনা হয়। ওই অভিযোগে আসামের কাছাড় জেলার শিলচর সেনানিবাসে তাঁর 'ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল' হয়।

ওই কোর্ট মার্শালে জিনিসপত্র পাচারের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তৎকালীন মেজর (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব) শাহেদ সেলিম, তৎকালীন ক্যাপ্টেন শফিক ও অন্য দুজন সৈনিককে ভারতে পাঠানো হয়। তাঁরা পাচারের ঘটনাটি সত্য বলে সাক্ষ্য দেন। তবে ওই কোর্ট মার্শালের রায় কী হয়েছিল তা আমার জানা নেই। উল্লেখ্য, ওই জিনিসপত্র বেসামরিক ট্রাকে থাকায় তা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নজরে এসেছিল। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয় সামরিক যানগুলো চেক করার কোনো সুযোগ আমাদের ছিল না।

নরসিংদী থেকে ঢাকায় পৌঁছার পর ব্রিগেডিয়ার মিশ্র কখনো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। তিনি ঢাকা সেনানিবাসের বর্তমান "সিজিএস"-এর বাড়িতে উঠেছিলেন এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে তাঁর ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন।

স্বাধীনতার পরপর একটা প্রবণতা বেশ লক্ষণীয় ছিল, যা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে বেশ চমকপ্রদ বলে মনে হতো। সে সময় ঢাকার বিত্তশালী কিছু-কিছু পরিবারের সঙ্গে ভারতীয় আর্মি অফিসারদের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। এসব লোকজনের অধিকাংশই স্বাধীনতাবিরোধী ছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস পাকিস্তানি সেনা-অফিসারদের সঙ্গেও তাদের একই রকম হৃদ্যতা ছিল। এরা বিভিন্ন সময় পার্টি দিয়ে ইন্ডিয়ান আর্মি অফিসার ও রাজনৈতিক নেতাদের আপ্যায়ন ইত্যাদি করতেন। অনেক বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা যুবক আমাদের কাছে এসে ওইসব ঘটনা বলতেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। পাকিস্তানি মেজর সালিকের উইটনেস টু সারেন্ডার বইটিতেও মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি অফিসারদের সঙ্গে ওইসব বাঙালি পরিবারের সম্পর্কের কিছু আভাস পাওয়া যায়।

ভারতীয় সেনাদের অহংবোধ

ওই সময় ঢাকায় ভারতীয় বাহিনীর কিছু-কিছু অফিসারের কার্যকলাপে আমার মনে হয়েছে, তারা যেন নিজেদেরকে বাংলাদেশের ত্রাতা হিসেবে গণ্য করছে।

একধরনের অযাচিত অহংবোধ নিয়ে তারা ঢাকায় চলাফেরা করত। ঠিক এই ধরনের মানসিকতার জন্যই পাকিস্তানিদের সঙ্গে বাঙালিদের, বিশেষ করে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন আর্মি অফিসারদের সৌহার্দ্যপূর্ণ বা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। বরং তাদের প্রতি একধরনের অবিশ্বাস ও বিতৃষ্ণা ছিল। আসলে একজন গর্বিত সৈনিকের আত্মমর্যাদাবোধটাই বড়। এটা না থাকলে কেউ দেশের জন্য, জাতির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে পারে না। তবে ওই সময় ভারতীয় বাহিনীর সেসব অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য কিছু বাঙালি এবং মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত নেতাগোছের কিছু লোকও দায়ী।

প্রসঙ্গক্রমে ১৯৭১ সালের ৩১ জুলাই ময়মনসিংহের উত্তরে কামালপুরে সংঘটিত যুদ্ধের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। কামালপুরে কয়েক ঘণ্টার এক যুদ্ধে আমি হারিয়েছি প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের ৩৫জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে। আরো ৫৭জন মুক্তিযোদ্ধা হয়েছিলেন আহত। পরদিন ১ আগস্ট হেলিকপ্টার যোগে জেড ফোর্সের (যার অধিনায়ক ছিলেন জিয়াউর রহমান) হেডকোয়ার্টারে আসেন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল (পরে ফিল্ড মার্শাল) মানেকশ। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বললেন এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। কথা প্রসঙ্গে আমি মানেকশকে আমাদের ওয়ারলেস সেটের স্বল্পতা এবং কামালপুর যুদ্ধের সময় ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সরবরাহকৃত ওয়ারলেস সেটের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনে সমস্যার কথা জানাই। মূলত ওয়ারলেস সেট কাজ না করায় ওই যুদ্ধে কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহবুবের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হই। ক্যাপ্টেন মাহবুব ওই সময় স্থানীয় পাকিস্তানি ঘাঁটির পেছনে তাঁর সৈন্যদের নিয়ে আমার আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু ওয়ারলেস সেট কাজ না করায় তার কাছে সময়মতো আদেশ পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ওই কোম্পানিটিকে সক্রিয় করতে পারলে সেদিনের যুদ্ধে আমাদের এত ক্ষয়ক্ষতি হয়তো হতো না। যুদ্ধের শেষ দিকে ক্যাপ্টেন মাহবুব সিলেটে শহীদ হন।

যাহোক, জেনারেল মানেকশর সঙ্গে আমার কথোপকথনের সময় ওই অঞ্চলে গারো পাহাড়ের তুরা শহরে অবস্থিত ভারতীয় ১০১ কমিউনিকেশন জোনের কমান্ডার মেজর জেনারেল গুরবত সিং গিল উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন শিখ। আমার সঙ্গে তাঁর বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। বাংলাদেশের সামরিক অধিনায়কদের সঙ্গে তিনিই ভারতীয়দের পক্ষে যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং প্রয়োজনে রসদপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। মানেকশ চলে যাওয়ার পর তিনি আমাকে তুরায় তাঁর হেডকোয়ার্টারে চায়ের আমন্ত্রণ জানান। সেখানে গেলে তিনি অনুযোগ করে

আমাকে বলেন, তোমাদের প্রয়োজনমতো সবসময় যা চেয়েছো আমি সাহায্য করেছি। তবুও তুমি আমার সেনাপ্রধানের কাছে রসদ নিয়ে অভিযোগ করলে!

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম, এসব ওয়ারলেস তো আর তুমি তৈরি কর না। আমি শুধু ওয়ারলেস সেটের কোয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছি। আমি তাঁকে আরো বললাম, একজন পেশাদার ও স্ট্রেট ফরওয়ার্ড জেনারেল হিসেবে আমি তোমাকে পছন্দ করি এবং সম্মান করি। এই সুযোগে আমার নিজের অনুভূতি তোমাকে জানাতে চাই। আমি সরাসরি তাঁকে বললাম, ১৯৪৮ ও ১৯৬৫ সালে তোমরা পাকিস্তানের সঙ্গে দুটো যুদ্ধ করেছ। দুটি যুদ্ধই ছিল অসমাপ্ত এবং তা থেকে তোমরা কিছুই পাওনি (জিরো সাম গেম), এই '৭১-এ এসে তোমরা পেয়েছ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সুযোগ, পাকিস্তানকে ভাঙার। সহজ কথা হলো, তোমরা চাও পাকিস্তানকে ভাঙতে, আর আমরা চাচ্ছি একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। তাই তোমাদের নিজেদের স্বার্থেই সর্বাত্মকভাবে আমাদের সাহায্য করা উচিত।

গিল হেসে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'মইন, তুম বহুত চালু হ্যায়!' অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বে ডিসেম্বর মাসে সেই কামালপুরেই যুদ্ধ পরিচালনার সময় এই বীর ভারতীয় জেনারেল গুরুতরভাবে আহত হন।

মেজর জলিলের গ্রেপ্তার

ডিসেম্বরের শেষ দিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের একপাশে (বর্তমান পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে) আমার অস্থায়ী অফিস চালু করি। কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাকা শহর ও আশপাশ এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ, আর্মির গাড়ি ইত্যাদি উদ্ধার করি এবং সেগুলো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়ে আসি।

ডিসেম্বর মাসেরই শেষের দিকে মেজর জলিলকে খুলনা থেকে ধরে এনে বন্দি করার জন্য আমার কাছে হস্তান্তর করা হয়। তৎকালীন ক্যাপ্টেন কে এস হুদা (পরে কর্নেল ও ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে নিহত) তাকে ধরে নিয়ে আসেন। মেজর জলিলের বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অন্যান্য সামরিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ ছিল। খুলনার তৎকালীন জেলা প্রশাসক জলিলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এবং গ্রেপ্তার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। যদিও প্রচার করা হয় যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক অস্ত্রশস্ত্র লুটতরাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জলিলকে আমি পাকিস্তান মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে চিনি। গ্রেপ্তারের পর তাকে আমার অস্থায়ী অফিসের পাশে আমার অধীনে প্রহরায় রাখা হয়। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে অনেক আলাপ হতো। জলিল আমাকে বলত, 'স্যার, আর্মিতে থেকে কী লাভ হবে? বড়জোর জেনারেল হবেন। তার চেয়ে বরং চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে আসুন। তা না হলে যারা ভারতের কলকাতা ও আগরতলায় শরণার্থী ছিল এবং যারা নয়মাসের যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল না তারাই দেশ শাসন করবে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ভাঙিয়ে। তাই সব মুক্তিযোদ্ধার উচিত রাজনীতিতে শীঘ্রই সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়া।' এখানে উল্লেখ্য, লে. কর্নেল তাহেরের সভাপতিত্বে ১৯৭২ সালে জলিলের কোর্ট মার্শাল হয়। কোর্ট মার্শালে জলিলের কোনো শাস্তি হয়নি। কিন্তু তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এরপর তিনি সক্রিয়ভাবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং জাসদের অন্যতম প্রধান নেতায় পরিণত হন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

৮ জানুয়ারি ১৯৭২ ঢাকায় খবর আসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডনে যাচ্ছেন। এ খবরে ঢাকাসহ সারা দেশে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকায় লোকজন রাতভর আনন্দমিছিল, আতশবাজি ও ফাঁকা গুলিবর্ষণের মধ্য দিয়ে উৎসবে মেতে ওঠে। আমরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকেই তা দেখলাম। পরদিন ৯ জানুয়ারি সকালে প্রধান সেনানায়ক কর্নেল ওসমানী (পরে জেনারেল) তৎকালীন কর্নেল শফিউল্লাহর মাধ্যমে আমাকে জানান, শেখ মুজিবের গার্ড অফ অনার আমাকে পরিচালনা করতে হবে, তেজগাঁও বিমানবন্দরে। নির্দেশ পেয়ে ওইদিনই সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রায় ৫০০ সদস্য সংগ্রহ করি। তাদের নিয়ে আমি তেজগাঁও বিমানবন্দরে গার্ড অফ অনারের অনুশীলনে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবের কাঙ্ক্ষিত স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন। বিপুলসংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও আপামর জনসাধারণের ঢল নামে বিমানবন্দরে। প্রচণ্ড ভিড় সেখানে। এত ভিড়, এত মানুষ এর আগে আমি কোথাও দেখিনি। বিকেলে শেখ মুজিবকে নিয়ে যুক্তরাজ্যের সাদা রঙের রাজকীয় বিশেষ বিমান ঢাকায় অবতরণ করে। তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য

আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এ প্রতিযোগিতা ছিল সত্যিই দৃষ্টিকটু। শেখ মুজিবের জন্য তৈরি মঞ্চেও ভিড়। এ ভিড়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে গার্ড অফ অনার দেওয়াও একরকম দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। যাহোক, ভিড় ঠেলেই আমরা গার্ড অফ অনার দিলাম।

অত্যন্ত কাছ থেকে শেখ মুজিবকে এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো দেখলাম। এর আগে ১৯৬৯ সালে তৎকালীন শাহবাগ হোটেলে (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) গণচীনের আবাসিক কনসাল জেনারেলের অভ্যর্থনায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। তখন আমি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজার এডিসি। যাহোক গার্ড অফ অনার দেওয়ার সময় মঞ্চে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রধান সেনানায়ক কর্নেল ওসমানীও ছিলেন। গার্ড অফ অনার শেষে শেখ মুজিব আমাকে বললেন, 'তোমরা কেমন আছ?' সারা বিমানবন্দর জুড়ে গগনবিদারী স্লোগানের জন্য তাঁর বাকি কোনো কথা শুনতে পেলাম না। গার্ড অফ অনার শেষে ভিড়ের মধ্যেই শেখ মুজিবকে জিপে তুলে রেসকোর্স ময়দানে আনা হয়। রেসকোর্স ময়দানের সার্বিক তত্ত্বাবধান ছিল আমার দায়িত্বে। কারণ, আগেই বলেছি আমাদের অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল সেখানে। ভিড় উপেক্ষা করে আমি রেসকোর্সের পাশে অবস্থিত আমার অস্থায়ী কার্যালয়ে ফেরত আসি। সেখানে তখন লাখ লাখ লোকের সমাবেশ। কোথাও তিল ধরার ঠাঁই নেই। আমি দেখি প্রচণ্ড সেই ভিড় ঠেলে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মঞ্চের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আমি তাঁকে মঞ্চে পৌঁছে দিয়ে আসি। সেদিন রেসকোর্সে শেখ মুজিব ভাষণ দেন, যা সম্পর্কে সবাই অবহিত আছেন।

পরদিনও (১১ জানুয়ারি) শহরে দিনভর আনন্দমিছিল চলতে থাকে। আমি আমার অস্থায়ী কার্যালয়ে ব্যস্ত দিন কাটাই। ওইদিনই আমাকে জানানো হয়, নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে আমাকে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিবের দায়িত্ব পালন করতে হবে। সামরিক সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে স্বভাবতই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আমার সক্রিয় থাকার কথা। কিন্তু শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে পরার মতো সামরিক সচিবের ইউনিফর্ম আমার ছিল না। আমি তা বঙ্গভবন থেকে সংগ্রহ করি। সেখানে গিয়ে দেখি প্রচুর লোকের ভিড়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা ভারত থেকে এসে পরিবার-পরিজন নিয়ে বঙ্গভবনে উঠেছিলেন এবং সেখানেই থাকতেন। যাহোক, আমি স্বভাবতই ভাবলাম শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেবেন। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের সময় মেহেরপুরে বাংলাদেশের যে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়, তাতে তিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন। আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শপথ অনুষ্ঠান সম্পর্কে

আলোচনা করতে চাইলে তিনি ইঙ্গিত দিয়ে দেখালেন যে, আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি হবেন। বঙ্গভবনে যাওয়ার আগে কিংবা পরেও আমাকে বলা হয়নি, কে হবেন দেশের রাষ্ট্রপতি আর কে হবেন প্রধানমন্ত্রী।

জানুয়ারি মাসের শেষদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব অফিসে যাওয়ার পথে একদিন আকস্মিকভাবে রেসকোর্স ময়দানে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল ইউনিট পরিদর্শনে আসেন। তিনি ঘণ্টা দেড়েক ঘোরাফেরা করার পর আমার কক্ষে আসেন এবং খোলাখুলিভাবে আমাদের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে জানতে চান। আমি তাঁর সঙ্গে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি। এ ছাড়া আমরা যেন সত্বর ক্যান্টনমেন্টে যেতে পারি সে ব্যবস্থা করার জন্যও আমি তাঁকে অনুরোধ করি। কারণ আমরা দীর্ঘদিন থেকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার বাইরে ছিলাম। সৈনিকরা তাদের পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা ছিল একান্তভাবে জরুরি। স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা মূল বেতনের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পেতাম। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ মেয়াদি সঞ্চয়পত্র আকারে পেতাম। আমাদের কোনো নিজস্ব কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র ছিল না। আমরা মার্চ মাসে যখন জয়দেবপুর থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগদান করি, তখন আমাদের ব্যক্তিগত সব জিনিসপত্র সেখানে ফেলে রেখে আসি। শুধু সামরিক পোশাক, অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগদান করি। নয়মাস পর দেশে ফিরে এসে জয়দেবপুরে আমাদের ফেলে যাওয়া ব্যক্তিগত গাড়ি, আসবাবপত্র থেকে শুরু করে কোনোকিছুই আর পাওয়া যায়নি। এতে বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বিভিন্ন স্তরের সৈনিকরা। তাঁরা তাঁদের সারাজীবনের সঞ্চয় ফেলে এক কাপড়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের ওই ক্ষতি ছিল অপূরণীয়। কারণ তাঁদের অধিকাংশই এসেছেন বাংলার বিভিন্ন কৃষক পরিবার থেকে।

শেখ মুজিবের সঙ্গে কথোপকথনে আমার মনে হয়েছিল তিনি এক বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অগাধ দেশপ্রেম এবং সততা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। আমার জীবনে বহু উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি ও নেতাকে একান্ত কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, শেখ মুজিব ব্যতিক্রমি এক মানুষ, যাঁর হৃদয় ছিল অত্যন্ত কোমল, সাদামাটা। তিনি এক খাঁটি বাঙালি দেশপ্রেমিক। তবে সে সময় তাঁকে কথোপকথনের ফাঁকে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক দেখেছি। আমি যখন অস্ত্রউদ্ধার, মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করি, তখন তিনি গভীরভাবে শুনছেন কিংবা গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে আমার মনে হয়নি। তিনি সুদীর্ঘ নয়মাস পাকিস্তানের কারাগারে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটানোর পর দেশে এসে হয়তো আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মানসিকভাবে চিন্তামগ্ন আছেন বলে মনে হয়েছে। কিংবা হতে

পারে দেশে ফেরার পর নয়মাসের যুদ্ধের প্রকৃত পরিস্থিতি এবং ঘটনাবলি কেউ তাঁকে সত্যিকারভাবে বলেনি। যাহোক, আমি তার এ মনোভাব দেখে নিরুৎসাহিত হই এবং অস্বস্তি বোধ করি।

মরপুরে যাওয়ার আদেশ

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসটি ছিল আমাদের জন্য ঘটনাবহুল। ১০ তারিখ শেখ মুজিব দেশে ফিরে এলেন। ১২ তারিখ ছিল শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। ডিসেম্বর মাসেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আমরা অস্থায়ীভাবে ক্যাম্প স্থাপন করি। প্রায় ৮০০ সৈন্য আমার ব্যাটালিয়নে। এদের দেখাশোনা, বেতন ইত্যাদি প্রশাসনিক কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হতো। নয়মাস যুদ্ধের পর সৈন্যরা নিজেদের বাড়িঘরে গিয়ে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে মিলিত হতে উদগ্রীব ছিল। এদের মধ্যে প্রায় ৭০-৮০ জন জেসিও, এনসিও ও সৈনিক জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্টে মার্চ মাসে তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নয় মাসে এদের সঙ্গে পরিবারের কোনো যোগাযোগ ছিল না। এদিকে ঢাকা সেনানিবাসসহ অন্যান্য স্থানে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন ছিল। তাই ভারতীয় বাহিনী চলে গেলে আইনশৃঙ্খলা আমাদেরই দেখতে হবে এমন চিন্তাভাবনাও ছিল। তাই বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে বাস্তব অসুবিধার কারণে সৈনিকদের ছুটি দেওয়া সম্ভব ছিল না। ব্যাটালিয়ন কমান্ডার হিসেবে এ সবকিছু আমাকে ভাবতে হতো। এদিকে মেজর জলিলও তখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আমার কাস্টডিতে।

এরই মধ্যে একদিন, সম্ভবত ২৮ জানুয়ারি, দুপুরের দিকে জেনারেল ওসমানী ও শফিউল্লাহ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আমার হেডকোয়ার্টারে আসেন। ওসমানী আমাকে বলেন, বিহারি, রাজাকার ও তাদের সহযোগীদের গ্রেপ্তারের জন্য বাংলাদেশ পুলিশবাহিনী মিরপুর ১২নং সেকশনে যাবে। পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগীদের একটা লিস্টও তারা তৈরি করেছে। তিনি পুলিশকে সৈন্য দিয়ে সহায়তা করার জন্য আমাকে মৌখিকভাবে নির্দেশ দেন। তিনি আমাকে আরো বলেন, এক কোম্পানি সৈন্য যেন আগামীকালের (২৯ জানুয়ারি) মধ্যেই মিরপুর যায়। সেখানে গেলে পুলিশ ও ভারতীয় সৈন্যরা এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের বিস্তারিতভাবে জানাবে। এবং পরদিন ৩০ তারিখ ১২নং সেকশনে গিয়ে পুলিশকে সাহায্য করতে হবে। বলা বাহুল্য, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১০ বিহার রেজিমেন্ট, পাকিস্তান আর্মির আত্মসমর্পণের পর থেকে, মিরপুরে মোতায়েন ছিল। এই ১০ বিহার রেজিমেন্ট ১৬ ডিসেম্বর আমার ব্যাটালিয়ন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে ডেমরা হয়ে ঢাকায় প্রবেশ করে।

আমি মিরপুরের সার্বিক অবস্থা জানার জন্য ওসমানীর কাছে দুএকদিন সময় চাই। তিনি এতে বিরক্ত হন এবং বলেন, ওখানে গিয়েই তোমার অফিসাররা খোঁজখবর করুক। তিনি তাড়াতাড়ি করে সৈন্য পাঠাতে আদেশ দেন। তাঁর আদেশে আমি তৎকালীন ক্যাপ্টেন গোলাম হেলাল মোরশেদ খানকে (পরে মেজর জেনারেল, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) তাঁর কোম্পানির সৈন্যদের নিয়ে ২৯ জানুয়ারি মিরপুর যেতে আদেশ দিই। পরদিন ৩০ জানুয়ারি অভিযানের আগে আমি ১২নং সেকশনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো বলে তাঁকে জানাই।

মিরপুর ছিল বিহারি-অধ্যুষিত

এখানে মিরপুর সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করি। মিরপুর ও মোহাম্মদপুর ছিল মূলত বিহারি ও উর্দুভাষী-অধ্যুষিত এলাকা। এদের মধ্যে মোহাম্মদপুরে থাকতেন শিক্ষিত ও বড় ব্যবসায়ী এবং চাকরিজীবী শ্রেণী। বেশির ভাগ শ্রমিক শ্রেণী, বিশেষ করে রেলওয়ে, টিঅ্যান্ডটি, কলকারখানার শ্রমিক এবং মাংস ব্যবসায়ীসহ ছোট ব্যবসায়ীরা মিরপুরে থাকত। পুরো মিরপুর ছয়টি সেকশনে বিভক্ত ছিল। সেকশনগুলো হলো— ১, ২, ৬, ১০, ১১ ও ১২। এর মধ্যে ১২ নং সেকশনের বাড়িগুলো ছিল অত্যন্ত ছোট এবং এটা ছিল ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা।

১৯৬৯ সালেও মিরপুর ও মোহাম্মদপুরে বাঙালিবিরোধী দাঙ্গা হয়। সে সময় বিহারিদের হাতে বেশ কজন বাঙালি হতাহত হয়। সে সময়ও সেখানে দাঙ্গাদমনে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। ওই সময় দাঙ্গা-পরিস্থিতি নিয়ে এক সন্ধ্যায় তৎকালীন গভর্নর হাউসে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতাদের একটা বৈঠক ডাকা হয়। উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক নেতাদের সহায়তায় বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা দমন করা। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর অ্যাডমিরাল আহসানের সভাপতিত্বে সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা (আমি তখন তাঁর এডিসি), মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের বেসামরিক উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার রাও ফরমান আলী, পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। মিটিংটি অনেক রাত পর্যন্ত চলে।

মিটিংশেষে যখন জেনারেল রাজার সঙ্গে গাড়িতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যাচ্ছিলাম তখন পথে তিনি হঠাৎ করে আমাকে বললেন, 'মইন, তুমি তো আমাকে অনেক দিন থেকে চেনো। তোমার কি মনে হয় আমি প্রশাসনিক কাজে পক্ষপাতিত্ব করি?' তাঁর কথা শুনে আমি একটু হতভম্ব হয়ে পড়ি। তখন তিনি বললেন, 'আজ মিটিংয়ে আতাউর রহমান খান আমাকে বলে বসলেন, জেনারেল, আই মাস্ট কল স্পেড এ স্পেড, আর্মি ইজ সাইডিং উইথ উর্দু স্পিকিং পিপল'। একথা শুনে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করলাম এবং চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম। উল্লেখ্য, ওই দাঙ্গাদমনের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১৬ বেলুচ রেজিমেন্টের মেজর সোয়েব নামে একজন অফিসারের অধীনস্থ সৈন্যরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র (এলএমজি) ব্যবহার করেন। এতে বেশকিছু বাঙালি হতাহত হয়। সাধারণত বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা ও নিজের দেশে দাঙ্গা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে সয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবহার করার কথা নয়। যাহোক, পরে এক তদন্তে মেজর সোয়েবকে এর জন্য দায়ী করা হয় এবং জেনারেল রাজা তাঁর পদোন্নতি আটকে দেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর থেকে বিহারিরা ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে মোহাম্মদপুর, শ্যামলী, মিরপুর, পল্লবী ইত্যাদি এলাকায় হত্যা ও লুটপাট চালায়। মোহাম্মদপুর ও মিরপুর এলাকার বাঙালি অধিবাসীরা তাদের হাতে নিহত হয় কিংবা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ওই সময় ঢাকায় কর্মরত দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের মতে, ২৬ তারিখ থেকে পরবর্তী এক সপ্তাহে পাকিস্তান আর্মির সহায়তায় বিহারিরা এসব এলাকার প্রায় ২ হাজার বাঙালিকে হত্যা করে। ২৬ মার্চকে তারা প্রতিশোধ দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়ে লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাদের মতে, '৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাঙালিদের হাতে লাঞ্ছিত ও হয়রানির কারণে তারা প্রতিশোধ নেয়।

যুদ্ধের সময় বাঙালি ইপিআর (বর্তমানে বিডিআর), আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ও পুলিশ-সদস্যরা পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণে নিহত বা পালিয়ে গিয়ে যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় পাকিস্তান বাহিনী প্রায় ২০ হাজার বিহারিকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয় এবং এদের নিয়ে সিভিল আর্মড ফোর্সেস (সিএএফ) গঠন করে। এ ছাড়া স্থানীয়ভাবে রাজাকার, আলবদর ইত্যাদি বাহিনীতেও এরা যোগ দেয় এবং নয় মাস পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগী হিসেবে কাজ করে।

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলেও সিএএফসহ পাকবাহিনীর এসব সহযোগী আত্মসমর্পণ করেনি। উপরন্তু তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিশেষ করে মিরপুরে আশ্রয় নেয়। এমনকি যুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনীর চাপের মুখে যখন একে একে বিভিন্ন এলাকা থেকে পাকিস্তান আর্মি পিছু হটছিল,

তখন সেসব এলাকায় বসবাসকারী বিহারিরাও ঢাকায় চলে আসে এবং মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের মতো এলাকায় আশ্রয় নেয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১০ বিহার রেজিমেন্টকে মিরপুর এলাকায় মোতায়েন করা হয়। এই রেজিমেন্টের সদস্যরাও ছিল বিহারি। ফলে তাদের সঙ্গে স্থানীয় বিহারিদের ভাষা ও সংস্কৃতির কোনো পার্থক্য ছিল না।

মিরপুরে সৈন্য প্রেরণ

২৯ তারিখে ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদের নেতৃত্বে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে এক কোম্পানি (ডি কোম্পানি) সৈন্য মিরপুর যায়। তারা ১নং সেকশনের মাজারের পার্শ্ববর্তী স্কুলঘরে এবং ২নং সেকশনের বায়তুল আমান হাউস নামে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে অবস্থান নেয়। সন্ধ্যায় তৎকালীন হাবিলদার ওয়াজিদ আলী মিয়া বারকীর (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত অনারারি ক্যাপ্টেন এবং রাজউকে চাকরিরত) নেতৃত্বে এক প্লাটুন সৈন্য সাড়ে ১১নং সেকশনের পুলিশ পোস্টের কাছে মোতায়েন করা হয়। সেখানে ভারতীয় ১০ বিহার রেজিমেন্টের একজন জুনিয়র কমিশনড অফিসারের (জেসিও) সঙ্গে তার দেখা হয়। তিনি বারকীকে বলেন, 'এখানে কোনো সমস্যা নেই। আমরা অনেকদিন ছিলাম। তুমি যেহেতু এসে গেছ, আমরা এখন পেছনে আমাদের হেড কোয়ার্টারে চলে যাবো। চিন্তার কিছু নেই।' রাতেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা ওই স্থান ছেড়ে চলে যায়।

এদিকে ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদকেও একজন ভারতীয় মেজর ২নং সেকশনে একইভাবে আশ্বস্ত করেন এবং বলেন, মাঝে মাঝে রাতের বেলায় বাঙালি যুবকরা বিহারিদের সঙ্গে গুলিবিনিময় করে। এ ছাড়া তেমন কোনো সমস্যা নেই।

৩০ জানুয়ারির অভিযান

রাতশেষে ৩০ জানুয়ারি সকালে পুলিশ এসে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে যোগ দেয়। এরপর তারা ১২নং সেকশনে যায় এবং বিভিন্ন পয়েন্টে সৈন্য মোতায়েন করে। উদ্দেশ্য ছিল পুলিশ বাড়িঘরে তল্লাশি করে চিহ্নিত

লোকজনকে গ্রেপ্তার করবে এবং সেনাবাহিনী তাদের সহায়তা করবে। সে অনুযায়ী কয়েকটি বাড়িতে তল্লাশি করা হয় এবং কয়েকজনকে আটকও করা হয়।

সকালবেলায় আমি লে. সেলিমকে নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে ১২নং সেকশনে যাই। আমি সেকশনের মাঝামাঝি একটি উঁচু জায়গায় ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা বলি। লে. সেলিমও তখন আমার সঙ্গেই ছিলেন। এর মধ্যে সৈনিকদের খাবার নিয়ে ট্রাকও এসে পৌঁছে। এরপর আমি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আমার ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হই। লে. সেলিম মোর্শেদের সঙ্গে থেকে যান।

আমি ফিরে আসার আধঘণ্টা পর আনুমানিক ১১টার দিকে চতুর্দিকের বিভিন্ন বাড়িঘর থেকে অতর্কিতে একযোগে মোর্শেদের নেতৃত্বাধীন সৈন্য ও পুলিশের ওপর বিহারিরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র, হ্যান্ড গ্রেনেড ইত্যাদি নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ফলে চারদিকের প্রচণ্ড আক্রমণের মাঝে পড়ে পুলিশ ও সৈন্যরা হতাহত হয়। তারা পাল্টা আক্রমণের তেমন কোনো সুযোগই পায়নি। লে. সেলিম, সুবেদার মোমেন, নায়েক তাজুলসহ অনেকে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। কোম্পানি কমান্ডার হেলাল মোর্শেদ আহত হন। তাঁর কাঁধে গুলি লাগে। আহত অবস্থায়ও সৈন্যরা পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করে।

এদিকে সাড়ে ১১নং সেকশনে অবস্থান নেওয়া হাবিলদার বারকীর প্লাটুনের সৈন্যদের ওপরও বিহারিরা আক্রমণ চালায়। কিন্তু তারা সে আক্রমণ প্রতিহত করে এবং বিহারিদের অনেকে হতাহত হয়। বিহারিরা পুলিশ ফাঁড়ি দখল করতে ব্যর্থ হয় এবং পিছু হটে যায়। ওই ফাঁড়িতে ১০-১২ জন পুলিশও ছিল। সেখানে আমাদের কোনো সৈন্য বা পুলিশ হতাহত হয়নি।

এই আক্রমণের খবর শুনেই আমি আমার অধীনস্থ তৎকালীন মেজর মতিউর রহমানের (পরে মেজর জেনারেল, বর্তমানে মৃত) নেতৃত্বাধীন বি কোম্পানি নিয়ে ১২নং সেকশনের উল্টোদিকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কাছে অবস্থান নিই। সেখানে গিয়েই আমি প্রথমে ১২নং সেকশনের ভেতরে আটকে পড়া সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করি। কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হই। এরপর মিরপুর এক্সচেঞ্জ থেকে সাড়ে ১১নং সেকশনে অবস্থিত পুলিশ ফাঁড়িতে ফোন করে হাবিলদার বারকীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি। তখনও তার ওপর এবং আমাদের অবস্থান মিরপুর টেলিফোন এক্সচেঞ্জের দিকে লক্ষ্য করে বিহারিরা গুলি ছুড়ছিল। গোলাগুলির মধ্যে হাবিলদার বারকী আমাকে বিস্তারিত জানালো এবং বললো বিহারিরা তাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে। আমি তাকে ওই অবস্থানেই

থাকতে আদেশ দেই। এর পরপরই বিকেল ৪টার দিকে আমরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ওপর এবং কাছাকাছি এলাকা থেকে ১২নং সেকশনের ওপর ভারী অস্ত্রশস্ত্র, মেশিনগান ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ চালাই। সন্ধ্যার পর যখন সশস্ত্র বিহারিরা বারকীর অবস্থানের দিকে আবার অগ্রসর হচ্ছিল তখন ৮১ মিলিমিটার মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করি। আধঘণ্টা এভাবে চলার পর বিহারিদের গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

রাতে বারকীকে তার সৈন্যদের নিয়ে সেখানেই থাকতে আদেশ দেই। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিহারিরা আবার থেমে থেমে আমাদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু করে এবং বারকীর প্লাটুনের অবস্থান দখল করতে চেষ্টা করে।

পরদিন সকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে আরো ভারী অস্ত্রশস্ত্রসহ আমার পুরো ব্যাটালিয়ন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলকে মিরপুরে নিয়ে আসি। সৈন্যদের চারদিকে সতর্কতার সঙ্গে মোতায়েন করার পর ১২নং সেকশনে যাই। দুজন ভারতীয় সিনিয়র সেনা-অফিসারও আমার সঙ্গে যান। ১২নং সেকশনে গিয়ে একটি খোলা জায়গায় বিহারিদের বেশকিছু মৃতদেহ দেখতে পাই। মৃতদেহগুলো একটা শামিয়ানার নিচে সারিবদ্ধভাবে রাখা ছিল এবং বেশকিছু মহিলা, যাদের বেশির ভাগ বৃদ্ধা, পাশে বসে কোরান তেলাওয়াত করছিলেন। আমি তাঁদেরকে পুরুষ লোকজন এবং অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা কিছু জানেন না বলে জানান। ওইদিন পুরো ১২নং সেকশনে কোনো পুরুষ লোক ছিল না। রাতেই এরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

ওই সময় আমাদের সৈন্যদের কোনো মৃতদেহ দেখতে পাইনি। পরিস্থিতির কারণে তাৎক্ষণিকভাবে ভেতরের দিকে খোঁজাখুঁজি করা সম্ভব হয়নি। ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদসহ আহতরা আগের রাতেই তাদের অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তখন পর্যন্ত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) কাজকর্ম শুরু হয়নি।

ওইদিন সকালেই তৎকালীন কর্নেল শফিউল্লাহ ও খালেদ মোশাররফ মিরপুর আসেন। আমরা আলোচনা করে ঠিক করি যে, পুরো মিরপুর তথা ১নং সেকশন থেকে পর্যায়ক্রমে ১২নং সেকশন পর্যন্ত অস্ত্রমুক্ত করতে হলে আরো সৈন্য প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতেই চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, যারা কদিন আগে ঢাকায় এসে পৌঁছেছে, তাদেরকেও মিরপুরে নিয়ে আসা হয়। চতুর্থ বেঙ্গলকে ১, ২ ও ৬ নং সেকশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর আমার দ্বিতীয় বেঙ্গলকে দায়িত্ব দেয়া হয় ১০, ১১ ও ১২নং সেকশনের। আমাদের দায়িত্ব ছিল অস্ত্রউদ্ধার ও পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগীদের গ্রেপ্তার করা।

প্রতিদিন সকালে সৈন্য মোতায়েন করে কারফিউ জারি করে সেকশনের লোকজনকে উন্মুক্ত স্থানে আসার জন্য এবং যার কাছে যেরকম অস্ত্র আছে তা নির্দিষ্ট স্থানে জমা করার জন্য বলা হতো। অস্ত্র, গোলাবারুদের অবস্থান পরীক্ষা করে দেখার জন্য বাড়িঘর খালি করতে বলা হতো। এতে কিছু স্থান থেকে বাধা আসে। আমরা তা শক্ত হাতে দমন করি। ৩০ তারিখের পর আমাদের কেউ হতাহত হয়নি। বরং আদেশ অমান্য করার কারণে তাদের অনেকেই হতাহত হয়। এভাবে আমরা ১০ দিনের মতো মিরপুরে তল্লাশি চালাই এবং বিস্তারিত পরিকল্পনা করে সমস্ত অবাঙালি এবং তাদের সহযোগীদের মিরপুর থেকে ঢাকার অদূরে মুড়াপাড়ায় একটি অস্থায়ী ক্যাম্পে সরিয়ে নিই। পুলিশ বেছে বেছে কিছু রাজাকার ও তাদের সহযোগীদের গ্রেপ্তার করে। এভাবে প্রতিদিন মিরপুর থেকে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। আমার এলাকা, বিশেষ করে ১১ ও ১২নং সেকশন থেকে কয়েক ট্রাক বিভিন্ন ধরনের সয়ংক্রিয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার হয়। মিরপুরের অনেক বাড়িঘর ছিল দুর্গের মতো। শেষ পর্যন্ত মিরপুর এলাকাকে জনশূন্য করা হয়। এ সময় থেকেই ভারতীয়বাহিনী আস্তে আস্তে ঢাকা ত্যাগ করতে শুরু করে।

মিরপুর থেকে আমরা প্রথমবারের মতো ঢাকা সেনানিবাসের তৎকালীন আইয়ুব লাইন, বর্তমানে শহীদ মন্নান লাইনে এসে স্থায়ী হই। নায়েক মন্নান মুক্তিযুদ্ধের সময় সিলেটের কাছে একটি চা-বাগানে পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বেঙ্গলের সৈনিক এবং একজন ভালো বাস্কেটবল খেলোয়াড়। '৭২-এ জেনারেল আইয়ুব খানের নামানুসারে দেওয়া আইয়ুব লাইনের নাম পরিবর্তন করে এই বীর সৈনিকের নামেই ওই লাইনের নামকরণ করা হয়।

সেনানিবাসে এসে মিরপুরে ৩০ জানুয়ারির হতাহতদের ব্যাপারে বিস্তারিত অনুসন্ধান শুরু করি। সেদিন বিহারিদের আক্রমণের মুখে বেঁচে যাওয়া সেনাসদস্যদের কাছ থেকে ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনি। বিশেষ করে ডি কোম্পানির অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদ ও প্লাটুন কমান্ডার হাবিলদার ওয়াজেদ আলী মিয়া বারকী ঘটনার বিস্তারিত জানান। বারকীর প্লাটুনের কোনো সৈন্য হতাহত হয়নি। তবে ১২নং সেকশনের ভেতরে অবস্থানকারী বাকি দুই প্লাটুনের প্রায় ৪২জন সেনাসদস্য নিহত হন। এ ছাড়া কর্তব্যরত বেশ কয়েকজন পুলিশও হতাহত হন। নিহত সেনাসদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সেকেন্ড লে. এস এম কামরুল হাসান সেলিম, সুবেদার আব্দুল মোমিন, হাবিলদার ওয়ালীউল্লাহ, হানিফ, নায়েক হাফিজ, তাজুল হক প্রমুখ। এ ছাড়া ক্যাপ্টেন মোর্শেদ ও নায়েক আমীর হোসেনসহ কয়েকজন আহত হন। নিহতদের মধ্যে লে. সেলিমসহ মাত্র কয়েকজনের মৃতদেহ দিন

দুয়েক পর পাওয়া যায়। পুরো এলাকা জনশূন্য করার পরও বাকিদের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। ৩০ জানুয়ারি রাতেই সম্ভবত বিহারিরা সেগুলো সরিয়ে ফেলে।

প্রসঙ্গ জহির রায়হান

এদিকে ৩১ জানুয়ারি থেকে পত্রপত্রিকায় সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হানের নিখোঁজ হওয়ার খবর বের হতে থাকে। কিছু লোক, সম্ভবত তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব, মিরপুরে এসে তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করেন। তখন আমি তাঁকে নামে চিনতাম না বা তাঁর সম্পর্কে বিশেষ জানতাম না। এরই মধ্যে একদিন একজন পুলিশ কর্মকর্তা, যাঁর নাম আজ মনে নেই, সেনানিবাসে দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি জহির রায়হানের ছবিও নিয়ে আসেন। তিনি সৈন্যদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমার অনুমতি চান। বিস্তারিত আলাপের পর আমি ওইদিন মিরপুরে উপস্থিত সৈন্যদের কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর কথা বলার ব্যবস্থা করে দিই। সেনাসদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তিনি আবার আমার অফিসে আসেন। আলাপে তিনি আমাকে জানান, 'আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং আমাদের তদন্তে মনে হচ্ছে জহির রায়হান সৈন্য ও পুলিশের সঙ্গে গুলিবিনিময়ের সময় বিহারিদের গুলিতেই নিহত হয়েছেন।'

অবশ্য এর আগেই আমরা যখন নিজেদের সদস্যদের হতাহতের খোঁজখবর তথা প্রাথমিক তদন্ত শুরু করি, তখনই সৈন্যদের সঙ্গে একজন বাঙালি বেসামরিক লোক নিহত হয় বলে তথ্য বেরিয়ে আসে। ঘটনা বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, তিনিই ছিলেন জহির রায়হান।

জহির রায়হানের মিরপুর যাওয়া নিয়ে অনেক ধরনের কথা প্রচলিত আছে। তবে এটা সত্যি যে, তিনি তাঁর ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারের খোঁজেই মিরপুর যান। ভোরবেলায় তিনি মিরপুরে গেলে সৈন্যরা তাঁকে ভেতরে যেতে বাধা দেয়। পরে সৈনিকেরা তাঁকে ২নং সেকশনে কোম্পানি অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদের কাছে নিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন মোর্শেদ তখন পুলিশ ও তাঁর প্লাটুন কমান্ডারদের নিয়ে সমন্বয়-সভায় ব্যস্ত। ক্যাপ্টেন মোর্শেদকে তাঁর আসার উদ্দেশ্য জানানোর পর তিনি দূর থেকে সংশ্লিষ্ট সেনাসদস্যকে বলেন যে, 'ঠিক আছে তিনি পুলিশের সঙ্গে ভেতরে যেতে পারেন।' এই বলে ক্যাপ্টেন মোর্শেদ তাঁর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

প্রাথমিক তদন্তের সময় সাড়ে ১১নং সেকশনে মোতায়েন সৈন্যদের কয়েকজন জানান, সকাল সাড়ে ৯টা/১০টার দিকে তাঁরা হালকা-পাতলা গড়নের একজন বেসামরিক লোককে সাড়ে ১১ ও ১২নং সেকশনের মাঝামাঝি রাস্তায় একা একা হাঁটতে দেখেন। এ ছাড়া জহির রায়হানের ছবি দেখার পর সৈন্যদের কয়েকজন ওই রকম গড়নের একজনকে সেখানে দেখেন বলেও জানান। ১১টার দিকে বিহারিরা সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করে। অতর্কিত সেই আক্রমণে সৈন্যদের সঙ্গে তিনিও নিহত হন। তবে ঠিক কোন জায়গায় তিনি নিহত হন তখন তা সঠিক কেউ বলতে পারেনি। ৪২জন সেনাসদস্যের মধ্যে তিন-চারজনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। জহির রায়হানসহ বাকি কারোই মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।

পিলখানায় সংঘর্ষ

মিরপুরের ঘটনার খুব সম্ভবত এক বা দুদিন পর আজিমপুরে অবস্থিত তৎকালীন ইপিআর (বর্তমান বিডিআর)-এর সদর দপ্তরে দারুণ অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তৎকালীন ইপিআর-এর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকালীন অনিয়মিত বাহিনী, যেমন টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী, মুজিববাহিনী ও অন্যান্য কিছু অনিয়মিত মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের জন্য এদের সবাইকে পিলখানায় জড়ো করা হয়েছিল। তৎকালীন অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন ও আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি নুরুজ্জামানকে (পরে ব্রিগেডিয়ার) এই বাহিনীগঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান ১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামি হওয়ায় সেনাবাহিনী থেকে অবসর পান। পরে তিনি ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল মাসে তিনি একবার সিলেটের তেলিয়াপাড়া সীমান্তে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে এসে মেজর শফিউল্লাহর সঙ্গে দেখা করেন। দুমাস পর জুন মাসে তিনি সস্ত্রীক আগরতলায় যান এবং ভারতের হেজামারা নামক জায়গায় মেজর শফিউল্লাহর অধীনে ৩নং সেক্টরে যোগ দেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের শেষদিকে মেজর শফিউল্লাহকে যখন 'এস ফোর্সে'র কমান্ডার নিয়োগ করা হয় তখন নুরুজ্জামানকে ৩নং সেক্টরের অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

নুরুজ্জামানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ঘটনার দিন পিলখানায় তিনি যখন সমবেতদের

উদ্দেশে বক্তৃতা করছিলেন তখন সাবেক ইপিআরের সৈন্যগণ মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং একপর্যায়ে সেখানে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে নুরুজ্জামান গুরুতরভাবে আহত হন এবং তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

পরিস্থিতি এতোই খারাপ হয় যে, মোহাম্মদপুরে অবস্থিত তৎকালীন মেজর জিয়াউদ্দিন (পরে লে. কর্নেল ও সর্বহারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত)-এর অধীনস্থ প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এসে পিলখানার আশপাশে অবস্থান নেয়। পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব সশরীরে সেখানে যান এবং তাঁর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর তিনি বিডিআরকে নিয়ে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। সাবেক ইপিআরকে তাদের আগের অবস্থাতেই রাখা হয় এবং নাম পরিবর্তন করে বিডিআর বা বাংলাদেশ রাইফেলস করা হয়। পুলিশের জনৈক এসপি মুজিবুর রহমান কিছুদিনের জন্য এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান ছিলেন। পরে তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার সি আর দত্তকে বিডিআর-এর নিয়মিত মহাপরিচালক করা হয়।

এখানে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস বা ইপিআর সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার। ইপিআরের অধিকাংশ সদস্য বাঙালি ছিল। কিন্তু তাদের অফিসাররা পাকিস্তান আর্মি থেকে প্রেষণে আসত। বর্তমান বিডিআরের মতোই তাদের কাজ ছিল। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন পিলখানা আক্রমণ করে তখন পিলখানার বেশকিছু বাঙালি সদস্য নিহত হন এবং কিছুসংখ্যক পালিয়ে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। বাকি বেশিরভাগই বন্দি হন। যাঁরা সীমান্ত এলাকা এবং জেলা হেডকোয়ার্টারে ছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই সরাসরি নিয়মিত বাহিনী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধে তাঁদের অবদান ছিল প্রশংসনীয়।

স্বাধীনতার পরপর ইপিআরের বন্দি সদস্যরা মুক্ত হয়ে অন্যদের সঙ্গে পিলখানায় এসে জড়ো হন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন বিভিন্ন সেক্টরে যাঁরা অনিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন তাঁরাও। নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে যাঁরা যুদ্ধ করেছেন সেসব ইপিআর সদস্য তখনও পিলখানায় ফেরত আসেননি। নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গেই ছিলেন।

ওইদিন পিলখানায় যখন ইপিআর বিলুপ্ত করে অন্যান্য অনিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন পিলখানায় অবস্থিত এসব সাবেক ইপিআর-এর সদস্যরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। যাহোক, পরে তাঁদের বিডিআর নামে পূর্বাবস্থায় রাখা হয় এবং পিলখানাই তাঁদের সদর দপ্তর হিসেবে থেকে যায়। পরে নিয়মিত বাহিনী তথা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তৎকালীন ইপিআর সদস্যরা

বিডিআর-এ এসে যোগ দেন। যদিও কিছুসংখ্যক সদস্য, যেমন আমার অধীনে দ্বিতীয় বেঙ্গলে তিন কি চারজন ইপিআর সদস্য, স্থায়ীভাবে সেনাবাহিনীতে থেকে যান। এঁদের মধ্যে অন্তত দুজনের নাম আজও মনে পড়ে। তাঁরা হলেন, সুবেদার আখতার যিনি আখাউড়া যুদ্ধে আহত হন এবং নায়েব সুবেদার হেলাল।

রক্ষীবাহিনী গঠন

বাকি অনিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে পরে 'রক্ষীবাহিনী' গঠন করা হয়। এদের বেশিরভাগই ছিল কাদের সিদ্দিকীর বাহিনী ও মুজিববাহিনীর সদস্য। ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামানকে তাদের প্রধান করা হয়। রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তর করা হয় শেরেবাংলা নগরে। ওই বাহিনীর পোশাক ছিল ভারতীয় বাহিনীর তৎকালীন পোশাকের মতো— জলপাই রঙের। তাদের অধিনায়কদের লিডার বলা হতো। তাদের উপরে ছিলেন ডেপুটি ডাইরেক্টরস ও ডাইরেক্টর। তাঁদের সদস্যদের রক্ষী বলা হতো।

এখানে কাদেরিয়া বাহিনী ও মুজিববাহিনীর গঠন বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। কাদের সিদ্দিকী ছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সাবেক সৈনিক। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি টাঙ্গাইলে বেশ বড় ধরনের একটি অনিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলেন এবং ৯ মাস জুড়ে সখিপুর, ভুয়াপুরসহ টাঙ্গাইলের পুরো এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। স্বাধীনতার পর বেশ ঘটা করে তিনি ও তাঁর বাহিনী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন। তাঁর সেই বাহিনীর সদস্যরাই রক্ষীবাহিনীতে যোগ দেন।

আরেকটি হলো, মুজিববাহিনী বা বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স। সংক্ষেপে বিএলএফ। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় মে মাসের শেষ কিংবা জুনের প্রথম দিকে শেখ ফজলুল হক মনি (শেখ মুজিবের ভাগ্নে ও যুবনেতা), আবদুর রাজ্জাক (বর্তমানে মন্ত্রী), তোফায়েল আহমেদ (বর্তমানে মন্ত্রী) ও সিরাজুল আলম খানের (পরে জাসদ নেতা) উদ্যোগে এ বাহিনীর জন্ম হয়। এ বাহিনী অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার (৮ নং থিয়েটার রোড, কলকাতা) এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল অরোরার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। ভারতীয় এক্সটার্নাল ইন্টেলিজেন্স ও 'র'-এর প্রধান এবং ভারতীয় মন্ত্রিপরিষদের অধীনস্থ সচিব আর এন কাও-এর অধীনে ভারতীয় স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স

(এসএফএফ)-এর কমান্ডার মেজর জেনারেল এস এস ওবান এদের প্রশিক্ষণ ও পরিচালনের তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর মতে, মুজিববাহিনীর সদস্যদের নির্বাচন করা হতো চার যুব ও ছাত্রনেতার সুপারিশে। ভারতের একটি গোপন এলাকায় এদের ট্রেনিং দেওয়া হতো। প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার (পরে লে. জেনারেল) টি এস ওবেরয়। প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন কর্নেল বি ডি কুশাল।

মিত্রবাহিনীর কমান্ডার লে. জেনারেল অরোরার নিয়ন্ত্রণের বাইরে সরাসরি ইন্টেলিজেন্সের অধীনে এই বাহিনী গঠন করা ও তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভারতীয় সেনা প্রশাসনে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া প্রবাসী মুজিবনগর সরকারও এ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তবে কী পরিমাণ লোকজনকে এই বাহিনীর অধীনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা আমার জানা নেই। ৯ মাসের যুদ্ধে আমার এলাকায় এই বাহিনীর কোনো কর্মতৎপরতা আমার নজরে আসেনি।

তবে মেজর জেনারেল এস এস ওবান যিনি নিজেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় ওই বাহিনীর সর্বময় সামরিক কর্তা ছিলেন বলে দাবি করেন, তিনি ১৯৮৫ সালে তাঁর লিখিত ফেনটমস অফ চিটাগং— দ্য ফিফথ আর্মি ইন বাংলাদেশ নামক গ্রন্থে বলেন যে, মুজিববাহিনী যুদ্ধের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় এসএফএফ-এর সহযোগী হিসেবে কাজ করে।

এখানে এসএফএফ সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পর ভারতীয় গোয়েন্দাবাহিনীর অধীনে এই ফোর্স গঠন করা হয়। এসএফএফ-এর বেশির ভাগ সদস্য ছিল উত্তর ভারতের উপজাতীয় সম্প্রদায়ের। মূলত গেরিলাযুদ্ধের জন্য এই বাহিনী গঠন করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এই এসএফএফকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত করা হয়। এর মূল কারণ ছিল, ভারতের লুসাই পাহাড় অঞ্চলের উপজাতি মিজোরা তাদের আবাসভূমি মিজোরামের স্বাধীনতার জন্য ষাটের দশকের প্রথম থেকে লালডেঙ্গার নেতৃত্বে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে গেরিলাযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তাদের ঘাঁটি ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের সার্বিকভাবে সহায়তা করত। মূলত এই মিজোদের ঘাঁটি ধ্বংস ও তাদের দমন করার জন্য এসএফএফ-কে ওই অঞ্চলে নিয়োগ করা হয়। তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে মিজোদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করে এবং তাদের সব ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়।

যাহোক আবার রক্ষীবাহিনীর কথায় ফিরে আসি। ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে মূলত মুজিববাহিনী ও কাদেরিয়া বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে যে রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়, এস এস ওবান দাবি করেন, তাও তাঁর পরামর্শ ও

সহায়তায় করা হয়। ওবান আরো দাবি করেন, রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের ভারতে নিয়ে প্রশিক্ষণ ও সাজসরঞ্জাম দেওয়ার ব্যাপারে তিনিই ভারত সরকারকে রাজি করান। তবে এটা সবাই জানে যে, রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের (লিডার) প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো ভারতে এবং সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো ঢাকাস্থ সাভারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসারদের তত্ত্বাবধানে। অফিসারদের এই ট্রেনিংয়ের মেয়াদ প্রথম দিকে ছিল আড়াই মাস। পরে তা বাড়িয়ে ছয়মাস করা হয়। প্রশিক্ষণশেষে তাদের দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত করা হয়।

সমালোচনার মুখে রক্ষীবাহিনী

তবে একথা সত্যি, সে সময় আমাদের পুলিশবাহিনী তেমন সংগঠিত ছিল না। এ ছাড়া স্বাধীনতার পর পরিস্থিতির কারণে সমাজে একশ্রেণীর সুযোগসন্ধানী লোকের উদ্ভব হয়। অনেকের হাতে অবৈধ অস্ত্র থাকায় কিছু-কিছু এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কিছুটা অবনতি ঘটে। তার ওপর গুপ্ত বামপন্থী দলগুলো পুলিশ ফাঁড়ি, থানা ইত্যাদি আক্রমণ করে অস্ত্রশস্ত্র লুট করত। তা ছাড়া খাদ্যগুদাম লুট, পাটের গুদামে আগুন দেওয়া, রাজনৈতিক, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ নেতাদের ওপর আক্রমণ ও তাঁদের হত্যা শুরু করে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রক্ষীবাহিনীকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে মোতায়েন করতে হয়। তাদের ওপর ভরসা করার একটা বড় কারণ, এই বাহিনীর সদস্যরা ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে রক্ষীবাহিনী দ্রুতই সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তারা গুপ্ত বামপন্থী দলগুলোর সশস্ত্র আক্রমণের শিকারও হয়। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারাও অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখায়। তাই রক্ষীবাহিনী আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলে অন্য রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাত বলে অভিযোগ ওঠে। রক্ষীবাহিনীকে অনেকে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডার বলে ধারণা করতে শুরু করে। ফলে রক্ষীবাহিনী নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে তথা পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনীতে চরম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

এর প্রথম কারণ, রক্ষীবাহিনী অফিসারদের ভারতীয় উপদেষ্টাদের তত্ত্বাবধানে সামরিক প্রশিক্ষণ দান এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতো পোশাক গ্রহণ। দ্বিতীয়ত, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ। তা

ছাড়া সামরিক বাহিনীকে বঞ্চিত করে রক্ষীবাহিনীকে সরকার উন্নত বেতন, খোরাক, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে বলে প্রচারণা শুরু হয় যদিও সব অভিযোগ সঠিক ছিল না। তা সত্ত্বেও সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে বিরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল।

রক্ষীবাহিনী নিয়ে বিভিন্ন স্তরে এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং সত্য-মিথ্যা নানারকম রটনার কারণে সরকারি প্রশাসনের ওপরও এর কালিমা পড়ে। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাদের কার্যকলাপের নানারকম সমালোচনা ও সময়ে সময়ে অতিরঞ্জিত খবর ইত্যাদি বের হতে থাকে। এতে করে জনগণের মনে রক্ষীবাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতার দ্রুত অবনতি ঘটে এবং তাদের 'ইমেজ' ক্ষুণ্ন হয়। এই অবস্থা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তায়ও চিড় ধরায়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, পুনর্বাসন ও আইনশৃঙ্খলার দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটা সদ্যস্বাধীন দেশে আধাসামরিক কিংবা অন্য কোনো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা গঠন করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে রক্ষীবাহিনী নিয়ে সে সময় দেশে যে বিতর্ক, সমালোচনা ও অবিশ্বাসের ধূম্রজাল তৈরি হয়েছিল তার জন্য দায়ী মূলত এর গঠনপ্রক্রিয়া। রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের ভারতে নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং ভারতীয় অফিসারদের ঢাকায় এনে এ বাহিনীর সৈনিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাই এই বাহিনীকে নিয়ে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। কারণ ১৯৭২ সাল থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত রক্ষীবাহিনীকে যখন এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল তখন সেনাবাহিনী, বিডিআর এবং পুলিশকে বাংলাদেশের মাটিতে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে, নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এর মধ্যে সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য কুমিল্লায় মিলিটারি অ্যাকাডেমি (যা বর্তমানে চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীতে অবস্থিত) স্থাপন করা হয় এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব নিজে এর উদ্বোধন করেন। সামরিক বাহিনীর সৈনিকদের চট্টগ্রামের ইবিআরসিতে ও পুলিশকে রাজশাহীর সারদায় এবং বিডিআরের সৈনিকদের পিলখানায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এমনকি আমরা যারা সামরিক বাহিনীর কমান্ডার ছিলাম তাদেরও অধীনস্থদের কাছ থেকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো যে, অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদের যখন দেশেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তখন রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের কেন ভারতে নিয়ে প্রাথমকি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে? এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আজ বলতে হয়, যারা সে সময় রক্ষীবাহিনীর সদস্য নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, পোশাক ও পরিচালনা ইত্যাদির ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন,

হয়তো এ ধরনের একটি বাহিনী সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান, মেধা, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার প্রচণ্ড অভাব ছিল। অথবা সজ্ঞানে তাঁরা নিজেদের হীন স্বার্থে সরকারকে বিপথগামী করেছিলেন।

নতুন সেনাপ্রধান নিয়োগ ও প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসেই কর্নেল থেকে সরাসরি জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে ওসমানীকে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং কেবিনেট মন্ত্রী নিয়োগ করে বেসামরিক বিমান পরিবহণ, নৌচলাচল ও জাহাজ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে তাঁর মধ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হওয়ার একটা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল। লে. কর্নেল রবকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কর্নেল ওসমানী ও লে. কর্নেল রব উভয়েই পাকিস্তান আর্মি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে বৃহত্তর সিলেট থেকে সাংসদ (এমএনএ) নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পদোন্নতিপ্রাপ্ত লে. কর্নেল, কর্নেল ও পরে ব্রিগেডিয়ার শফিউল্লাহকে পদোন্নতি দিয়ে মেজর জেনারেল করা হয় এবং সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। জিয়াউর রহমান এবং শফিউল্লাহ একই দিনে পাকিস্তান মিলিটারি অ্যাকাডেমি কাকুলে যোগদান করেন ও একই দিনে কমিশন পেয়ে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পদে নিয়োগ পান। (তখন নিয়মিত কমিশনের জন্য সামরিক অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল দুবছর, পরে আমাদের সময়ে তা বাড়িয়ে আড়াই বছর করা হয়)। আর্মিতে অফিসারদের জ্যেষ্ঠতা নির্ণয় করা হয় তাঁদের সামরিক প্রশিক্ষণের সার্বিক ফলাফলের ভিত্তিতে। একই দিনে জিয়াউর রহমান ও শফিউল্লাহ কমিশন পেলেও প্রশিক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে জিয়াউর রহমানকে জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা হয়। জেনারেল জিয়া জ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আর্মিতে রেখে জেনারেল শফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করায় নৈতিক দিক দিয়ে সেনাবাহিনী পরিচালনায় স্বভাবতই তাঁর দুর্বলতা থাকার কথা।

এ নিয়োগ সম্পর্কে পরবর্তীকালে আমি কথা প্রসঙ্গে জেনারেল রবকে জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে তিনি আমাকে জানান, প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ মুজিবের কাছে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সিনিয়র অফিসারদের তালিকা তিনি এবং জেনারেল ওসমানী নিয়ে গেলে শেখ মুজিব শফিউল্লাহকে

সেনাপ্রধান নিয়োগ করেন। এ ব্যাপারে তাঁর এবং জেনারেল ওসমানীর কোনো সুপারিশ ছিল না বলে তিনি আমাকে জানান।

সে সময় দেশে পাঁচটি ব্রিগেড ছিল। কোনো ডিভিশন ছিল না। ঢাকায় অবস্থিত ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর থেকে পদোন্নতি প্রাপ্ত লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন (পরবর্তীকালে সর্বহারা দলের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত)। চট্টগ্রামে কর্নেল শওকত, কুমিল্লায় ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমান, যশোরে কর্নেল মঞ্জুর এবং রংপুরে লে. কর্নেল শাফায়াত জামিলকে ব্রিগেড কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। কয়েক দিন পরেই ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে উপসেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তার ফলে তিনি ঢাকায় আর্মি হেডকোয়ার্টারে চলে আসেন। তখন আর্মি হেডকোয়ার্টারে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সিজিএস হিসেবে স্টাফ অফিসার ছিলেন। তখনও আমি সেই মেজর পদেই ঢাকা সেনানিবাসে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক।

স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে যে নয়জন তৎকালীন মেজরকে কেন্দ্র করে নিয়মিত মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠে, জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী তাঁরা হচ্ছেন : মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর শফিউল্লাহ, মেজর মীর শওকত আলী, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর নাজমুল হক, মেজর নুরুল ইসলাম, মেজর শাফায়াত জামিল ও মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী। এরপর আগস্ট মাসে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে যে তিনজন মেজর মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন তাঁরা হলেন : মেজর আবুল মঞ্জুর, মেজর আবু তাহের ও মেজর জিয়াউদ্দিন।

পাকিস্তান আর্মিতে চাকরিরত নয়জন মেজর এবং পরে মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝিতে আগস্ট মাসে পাকিস্তান থেকে আগত তিনজন মেজর অর্থাৎ মোট ১২ জন মেজর স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাকি অফিসাররা ছিলেন ক্যাপ্টেন ও লেফটেন্যান্ট পদে কর্মরত। এ ছাড়া অবসরকালীন ছুটিতে থাকা অবস্থাতেই মেজর সি আর দত্ত স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি পদোন্নতি পেয়ে মেজর জেনারেল হন এবং ওই পদেই অবসর গ্রহণ করেন।

আর্মি হেডকোয়ার্টারে সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ ও উপসেনাপ্রধান জেনারেল জিয়ার সম্পর্ক ভালো ছিল না। কারণ, জেনারেল জিয়ার সিনিয়রিটি ডিঙিয়ে জেনারেল শফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। আর্মিতে সিনিয়রকে ডিঙিয়ে জুনিয়রকে সেনাপ্রধান করা হলে স্বভাবতই সিনিয়রকে অবসর দেওয়াই শ্রেয়। অন্যদিকে জেনারেল জিয়া ও ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের মধ্যেও সম্পর্ক ভালো ছিল না। তবে খালেদ

মোশাররফের সঙ্গে জেনারেল শফিউল্লাহর ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে ধারণা করা হতো। আর্মিতে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদা-বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেনারেল জিয়া ও ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং অন্য অফিসারগণ সর্বদা প্রচেষ্টা চালাতেন। এটা জুনিয়র অফিসাররাও জানতেন এবং ভালোভাবেই তা উপলব্ধি করতেন। ফলে জুনিয়র অফিসারগণ এর সুযোগ নিতে সচেষ্ট হতেন। এভাবে স্বাভাবিক আর্মি শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটে। যদিও শফিউল্লাহ ছিলেন সেনাপ্রধান তবু তিনি এদের নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হননি। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কিছু সামরিক অফিসার ও সৈনিক কর্তৃক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবকে হত্যার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়। মূলত গত ২৮ বছরে বিভিন্ন সময় সেনাবাহিনীতে সেনাপ্রধানের কমান্ড ও কন্ট্রোল না থাকায় সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে, যা পুরো জাতিকে বারবার বিপর্যস্ত করেছে। তবে এসব দুঃখজনক ঘটনার দায় সেনাপ্রধানের পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের ওপরও বর্তায়।

এদিকে ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানফেরত আর্মি অফিসারদেরও 'সিনিয়র-জুনিয়র'-সংক্রান্ত সমস্যা হয় মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সঙ্গে, যার প্রত্যক্ষ পরিণাম ১৯৮১ সালের জিয়া হত্যাকাণ্ড এবং পরে বহু মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের ফাঁসি ও আর্মি থেকে বহিষ্কারের ঘটনা।

১৯৭১-এ সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উদ্ভব ঘটে। এ আর্মিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তোলার জন্য দক্ষ ও বিচক্ষণ সামরিক নেতৃত্ব এবং দেশের রাজনৈতিক নেতা ও সরকারের সদিচ্ছা এবং সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। আমি জেনারেল জিয়া ও জেনারেল শফিউল্লাহকে আগে থেকেই ভালোভাবে জানতাম। ১৯৬৯ সালে আমি যখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের এডিসি এবং পরে জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান করি তখন থেকেই তাঁদের সঙ্গে পরিচিত। তা ছাড়া আমি স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে শফিউল্লাহর 'এস ফোর্সের' অধীনে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলাম। জিয়ার অধীনেও আমি 'জেড ফোর্সে' কয়েক মাস প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলাম। তাই যুদ্ধকালে তাঁদের অনেক কাছ থেকে দেখেছি।

শফিউল্লাহ ও জিয়ার এ প্রভাববিস্তারের দ্বন্দ্ব চলাকালে সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে শওকত, তাহের, জিয়াউদ্দিন এবং মঞ্জুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জিয়াকে সমর্থন দিতেন। তাঁরা মনে করতেন খালেদ মোশাররফ সেনাপ্রধানকে নানাবিধ বিষয়ে সমর্থনপূর্বক পরামর্শ দিচ্ছেন। এ নিয়ে সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ বেশ বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন। আমার সঙ্গে

তাঁদের সম্পর্ক ছিল বেশির ভাগ পেশাগত। আমি সর্বদা এসব দলাদলি ও দ্বন্দ্ব থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতাম। তাই বলতে দ্বিধা নেই, মুজিবহত্যার সময় আমি একজন সিনিয়র অফিসার অর্থাৎ কর্নেল এবং জিয়া-হত্যার সময় মেজর জেনারেল পদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ঢাকায় থাকা সত্ত্বেও আমাকে কোনো ঘটনায় সাক্ষী বা দোষী হিসেবে কিংবা অন্য কোনোভাবে জড়িত করা যায়নি। কারণ, এসব অপেশাদার কাজকর্মে আমি কখনো উৎসাহ বোধ করিনি এবং এ ব্যাপারে আমি অন্যদেরও নিরুৎসাহিত করতাম। আরেকটা বিষয় এখানে প্রণিধানযোগ্য, কোনো কোনো ঊর্ধ্বতন সামরিক অফিসার রাজনীতিবিদদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন, যার পরিণতিতে জুনিয়র অফিসারগণও রাজনৈতিক নেতাদের মাধ্যমে আর্মিতে সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য উৎসাহিত এবং প্রভাবিত হতেন, যা সামরিক পেশা ও শৃঙ্খলার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এরকম কার্যকলাপ আর্মির ভাষায় অফিসারসুলভ আচরণ নয় এবং আর্মি আইনের ৫৫ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ।

সামরিক বাহিনীতে উচ্ছৃঙ্খলতা

১৯৭২ সালের জুন মাসের দিকে ঢাকায় বিমানবাহিনীর কিছু জুনিয়র ও নন-কমিশন্ড অফিসার তাদের বেতন, ভাতা, রেশন, পোশাক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করে। তারা বিমানবাহিনী প্রধান ও অন্যান্য অফিসারকে অন্তরীণ করে দাবিআদায়ের চেষ্টা চালায়। কারণ সে সময় বেতন ও আনুষঙ্গিক প্রাপ্ত সুবিধাগুলো ছিল অপ্রতুল। কিন্তু সামরিক বাহিনীতে এসব আন্দোলন বা বিদ্রোহ প্রশ্রয় দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। শৃঙ্খলারক্ষার জন্য প্রয়োজনে সামরিক বাহিনীতে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয়। তা না হলে সামরিক বাহিনী ও শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না। দুপুরবেলায় আমি যখন অফিস থেকে বাসায় ফিরি তখন আমাকে এ বিদ্রোহ সম্পর্কে জানানো হয়। ৪৬ ব্রিগেডের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে এ উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমরা যথারীতি সেখানে গিয়ে এ উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের ব্যবস্থা করি।

পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ঢাকায় রাখার জন্য কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঢাকা সেনানিবাসে নির্মাণ করা হয়েছিল তৎকালীন সিগনাল অফিসার্স মেস। সেখানে বিমানবাহিনীর প্রায় ৪০০জন বিদ্রোহীকে আটক করে রাখা হয়। আটককৃত এসব লোকজন প্রায় সারারাত অনশন পালন করে। তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে

রাখা হয় এবং পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সকালেই তারা অনশন ভঙ্গ করে। এরপর নেতাগোছের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং পরে বেছে বেছে দায়ী কিছু ব্যক্তিকে কোর্ট মার্শাল করে চাকরিচ্যুত করা হয়। আমার মতে, শুধু চাকরিচ্যুতির ওই শাস্তি বিদ্রোহের জন্য যথেষ্ট ছিল না। ফলে এর পরও বিমানবাহিনীতে উচ্ছৃঙ্খলতার ঘটনা ঘটেছে।

রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আমাকে তাঁর সামরিক সচিব হিসেবে নিয়োগের জন্য সেনাপ্রধানকে মৌখিক নির্দেশ দেন। সেনাপ্রধান আমাকে সেখানে সত্বর যোগদান করতে বলেন। উল্লেখ্য, পাকিস্তান আমলে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন আমি ঢাকায় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের অধীনে কর্মরত। তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব হিসেবে বঙ্গভবনে যাওয়ার পর রাষ্ট্রপতি আমাকে বঙ্গভবনের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানান। বঙ্গভবনে তখন প্রশাসনব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিল না। তিনি সেখানকার গাড়ি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ঢালাও অপব্যবহার ও অব্যবস্থা সম্পর্কে আমাকে বলেন। বঙ্গভবনের অনেক আসবাব ও তৈজসপত্র উধাও হওয়ার কিছু ঘটনাও তিনি আমাকে জানান। এসব নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে বেশ বিব্রত, হতাশ এবং উদ্বিগ্ন মনে হয়েছিল।

তিনি আমাকে নির্দেশ দেন, আমি যেন এসব আইনের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করি। রাষ্ট্রপতির নির্দেশ পেয়েই আমি কাজে লেগে পড়ি। আমি আইনানুযায়ী সবকিছু দেখাশোনার কাজ শুরু করি। বঙ্গভবনের সরকারি হিসাবপত্র থেকে সবকিছুতেই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হই। হিসাবপত্র নিতে গিয়ে আমি লক্ষ করি, অনেক মূল্যবান আসবাবপত্র এমনকি বাসনকোসনও পাওয়া যাচ্ছিল না।

অল্প যে-কদিন রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে আমি কাছ থেকে দেখেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, তিনি চাইতেন রাষ্ট্রপতির অফিসের গাম্ভীর্য, স্বাতন্ত্র্য, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা যেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালিত হয়। তাঁর এই নীতিবোধের বিষয়গুলো আমার খুব ভালো লাগে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার একটি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সে সম্পর্ক দীর্ঘদিন, এমনকি কর্মসূত্রে আমি দেশের বাইরে থাকার সময়ও বলবৎ ছিল।

যাহোক, আমি বঙ্গভবনে থাকাকালে একদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমি প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে নিচে যাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব আমাকে দেখে একটু মুচকি হাসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি এখানে কবে এসেছ?' আমি সংক্ষেপে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিই। রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব হিসেবে আমার যোগদানের বিষয়টি হয়তো তিনি তখনও অবগত হননি বা হলেও তাঁর মনে ছিল না। তাই আমাকে বঙ্গভবনে দেখে তিনি একটু অবাক হয়েছিলেন বলেই আমার মনে পড়ে।

এর আগে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন গার্ড অফ অনার পরিচালনার সময়, ১২ তারিখ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর শপথের দিন বঙ্গভবনে (ওইদিনের জন্য আমি সামরিক সচিব হিসেবে কাজ করি) এবং রেসকোর্স ময়দানে আমাদের ক্যাম্প পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। ততদিনে তিনি আমাকে বেশ ভালোভাবেই জেনেছেন বলেই আমার মনে হয়। বঙ্গভবনে সেদিনের দেখার সপ্তাহখানেক পর সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ আমাকে জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব আমাকে সামরিক বাহিনীতে রাখাই শ্রেয় বলে মনে করেন।

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীচুক্তি কি গোপনীয় উপহার?

এর মধ্যে এক ব্যতিক্রমি ঘটনা ঘটে আর্মিতে। ঢাকা ব্রিগেডের কমান্ডার লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায় ১৯৭২ সালের শেষদিকে নিজের নামে 'হিডেন প্রাইজ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৯ মার্চ ১৯৭২ তারিখে ২৫ বছর মেয়াদি স্বাক্ষরিত চুক্তিতে অনেক গোপন শর্ত আছে বলে প্রকাশ করেন এবং দাবি করেন সেগুলোতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে। ওই প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লেখেন, 'উই গট ইন্ডিপেন্ডেন্স উইদাউট শেখ মুজিব অ্যান্ড ইফ নেসেসারি উই উইল ডিফেন্ড ইট উইদাউট হিম।' সে লেখায় তিনি ওই চুক্তি বাতিলেরও দাবি করেন। এখনও আমার মনে আছে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীচুক্তি সম্পর্কে জিয়াউদ্দিনের লিখিত এ প্রবন্ধের বিপরীতে তখন কোনো সরকারি বক্তব্য রাখা হয়নি। চাকরিরত একজন সামরিক অফিসার ঢাকা ব্রিগেডের কমান্ডারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা অবস্থায় স্বনামে প্রবন্ধ লেখায় তা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ওই প্রবন্ধ লেখার পর তিনি তাঁর অধীনস্থ

অফিসারদের এ সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে বলে উত্তেজিত করতেন। ফলে ৪৬ ব্রিগেড তখন সরাসরি কঠোর সরকারি সমালোচনায় মুখর। এমনকি তখন সেখানে প্রায় বিদ্রোহের মতো পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল এবং যে-কোনো সময় গুরুতর সামরিক শৃঙ্খলাভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দেয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব তখন বিদেশে ছিলেন। ফিরে এসে তিনি এসব জেনে জিয়াউদ্দিনকে ৪৬ ব্রিগেড থেকে সেনাসদরে বদলি করার আদেশ দেন এবং আমাকে ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার নিযুক্ত করেন। দিনের বেলায় আদেশ দিয়ে পরদিন সকালে আমাকে দায়িত্ব নিতে বলা হয়। আমি তখনও বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব। সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ্ আমাকে জানালেন, আমি যেন রাষ্ট্রপতিকে আমার এ নতুন নিয়োগ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করি।

বঙ্গভবন থেকে আমাকে সরিয়ে নিলে রাষ্ট্রপতি মনঃক্ষুণ্ন হতে পারেন, এই ভেবে জেনারেল শফিউল্লাহ্ নিজে না বলে বিষয়টি আমাকে জানাতে অনুরোধ করলেন। আমি রাষ্ট্রপতিকে আমার বদলির বিষয়ে অবহিত করি। শুনে তিনি বেশ অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, আমার সামরিক সচিবের পদ কি গুরুত্বপূর্ণ নয়? আমি তাঁকে সবিনয়ে ৪৬ ব্রিগেডের শৃঙ্খলাভঙ্গের বিষয়টি জানাই। বিস্তারিত জানার পর তিনি সেনাবাহিনীতে আমার ফেরত যাওয়ার বিষয়ে সম্মত হন। আমি মাত্র সপ্তাহ্ তিনেকের মতো রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব ছিলাম। আসলে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব তখন আমার সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা পোষণ করতেন। তাই আমি সক্রিয়ভাবে সেনাবাহিনীর সঙ্গে জড়িত থাকি— সেটাই তিনি শ্রেয় মনে করতেন।

এদিকে আমি এবং জিয়াউদ্দিন তখন সেনানিবাসের স্কুল রোডে (পরে শহীদ বদিউজ্জামান রোড এবং অতিসম্প্রতি স্বাধীনতা সরণি) পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম। দুজনেই অবিবাহিত এবং ভালো বন্ধু ছিলাম। আমাদের খাওয়াদাওয়া প্রায়ই একসঙ্গে হতো। তিনি একজন সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক অফিসার ছিলেন, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। আমার বিশ্লেষণে তিনি একজন তত্ত্বীয় ও দার্শনিক সেনা-অফিসার ছিলেন। তিনি বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনীতি তথা চে গুয়েভারা, ফিদেল ক্যাস্ট্রো এঁদের দর্শনে হয়তো প্রভাবিত ছিলেন। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান থেকে এসে তিনি, তাহের ও মঞ্জুর স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দেন। আমি যখন তাঁকে প্রশ্ন করি, ওই প্রবন্ধে লিখিত এতসব তথ্য তিনি কোথা থেকে পেলেন— উত্তরে তিনি আমাকে জানান, জেনারেল ওসমানী তাঁকে ওইসব তথ্য সরবরাহ করেন এবং তা তিনি বিশ্বাসও করতেন।

৪৬ ব্রিগেডে নতুন দায়িত্ব

পরদিন সকালে আমি ৪৬ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে যাই এবং লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিনকে জানাই, তাঁর জায়গায় আমাকে ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। জিয়াউদ্দিন এ সম্পর্কে মোটেই অবহিত ছিলেন না। আমি লিখিত আদেশ দেখালে তিনি চেয়ার ছেড়ে টেবিলের উল্টোদিকে গিয়ে বসেন। হলিডেতে প্রবন্ধ লেখার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে কি না জিয়াউদ্দিন আমার কাছে তা জানতে চান। আমি উত্তরে বলি, এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। এরপর আমি তাঁর কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করি এবং কাগজপত্র বুঝে নিই। তিনি তখন ছুটির দরখাস্ত দিয়ে আমাকে তা সেনা-সদরে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। আমি ফোনে সেনাপ্রধানকে আমার দায়িত্বভার নেওয়ার বিষয়ে অবহিত করি। তাঁকে জিয়াউদ্দিনের ছুটির কথাও বলি।

কয়েকদিন পর জিয়াউদ্দিন ছুটিতে চলে যান। ছুটিতে গিয়ে তিনি আর আর্মিতে ফেরত আসেননি। পরে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। তখন ৪৬ ব্রিগেডের অধীনে ৪ হাজারের বেশি অফিসার ও সৈন্য ছিল। এর অধীনে প্রধান ইউনিট ছিল প্রথম ইস্ট বেঙ্গল, দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল, চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল, ১৬ ইস্ট বেঙ্গল, ২ ফিল্ড আর্টিলারি ও প্রথম বেঙ্গল ল্যান্সার।

উল্লেখ্য, জিয়াউদ্দিন লে. কর্নেল র‍্যাঙ্কে থেকেই ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন, যদিও এ পদে একজন ব্রিগেডিয়ারের থাকার কথা। কিন্তু যুদ্ধের পরপর আমাদের অনেককেই বাস্তব কারণে উপরের র‍্যাঙ্কের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে।

দায়িত্ব নেওয়ার পর সেদিনই আমি ব্রিগেড স্টাফ অফিসারদের আমার কক্ষে ডাকি এবং সব অফিসারকে ২ ফিল্ড আর্টিলারি ইউনিটে দুই ঘণ্টার মধ্যে জড়ো হতে বলি। হঠাৎ ব্রিগেড কমান্ডার বদল হওয়ায় সবাই অবাক হয়েছে বলে মনে হলো। তারা তৎক্ষণাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতি আঁচ করতে পারেনি। ঢাকা ব্রিগেড তথা ৪৬ ব্রিগেডের আওতাধীন সব ইউনিটের অফিসাররা ওই স্থানে জড়ো হলে আমি তাদের উদ্দেশে ৪০ মিনিটের মতো ভাষণ দিই। ওই বক্তৃতায় আমি ৪৬ ব্রিগেডকে পেশাদার, বলিষ্ঠ, গতিশীল, দৃঢ়, নিয়মানুবর্তী ও সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তোলার পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করি। আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করি, এ ব্রিগেড হবে সম্পূর্ণ দলাদলিমুক্ত, প্রত্যেক অফিসার ও সৈনিকের জন্য আইন হবে সমভাবে প্রযোজ্য। রাজনৈতিক আলোচনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করি। কেউ ইউনিটের বাইরে ব্রিগেড কিংবা সেনাসদরে যেতে চাইলে তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণপূর্বক অনুমতিসাপেক্ষে যেতে হবে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করি। কেউ যেন অধিনায়কদের বৈধ আদেশ

অমান্য করার মতো মনোভাব পোষণ না করে সে ব্যাপারেও তাদের হুঁশিয়ার করে দিই। যদি কেউ সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিই। আমি তাদের আরো বলি, সেনাবাহিনীতে সবাই স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে যোগদান করেছেন। কাউকে জোর করে ধরে এনে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ করা হয়নি। ফলে কারো পছন্দ না হলে, এভাবে চাকরি করতে না চাইলে তারা যেন সামরিক পোশাক ছেড়ে দিয়ে তা করে, চাকরিতে থেকে নয়।

ঠিক এভাবে আমি ঢাকা ব্রিগেডের বিভিন্ন ইউনিটের জেসিও/এনসিও এবং সিপাহিদের পরিষ্কার ও সোজাভাবে বলি যে, সিপাহি থেকে শুরু করে অধিনায়ক পর্যন্ত সকলের জন্য আইন সমভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রয়োজনে উচ্ছৃঙ্খলতা কঠোর হস্তে দমন করা হবে। একইভাবে হুঁশিয়ার করি যে, যদি কোনো অধিনায়ক কোনো পর্যায়ে অবৈধ আদেশ দেন তা যেন তারা অগ্রাহ্য এবং প্রত্যাখ্যান করে। আমি সহজভাবে তাদের সামনে কিছু অবৈধ আদেশের দৃষ্টান্ত তুলে ধরি। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, আমিই সম্ভবত প্রথম বাঙালি সামরিক অফিসার যাকে পাকিস্তান সামরিক অ্যাকাডেমি কাকুল-এ শৃঙ্খলার দায়িত্বে ব্যাটালিয়ন সার্জেন্ট মেজর হিসেবে ১৯৬৪ সালে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তাই শৃঙ্খলার জন্য কী কী করা প্রয়োজন এবং কীভাবে তা প্রয়োগ করতে হবে সেসব প্রশিক্ষণ ও আইনকানুন প্রয়োগের ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত ছিলাম এবং নিজের ওপরও আস্থা ছিল।

শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেম সামরিক বাহিনীর ভিত্তি। উচ্ছৃঙ্খল সামরিক বাহিনী রাস্তার দাঙ্গাবাজদের চেয়েও ভয়ঙ্কর। তারা একটা দেশকে যে-কোনো সময় ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাই প্রয়োজনে সামরিক বাহিনীতে আইনকানুন প্রয়োগ করতে আমি সবসময় দ্ব্যর্থহীন ছিলাম। ৪৬ ব্রিগেডে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও দ্বিধাবোধ করিনি। আমি ব্রিগেডের সব ইউনিটে পুরোদমে প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করি। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রাতে প্রশিক্ষণের প্রথা চালু করি। এ প্রশিক্ষণ ভোর পর্যন্ত চলত। ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকে শুরু করে প্রত্যেক ইউনিটের এই প্রশিক্ষণ-পদ্ধতিতে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। প্রশিক্ষণকালীন সব অফিসার ও সৈন্যকে উপস্থিত থাকতে হতো এবং কার্যক্রমে সরেজমিনে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণ করতে হতো। এতে ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগই রাখিনি। আমার ওই সামরিক কার্যকলাপে কিছু সিনিয়র অফিসার অসন্তুষ্ট ছিলেন। হয়তো আমার ব্রিগেডে তাদের কিছু জুনিয়র প্রিয়পাত্রের এসব পছন্দ হতো না। তারা সেসব সিনিয়রদের কাছে গিয়ে নালিশ করত। তাঁরা মনে করতেন, আমি খুব বেশি চাপ প্রয়োগ করছি।

তবে আমি আর্মিতে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য কোনোকিছু করতে কখনো উদ্যোগী হইনি। সর্বদা আর্মি শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার ওপর জোর দিয়েছি। এমনকি স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীনও আমার অধীনস্থ অফিসার এবং সৈনিকগণকে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও আইনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে শ্রদ্ধাশীল হতে সর্বদা উপদেশ দিয়েছি এবং প্রয়োজনে তা পালন করতে বাধ্য করেছি। ফলে আমার অধীনে সে সময় কোনো উচ্ছৃঙ্খলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো, '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর আমার অধীনস্থ দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ঢাকায় প্রবেশ করলেও কোনো পরিত্যক্ত দোকানপাট বা ঘরবাড়িতে লুটপাট কিংবা অন্য কোনো অনৈতিক বা অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে ছিল না। বলতে দ্বিধা নেই, এই লেখা লিখতে বসে আজ সেসব সৎ সৈনিকের কথা মনে পড়ে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠছে। ঢাকায় সে সময়কার লুটপাটের কথা অনেকেরই মনে আছে এবং এ লেখায় আগেই আমি তা বর্ণনা করেছি।

ইউনিটগুলোতে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কি না তা যাচাই করার জন্য একদিন ভোরে আমি জয়দেবপুরস্থ ১৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পরিদর্শনে যাই। সেখানে গিয়ে দেখতে পাই, ভোরে প্রশিক্ষণ চলাকালে কোনো অফিসার উপস্থিত নেই। তখন সেখানে উপস্থিত সুবেদার মেজরকে বলে আসি, অধিনায়ক যেন আমার সঙ্গে ঢাকায় ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে এসে দেখা করেন। বলেই আমি জয়দেবপুর থেকে ঢাকায় চলে আসি। অধিনায়ক দুপুরবেলায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এলে তাঁকে নির্দেশ দিই তাঁর সমস্ত অফিসার ও সৈনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পায়ে হেঁটে যেন সন্ধ্যার মধ্যে ঢাকা সেনানিবাসে ব্রিগেড মাঠে এসে উপস্থিত হন। তাঁকে আরো বলি সেখানে রাতের খাবারের ব্যবস্থা থাকবে। পরদিন সকালে তারা পায়ে হেঁটে আবার জয়দেবপুর যাবে।

আমি এই দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি শুধু এজন্য যে, আর্মিতে আইনশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা যেন ঠিক থাকে তার যথার্থ বিকাশের স্বার্থে। অন্য কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। এখানে একটি সামরিক প্রবাদ উল্লেখ করা প্রয়োজন— 'কম্যান্ড ইজ সিম্পল ইন কনসেপশন বাট ডিফিকাল্ট ইন এক্সিকিউশন'। সামরিক বাহিনীতে আদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু বাস্তবে তা পালন করানো সহজ নয়, বিশেষ করে যুদ্ধ কিংবা কোনোরকম সমস্যা প্রাণপণ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে, যার প্রমাণ বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর ইতিহাসে অসংখ্য রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সাহসিকতা পদক

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের কার্যালয় ছিল কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে। সেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের অধিনায়ক কর্নেল ওসমানী থাকতেন এবং তাঁর অফিসও সেখানেই ছিল। সে সময় বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান এক অধ্যাদেশবলে সাহসিকতা পুরস্কার পদক প্রবর্তন করেন। সবাইকে এ মর্মে তিনি একটা বিজ্ঞপ্তি বিলি করেন। সাহসিকতার জন্য পদকগুলো নিম্নরূপ মর্যাদাভিত্তিক ছিল : ১) বীরশ্রেষ্ঠ, ২) বীর উত্তম, ৩) বীর বিক্রম এবং ৪) বীর প্রতীক।

যুদ্ধ চলাকালে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে বাংলাদেশ সরকার তাৎক্ষণিকভাবে সাহসিকতার পদকে ভূষিত করেন। তবে সে সময় কোনো মেডেল বা সনদপত্র ছিল না। শুধু পত্রের মাধ্যমে জানানো হতো। যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে অধিনায়কদের তাঁদের অধীনস্থ অফিসার, সৈনিক ও বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতার বিষয়ে লিখিত আকারে প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য বলা হয়। যুদ্ধের সময়ও কিছু-কিছু প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছিল। স্বাধীনতার পরপর ঢাকায় মিন্টো রোডের একটা বাড়িতে কর্নেল ওসমানী থাকতেন। সেখানে কয়েকজন সেক্টর কমান্ডার মিলে সাহসিকতার পদকের তালিকা তৈরি করেন। কর্নেল ওসমানীর স্বাক্ষরে প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ মুজিবের অনুমোদনের পর সে তালিকা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ওই তালিকা দেখে মুক্তিযোদ্ধা জুনিয়র অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কারণ, সব সেক্টর কমান্ডারকে বীর উত্তম খেতাবে (জীবিতদের জন্য সর্বোচ্চ খেতাব) ভূষিত করা হয়েছে। অথচ বেশির ভাগ সেক্টর কমান্ডারের সদর দপ্তর ছিল ভারতের অভ্যন্তরে এবং যুদ্ধের নয়মাস তাঁরা সেখানেই কাটিয়েছেন। তাঁরা কোথায় বীরত্ব দেখালেন তা নিয়ে কানাঘুষা শুরু হল।

সেক্টর কমান্ডারদের দায়িত্ব ছিল প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা, যুদ্ধ পরিচালনা, প্রশাসন, নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে। ফলে সব সেক্টর কমান্ডার যে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তার কোনো লিখিত প্রমাণ বা প্রতিবেদন ছিল না। সেক্টর কমান্ডার হিসেবে অনেকের নিয়োগও বিতর্কিত ছিল। কারণ এক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা, যোগ্যতা ও নিয়মনীতির কোনো বালাই ছিল না। নিয়মিত বাহিনীর কমান্ডারগণ, যাঁরা সম্মুখসমরে নয়মাস যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তাঁদের অনেককেই উপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

তা ছাড়া এমনও হয়েছে যে, সরাসরি বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো যুদ্ধে লিপ্ত ছিল না এমন কিছু ব্যক্তিকেও সাহসিকতার পুরস্কার দেওয়া হয়। যারা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যথা পরিকল্পনা, প্রশাসন, প্রচার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন তাঁদের সাহসিকতার পদক দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বরং তাঁদেরকে অন্য কোনো পদক যথা প্রশাসনিক পদক দেওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। সেটা অন্যান্য দেশেও প্রচলিত। কারণ, এসব কাজ সাহসিকতার পর্যায়ে পড়ে না।

সাহিসকতার এ পদক নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় একজন ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে আমি তা নিয়ে সেনাপ্রধান শফিউল্লাহর সঙ্গে আলোচনা করি। তিনি আমাকে প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ মুজিবের কাছে নিয়ে যান। আমি প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অবহিত করি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পদকতালিকা রহিত করার আদেশ দেন। এ রহিতাদেশ পরের দিনই পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু কয়েক দিন পর ওই রহিতাদেশ বাতিলপূর্বক আগের পদকগুলোই বহাল রাখা হয়।

পরে জেনেছি ওই তালিকা বহাল রাখার জন্য স্বার্থান্বেষী মহল থেকে জোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। পরে আমি যখন বাংলাদেশ আর্মির অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল হই তখন এ-সংক্রান্ত কাগজপত্র খুঁজে সাহসিকতা পদকপ্রাপ্ত অনেকেরই লিখিত প্রতিবেদন (Citation) পাইনি। শুধু একটা নামের তালিকা ও সরকারি গেজেট ছিল। উল্লেখ্য, এ পদকপ্রাপ্তির সুপারিশের সঙ্গে সাহসিকতার প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ্য ন্যূনপক্ষে দুতিনজন চাক্ষুষ সাক্ষী, বক্তব্য ইত্যাদির এবং এর পরে প্রয়োজনে অনুসন্ধান করে যাচাই করার ব্যবস্থা থাকাই নিয়ম। তার পরেই যথাযথ নিরীক্ষার ভিত্তিতে সাহসিকতা পদক পাওয়ার কথা। অথচ স্বাধীনতাযুদ্ধে সাহসিকতার জন্য পদক দেওয়া হয়েছে এমন ব্যক্তিদেরও, যাঁরা যুদ্ধের নয়মাস বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেননি।

মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র ও ফ্রাইডে ফাইটার

ঠিক এমনিভাবে মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র ইস্যু ও বিতরণ নিয়ে অনেক অনিয়ম করা হয়। এ নিয়ে এমন হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যেজন্য প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা আজও ক্ষুব্ধ। যাচাই না করে ঢালাওভাবে মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র দেওয়া হয় দেশের লোক থেকে শুরু করে ভারতে অবস্থানকারী শরণার্থী

পর্যন্ত— যুদ্ধে যাদের কোনো প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অবদান ছিল না। এমনকি সময়ে সময়ে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কর্মকর্তা করা হয় এমন সব ব্যক্তিকে যাঁদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ কিংবা কোনো ভূমিকা ছিল না। খুব বেশি ত্যাগ করলে তাঁরা দেশত্যাগ করে শরণার্থী হয়েছিলেন। এঁদেরকে শুধু রাজনৈতিক কারণে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হতো এবং তাঁরা অবাধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সনদপত্র বিতরণ করতেন।

এজন্য মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ওপর সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের কোনো শ্রদ্ধা তৈরি হয়নি। দেখা গেছে, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কর্মকর্তারও পরিবর্তন ঘটেছে। জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় থাকাকালে জেনারেল এরশাদ ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান উপদেষ্টা যদিও আমরা তিনজন সিনিয়র মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ঢাকায় চাকরিরত ছিলাম। এরপর এরশাদকে সেনাপ্রধান করা হলে আমাকে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান উপদেষ্টা করা হয়। আমি দুতিন দিন মুক্তিযোদ্ধা সংসদে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করি এবং নেতাদের জানাই যে, এটাকে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে যা যা প্রয়োজন সবকিছু করা হবে। প্রকৃত প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য আমি অচিরেই নির্বাচন দেওয়ার কথা বলি।

এর কদিন পর জেনারেল এরশাদ আমাকে জানান, রাষ্ট্রপতি জিয়া মনে করেন যেহেতু অ্যাডজুটেন্ট জেনারেলের কাজ ছাড়াও আমি ক্যাডেট কলেজ, সেনাকল্যাণ সংস্থা ইত্যাদিতে দায়িত্ব পালন করি, তাই মুক্তিযোদ্ধা সংসদে হয়তো বেশি সময় দিতে পারব না। সপ্তাহখানেক পার না হতেই সরকারি আদেশবলে আবার জেনারেল এরশাদকে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান উপদেষ্টা করা হয়।

বস্তুত তিন-চারদিন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কাজকর্ম দেখার সুযোগে যা বুঝতে পেরেছি তা হলো, যাঁরা এই সংসদটির বিভিন্ন পদ দখল করে আছেন তাঁরা সরকার থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিতেই ব্যস্ত। আমি এটা বন্ধ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। যেমন—পরিত্যক্ত কিছু শিল্পকারখানা সংসদকে সরাসরি বরাদ্দ করা। বিভিন্ন জনকে পারমিট দেওয়া ইত্যাদি কিছু ফাইল আমার কাছে এসেছিল সুপারিশের জন্য। কিন্তু এসবে আমি কোনো সাড়া দেইনি।

এখনও নতুন করে মুক্তিযোদ্ধা বানানোর প্রক্রিয়া চলছে। নিজের কথা বলতে পারি। মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের দুজন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সনদপত্র পাওয়ার পরও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ থেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদনপত্রে ছাপানো ফর্ম (আপিল ফর্ম) সরকারিভাবে আমার কাছে পাঠানো

হয়। সেই ফর্মটি অবশ্য আমি পূরণ করিনি। এসব অবমাননাকর পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে এখন নিজেকে একজন সাহসিকতা পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠাবোধ হয়।

এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। যুদ্ধের প্রয়োজনে ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে নিয়মিত বাহিনীর জন্য নতুন লোকবলের দরকার হয়। উপযুক্ত লোক না পেয়ে শরণার্থী শিবির ও অন্যান্য উৎস থেকে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের নিয়মিত বাহিনীতে নিতে বাধ্য হই। তবে প্রাপ্তবয়স্কদের অনেকেই নিয়মিত বাহিনীতে যোগ দিয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিতে আগ্রহী ছিল না। কিন্তু সেক্টরের অধীনে অনিয়মিত বাহিনীতে কাজ করতে উৎসাহী ছিল। একদিন কথা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের দৃষ্টিগোচর করি। শুনে তিনি অবাকই হলেন।

অথচ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধা সনদধারী লোকজন সর্বত্র, সর্বক্ষেত্রে। তাই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ফ্রিডম ফাইটারদের কটাক্ষ করে সংক্ষেপে 'এফএফ' অর্থাৎ 'ফ্রাইডে ফাইটার' কিংবা '১৬ ডিভিশন' বলে অভিহিত করতেন অনেকে। কারণ আমাদের বিজয়দিবস ছিল ১৬ ডিসেম্বর এবং তার পরদিন ছিল শুক্রবার।

খাদ্যসংকট ও অস্ত্রউদ্ধার

১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি হেডকোয়ার্টার অফিসার মেসে আমার বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও বিয়েতে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং বেশকিছু সময় অনুষ্ঠানে কাটান। এত ব্যস্ততার মধ্যে তিনি আমার বিয়েতে সময় দেওয়ায় আমি সত্যিই অভিভূত হই। আমার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর হৃদ্যতা অনেকেই লক্ষ করেন। বিয়ের জন্য আমি একদিন ছুটি নিয়েছিলাম। পরদিন আমি কাজে যোগদান করি। কারণ, তখন দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, চোরাচালান এবং খাদ্যাভাব দেখা দেয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের রাস্তাঘাট এবং পরিবহণব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। তাই ঠিকমতো খাদ্যশস্য সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে। সেজন্য চট্টগ্রাম ও চালনা সমুদ্রবন্দর থেকে দেশের সর্বত্র খাদ্য সরবরাহের কাজেও আর্মিকে নিয়োজিত করা হয়। এর অংশ হিসেবে আমার ব্রিগেডও নারায়ণগঞ্জ, পোস্তগোলা ইত্যাদি স্থানে মালামাল খাদ্যগুদামে আনা-নেওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিল।

দেশে তখন পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র ছিল। অথচ তা ভালোভাবে উদ্ধার করা হয়নি। খাদ্যপরিস্থিতি জরুরিভাবে মোকাবিলায় রেশনকার্ডপদ্ধতি চালু ছিল। কিন্তু অনেক ভুয়া রেশনকার্ড দেওয়া হয়েছিল। এসব ভুয়া রেশনকার্ড উদ্ধারের কাজও আমার ব্রিগেডের ওপর ন্যস্ত ছিল।

একদিন আমি সেনাবাহিনীর কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে দেখার জন্য বিজয়নগরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন সেখানে কর্তব্যরত আর্মি কমান্ডার আমাকে জানান, ওই এলাকায় একটি বিল্ডিঙের দোতলায় অবস্থিত যুবলীগের অফিসে অস্ত্র ও গোলাবারুদ মজুদ আছে। তাঁদের সঙ্গে একজন ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন। আমি তখন নির্দেশ দিই, ম্যাজিস্ট্রেট যেন আর্মির সহায়তায় যুবলীগ অফিসে এসব অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ সন্ধান করেন। যুবলীগের অফিসে তখন তালা লাগানো ছিল। তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে প্রাপ্ত সামগ্রীর তালিকা তৈরিসহ সবকিছু আইনানুযায়ী ঠিকমতো করার জন্য তাঁদের নির্দেশ দিই।

ম্যাজিস্ট্রেট আর্মির সাহায্যে তালা ভেঙে অফিসের ভেতরে প্রবেশ করেন এবং ১২টি ডিপি (ড্যামি প্র্যাকটিস) ৩০৩ রাইফেল উদ্ধার করেন। এই রাইফেলগুলো বেসামরিক ব্যক্তিদের কাছে থাকার কথা নয়। প্রশিক্ষণের কাজে এ ধরনের অস্ত্র সামরিক ও পুলিশবাহিনীতে ব্যবহার করা হয়। যাহোক, এ রাইফেলগুলো জব্দ করা হয়। পরে জানতে পারি ওইদিন বিকেলে প্রধানমন্ত্রী ঢাকার তৎকালীন জেলা প্রশাসক সৈয়দ রেজাউল হায়াৎ (পরে সচিব) এবং পুলিশের এসপি মাহবুবউদ্দিন (পরে আওয়ামী লীগে যোগদানকারী)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে জানান, ঢাকা শহর থেকে অবৈধ অস্ত্রউদ্ধারের ভার সেনাবাহিনীর ওপর ন্যস্ত। তারই অংশ হিসেবে সেনাবাহিনী যুবলীগ অফিস তল্লাশির নির্দেশ দেয়।

এর কিছুদিন পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় কথা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি আমি নিজেই উত্থাপন করি। তিনি হেসে জানতে চান, ওই তল্লাশির সময় কোনো অস্ত্র পাওয়া গেছে কি না। আমি জবাবে বলি, ১২টি ড্যামি প্র্যাকটিস রাইফেল পাওয়া গেছে যা শুধু প্রশিক্ষণের কাজে সামরিক ও পুলিশবাহিনীতে ব্যবহৃত হয়। প্রধানমন্ত্রী এ সম্পর্কে আর কোনো মন্তব্য করেননি।

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন

১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে স্বাধীন দেশে প্রথমবারের মতো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ

২৯৩টি আসনে জয়ী হয়। এ সাধারণ নির্বাচনেও আর্মিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত রব-জলিলের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ভোটে কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে। সে সময় জোর গুজব ছিল যে প্রত্যেক সেনানিবাসে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলে, প্রচুর ভোট পাওয়ার কথা কিন্তু কারচুপির মাধ্যমে তাদের হারানো হয়েছে। মূলত দেশে যে অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান ছিল তার প্রভাব আর্মিতেও পড়ে। সেজন্য আমি সর্বদা সতর্ক ছিলাম। জাসদ ও অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক দল আর্মিতে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে আর্মি সম্পর্কে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিত।

সে সময় ঢাকার বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক জনসভায় জাসদ নেতা মেজর জলিল তাঁর বক্তৃতায় জোর গলায় দাবি করেন, 'আর্মিও আমাদের সঙ্গে আছে'। কদিন পর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি জলিলের বক্তৃতার বিষয়টি শুনেছি কি না। আমি তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করি যে, আমার অধীনস্থ অফিসার ও সৈনিকদের প্রতি আমার আস্থা আছে এবং তাদের কাছে এ ধরনের বাগাড়ম্বরের কোনো গুরুত্ব নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আর্মিতে জাসদের রাজনীতি সক্রিয় কি না?

আমি উত্তরে বলি, কমান্ডারগণ যদি অরাজনৈতিক, দক্ষ এবং পেশাদার হন তবে তাঁর অধীনস্থ অফিসার ও সৈনিকগণ রাজনীতিতে জড়াবে না এবং রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সামরিক আইনে গুরুতর অপরাধ। মূলত সেনাবাহিনীকে অরাজনৈতিক রাখার দায়িত্ব সরকার ও সংশ্লিষ্ট কমান্ডারদের। মনে হয়, এ উত্তরে তিনি খুশি হয়েছিলেন।

সাধারণ নির্বাচনের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে। জাসদ, অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক দল এবং পরোক্ষভাবে স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক নেতারাও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভোট কারচুপি করে ২৯৩ আসন পেয়েছে বলে জোরালো অভিযোগ উত্থাপন করে। অবশ্য এ অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত সামরিক বাহিনীর অফিসারগণও কোনো কোনো স্থানে ভোট কারচুপি হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে এ নির্বাচনে কারচুপি না হলেও আওয়ামী লীগ অন্তত ২৮০টি আসন অনায়াসে লাভ করতে সক্ষম হতো।

আজ মনে পড়ে, মুজিবহত্যা মামলার অন্যতম আসামি তৎকালীন মেজর রশিদ ওই নির্বাচনের সময় টাঙ্গাইলে আওয়ামী লীগের একজন সিনিয়র নেতার নির্বাচনী এলাকায় দায়িত্ব পালন করছিলেন। নির্বাচন চলাকালে তিনি ওই

নেতার আগ্রহে ভোটকেন্দ্রের ভেতরে যাওয়ার জন্য আমার অনুমতি চান। কথা বলার সময় এ কাজে তাঁর মধ্যে একধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত উৎসাহ টের পাই আমি। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁকে বলি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনোরকম সমস্যা হয়ে থাকলে তিনি যেন উক্ত নেতাকে বলেন থানার সাহায্য নিতে। আমি তাঁকে আরো বলি, একমাত্র পুলিশ ব্যর্থ হলেই সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করবে। যাহোক, আমার আদেশ পেয়ে তিনি নিবৃত্ত হন। উক্ত নেতা ওই আসন থেকে জয়লাভ করেন।

এদিকে গোপন বামপন্থী রাজনৈতিক দলসহ সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টি নির্বাচনের পর গ্রামেগঞ্জে পুলিশ, রক্ষীবাহিনী ও আওয়ামী লীগের সদস্যদের ওপর আক্রমণ বৃদ্ধি করে। এতে আইনশৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতি ঘটে। সে সময়ের যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে এই পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হয় খাদ্যাভাব। ফলে পরিস্থিতি কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। এ ছাড়া স্বাধীনতার পরে অধিকাংশ লোকজনের আকাশচুম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটানো বাস্তব কারণেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এই পরিস্থিতির দায় বহন করতে হয়েছিল সরকারকে।

পাকিস্তান থেকে সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের প্রত্যাগমন

১৯৭৩ সালের শেষের দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদে কর্মরত বাঙালি অফিসার ও সদস্যদের পাকিস্তান থেকে ফেরত পাঠানো হয়। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৩ হাজারের মতো। এসব সামরিক লোকজনকে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী তথা সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হলো কোনোরূপ ব্যাপক যাচাই-বাছাই ছাড়াই। ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে যুদ্ধবন্দি হিসেবে পাকিস্তানের বিভিন্ন শিবিরে এদের রাখা হয়েছিল। প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম পর্যায়ে এদের বেশির ভাগকে ঢাকাতেই রাখা হয়। ফলে প্রশাসনিক, থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য বিষয়ে অসুবিধা দেখা দেয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এক সরকারি আদেশে সামরিক ও বেসামরিক পর্যায়ে সরকারি চাকরিজীবী মুক্তিযোদ্ধাদের দুই বছরের জ্যেষ্ঠতা দেওয়া হয়। তা ছাড়া সামরিক বাহিনীতে চাকরিরত মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩-এর মধ্যে প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে পদোন্নতি ও বিভিন্ন উচ্চপদে নিয়োগ দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ১৯৭০ সালে আমি ছিলাম মেজর। যুদ্ধের সময় আমি মেজর পদে থেকেই একটি

পদাতিক ব্যাটালিয়নের অধিনায়কত্ব করি এবং বিভিন্ন সম্মুখসমরে নেতৃত্ব দিই। '৭২ সালের অক্টোবরে আমাকে লে. কর্নেল পদে পদোন্নতি দিয়ে ব্রিগেড কমান্ডার করা হয়। দুই বছর পর অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে পূর্ণাঙ্গ কর্নেল হই এবং ওই পদে থেকেই ব্রিগেড কমান্ড করি। পাকিস্তানফেরত অফিসারগণ মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের দুই বছরের জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতিকে সহজে মেনে নিতে পারেননি। অথচ নিয়মানুযায়ী যাঁরা পাকিস্তান বন্দিশিবিরে স্থায়ী পদে না থেকে অস্থায়ী পদে ছিলেন তাঁদেরকে পূর্বতন স্থায়ী পদে অর্থাৎ এক র‍্যাঙ্ক নিচে নিয়োগ করার কথা, অস্থায়ী পদের বিপরীতে নয়। যেমন, যিনি পাকিস্তান বন্দিশিবিরে অস্থায়ী মেজর ছিলেন তাঁকে নিয়মানুযায়ী তাঁর পূর্বতন স্থায়ী পদ অর্থাৎ ক্যাপ্টেন হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়ার কথা। নিয়ম থাকলেও পাকিস্তানফেরত অফিসারদের ক্ষেত্রে তা অনুসৃত হয়নি। উপরন্তু পাকিস্তানফেরত অফিসারদের মধ্যে অনেকেই দু-তিন বছরের মধ্যে মেজর থেকে ব্রিগেডিয়ার পর্যন্ত পদোন্নতি লাভ করেন। উদাহরণস্বরূপ তৎকালীন লে. কর্নেল এরশাদ (পরে রাষ্ট্রপতি) পাকিস্তান থেকে ফেরত আসার মাত্র দুই বছরের মধ্যে তিনটি পদোন্নতি পেয়ে মেজর জেনারেল হন। শান্তিকালীন সময়ে এরকম পদোন্নতি নজিরবিহীন। তার ওপর এ সময়ে তিনি কোনো পর্যায়ে অধিনায়কত্বও করেননি। তবুও পাকিস্তানফেরত অনেক সামরিক অফিসার মুক্তিযোদ্ধাদের দুই বছরের সিনিয়রিটি ও পদোন্নতি মনেপ্রাণে মেনে নেননি যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনায়।

ওয়াসিউদ্দিনকে নিয়ে গুজব

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পাকিস্তানফেরত সিনিয়র আর্মি অফিসার ছিলেন লে. জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন ও মেজর জেনারেল এম আই করিম। পাকিস্তান আর্মিকে সহযোগিতা করার জন্য মেজর জেনারেল এম আই করিমকে চাকরি থেকে অবসর দেওয়া হয়। পাকিস্তান থেকে ফেরত আসার দিন লে. জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনকে বিমানবন্দরে জেনারেল ওসমানী অভ্যর্থনা জানান। ওসমানী উদ্যোগী হয়ে তাঁকে মন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করান। ফলে সেনানিবাসে জোর গুজব ছড়িয়ে পড়ে মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর স্থলে লে. জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনকে সেনাপ্রধান করা হবে। মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এ সম্পর্কে আমি কিছু জানি কি না। উত্তরে আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না বলে জানাই। তিনি আমাকে এ সম্পর্কে খোঁজ

নেওয়ার জন্য বলেন। আমি টেলিফোনে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমণ্ডির বাসভবনে ওই রাতেই দেখা করি। আমি তাঁকে জানাই যে, আর্মিতে জোর গুজব, জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনকে সেনাপ্রধান করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জানতে চান, আমি কোথা থেকে এ খবর পেলাম। একটু থেমে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একজন পরীক্ষিত খাঁটি দেশপ্রেমিক বাঙালিই কেবল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সেনাপ্রধান হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এরপর আমি সেনানিবাসে চলে আসি এবং মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার আলোচনার বিষয়ে অবহিত ও আশ্বস্ত করি।

মুক্তিযোদ্ধা অমুক্তিযোদ্ধা দ্বন্দ্ব

যাহোক, ওই আত্তীকরণের পর থেকে পাকিস্তান-প্রত্যাগত ও মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের মতো অবস্থা বিরাজ করছিল। প্রত্যাগত অফিসাররা সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারছিলেন না। যদিও তারা চাকরির খাতিরে বাহ্যিকভাবে অধিনায়কত্ব মেনে নিচ্ছিলেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সমালোচনা করতেন এবং তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট থাকতেন। এ ধরনের অবস্থা সেনাবাহিনীর ঐক্য ও শৃঙ্খলার জন্য মোটেই সহায়ক ছিল না।

আত্তীকরণের ফলে সৃষ্ট মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা দ্বন্দ্ব, বাসস্থান, পোশাক, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির স্বল্পতাহেতু সামরিক বাহিনীতে তখন কিছুটা অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজ করছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে খাদ্যাভাব, পরিবহণ সংকট, যোগাযোগ অব্যবস্থা ও জরুরি পণ্যসামগ্রী আমদানির ব্যয় মেটানোর কারণে সামরিক বাহিনীতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া তৎকালীন বেসামরিক নীতিনির্ধারকদের একটি অংশ সামরিক বাহিনীতে বেশি সুযোগ-সুবিধা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন এ অজুহাতে যে, সামরিক বাহিনীতে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হলে অন্যান্য আধাসামরিক বাহিনী তথা পুলিশ, বিডিআর, আনসার ইত্যাদি বাহিনীকেও দিতে হবে। মনে পড়ে, তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার (পরে মেজর জেনারেল, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) সি আর দত্ত একদিন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে আমাকে জানান, বেসামরিক প্রশাসনের জনৈক সচিব এক নীতিনির্ধারণী সভায় অত্যন্ত খেদের সঙ্গে বলেছেন, সামরিক বাহিনীর ক্যান্টিন স্টোর ডিপার্টমেন্ট (সিএসডি)-এ কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাবে না। তা করলে আনসার, বিডিআর ও রক্ষীবাহিনীকে

একই সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। সে সময় সামরিক বাহিনীতে এ নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। সব দেশেই সামরিক বাহিনীর সিএসডিতে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আর্মিকে সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে প্রশিক্ষণে রাখা অধিনায়কদের জন্য সহজসাধ্য ছিল না।

মিশরের ট্যাঙ্ক

১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত মাঝারি ধরনের ভারী ৩০টি রাশিয়ান টি-৫৪ ট্যাঙ্ক বাংলাদেশকে উপহার দেন। আমি তখনও ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার। এ ট্যাঙ্কগুলো নিয়ে আসার জন্য তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলীর নেতৃত্বে একদল সামরিক প্রতিনিধিদল মিশর সফরে যান এবং ট্যাঙ্কগুলো জুন ও জুলাই মাসে ঢাকায় এসে পৌঁছে। একদিন কথা প্রসঙ্গে আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে ট্যাঙ্কগুলোকে উত্তরবঙ্গের রংপুর সেনানিবাসে পাঠানোর প্রস্তাব করি। কারণ ঢাকায় এ ধরনের ট্যাঙ্ক রাখার প্রয়োজন নেই এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ারও সুযোগ-সুবিধা নেই। এ ছাড়া পাকিস্তান আমলে আনীত প্রথম ট্যাঙ্কগুলোও সার্বিক বিবেচনাপূর্বক রংপুরে পাঠানো হয় এবং সেখানে ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টও ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আমার কথার কোনো গুরুত্ব দেননি। দুঃখজনক হলেও সত্যি, ১৯৭৫ সালে মুজিবহত্যার সময় ওই ট্যাঙ্কগুলোই ব্যবহার করা হয়েছিল। অবশ্য এর আগেই আমাকে ঢাকা ব্রিগেড থেকে সরিয়ে লগ এরিয়ার অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, পাকিস্তান থেকে প্রথম যখন এ অঞ্চলে ট্যাঙ্ক আনা হয় তখন আমি ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক প্রধানের এডিসি।

প্রথম ল্যান্সারে অব্যবস্থা

প্রসঙ্গত বলতে হয়, ঢাকা ব্রিগেডের কমান্ডার থাকাকালে ১৯৭৩ সালের সম্ভবত জুলাই মাসের কোনো একদিন ভোরে অতর্কিতে আমি আমার অধীনস্থ প্রথম ল্যান্সার (ট্যাঙ্ক ইউনিট) পরিদর্শনে যাই। এ ইউনিটে মুজিবহত্যাকারী মেজর ফারুক (পরে লে. কর্নেল) তখন কর্মরত ছিল। আমি যখন ইউনিট পরিদর্শনে যাই তখন প্রশিক্ষণ চলার কথা। অথচ গিয়ে দেখতে পাই, ইউনিটের লোকজন

ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করছে ; কেউবা গাছের নিচে বসে আড্ডা দিচ্ছে। ইউনিটে তখন ৮০০/৯০০ সৈন্য। আমি তাদের বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে আমার অফিসে ফেরত আসি এবং ইউনিটের অধিনায়ককে আমার অফিসে ডেকে এনে এ অব্যবস্থার জন্য লিখিত কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিই। বলা বাহুল্য, তাঁর জবাব সন্তোষজনক ছিল না।

কয়েক দিন পরে যখন তাঁর পদোন্নতির জন্য আর্মি প্রমোশন বোর্ডের মিটিং চলছিল সেনাপ্রধানের সভাপতিত্বে, তখন আমি তার লে. কর্নেল পদে পদোন্নতির জোরালো বিরোধিতা করি। অবশ্য তাঁর কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী বোর্ড-সদস্য পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করেন। ঐ অফিসার ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের কোহাট থেকে স্বল্পমেয়াদি কমিশন পান। সে হিসেবে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাঁর ইউনিটে বিশৃঙ্খলা থাকায় ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে আমি তাঁকে পদোন্নতি পাওয়ার অযোগ্য মনে করি এবং বোর্ডে বিরোধিতা করি। ফলে বোর্ডকে তাঁর প্রমোশন স্থগিত রাখতে হয়। অবশ্য পরে ডিসেম্বর মাসে আমার উত্তরসূরির সুপারিশে তিনি লে. কর্নেল পদে পদোন্নতি পান। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঐ অফিসারের অধীনস্থ অফিসার ফারুক ট্যাংক নিয়ে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবহত্যায় অন্যতম ভূমিকা পালন করে। তবে ঘটনার সময় ফারুকের সেই অধিনায়ক নৈমিত্তিক ছুটিতে ছিলেন।

দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা

১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি থেকে দেশের খাদ্যপরিস্থিতি, বিতরণ এবং আনুষঙ্গিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা ক্রমাবনতির দিকে যেতে থাকে। সে বছর বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কোনো কোনো স্থানে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা বিরাজমান ছিল। খাদ্যশস্য অন্যান্য পণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম সাধারণ জনগণের ক্রয়সীমার বাইরে চলে যায়। এ পরিস্থিতিতে বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতা মওলানা ভাসানী সরকারের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ফলে রাজনৈতিক মঞ্চ আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ অনশনের কারণে মওলানা ভাসানীর শারীরিক অবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় উপনীত হলো। ফলে সর্বত্র এই আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে, যদি অনশনে মওলানা ভাসানীর মৃত্যু ঘটে তবে দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে ঢাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। সামরিক বাহিনীতেও এর প্রভাব পড়ে। তৎকালীন সেনাপ্রধান আমাকে ঢাকা

সেনানিবাসের সৈন্যদের মনোবল সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বললেন। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে বলি। কারণ, আমি পূর্ব থেকেই এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলাম। আমি নিয়মিত আমার অধীনস্থ ইউনিট কমান্ডারদের সঙ্গে বৈঠক করতাম। তাদেরকে সর্বদা চেইন অফ কমান্ড ঠিক রেখে সতর্ক থাকতে হুঁশিয়ার করি এবং ইউনিটে যেন কোনোরূপ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার লাভ না করে সে ব্যাপারে নির্দেশ দিই। পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের অনুরোধে মওলানা ভাসানী অনশন ভঙ্গ করেন। কিন্তু তখনও দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ক্রমাবনতির দিকে যাচ্ছিল এবং জনগণের মধ্যে অস্থিরতা ও হতাশা বিরাজ করছিল।

এ সময় সীমান্ত দিয়ে চোরাই পথে বিপুল পরিমাণ পাট ও চাল ভারতে চলে যাচ্ছিল। আর ভারত থেকে আসত কাপড়সহ অন্যান্য তৈরি জিনিস। এমনিতেই সে বছর দেশে খাদ্যশস্য কম উৎপাদিত হয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের দাম প্রায় ৫ গুণ বেড়ে যায়। এ অবস্থায় ঘাটতি মেটানোর জন্য বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমদানি করার মতো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বাংলাদেশের সঙ্গত কারণেই ছিল না। দামবৃদ্ধির কারণে বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট বিরূপ পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশ বাকিতেও খাদ্যশস্য কিনতে পারছিল না। এদিকে কিউবায় পাট রপ্তানির অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্রও খাদ্যসাহায্য দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

বৈশ্বিক এই পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশে বিভিন্ন স্তরের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চোরাচালান, অরাজকতা ইত্যাদি। তার ওপর ছিল জাসদের গণবাহিনী ও সর্বহারা পার্টির গুপ্ত হামলা, অগ্নিসংযোগের মতো ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। ফলে মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে থাকে হুহু করে। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

'৭৪-এর অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ খাদ্য আমদানির লক্ষ্যে কোনো দেশের সঙ্গে কোনো চুক্তি সই করতে পারেনি। কিন্তু পরে যখন চুক্তি সই হয়েছে বা খাদ্য এসেছে ততোদিনে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। বিদেশী পত্রপত্রিকার খবরে এতে '২৫ হাজার থেকে ৫ লাখ' লোক মারা গেছে বলে বলা হলেও কোন সূত্র থেকে এ ধরনের হিসাব পাওয়া গেছে তা পরিষ্কার ছিল না। যাহোক '৭৪-এর ডিসেম্বরে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর প্রথম তিন বছরে বাংলাদেশ ২.৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বৈদেশিক সাহায্য পায়। (সূত্র : আইডিএস বুলেটিন, জুলাই ১৯৭৭, ভল্যুম ৯, ইংল্যান্ড)। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ২৩ বছরেও এতো সাহায্য পায়নি। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম জার্মানি মার্শাল প্ল্যানের আওতায় যে বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছিল তাও এই অঙ্কের চেয়ে কম। কিন্তু বাংলাদেশ এই বিপুল পরিমাণ সাহায্য যথাযথভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়।

ঢাকা ব্রিগেড থেকে বদলি

১৯৭৪ সালের মার্চ মাসের শেষদিকে একদিন সকালে অফিসে গিয়ে আমি টেবিলের ওপর একটি চিঠি দেখতে পাই। তা ছিল সেনাসদর থেকে পাঠানো ছোট একটা সাংকেতিক ইংরেজি বার্তা। বার্তার তর্জমা হলো : ঢাকা ব্রিগেড থেকে আমাকে কুমিল্লায় অবস্থিত বাংলাদেশ মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে কমান্ডান্ট হিসেবে বদলি করা হয়েছে। রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিলকে আমার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কর্নেল শাফায়াত একজন মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তিনি মেজর ছিলেন এবং ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে যুদ্ধে যোগদান করেন। তৎকালীন কর্নেল জিয়াউর রহমানের 'জেড ফোর্স'-এর অধীনে তিনি ছিলেন ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে আর আমি ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক। অবশ্য ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার মেজর জিয়াউদ্দিন পাকিস্তান থেকে আগস্ট মাসে ফিরে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করলে আমি ২য় ইস্ট বেঙ্গলে পুনরায় যোগদান করি অধিনায়ক হিসেবে ।

কর্নেল শাফায়াত পাকিস্তান মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে আমার পরিচিত। চাকরিতে তিনি আমার ছয় মাসের জ্যেষ্ঠ। তাঁর সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল। ঢাকা ব্রিগেডের দায়িত্ব নিতে তিনি যখন আমার কাছে আসেন তখন তিনি বেশ সংকোচ বোধ করছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, ঢাকা ব্রিগেডের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরমেশনে বদলির জন্য তিনি তদবির, সুপারিশ ইত্যাদির আশ্রয় নেননি। আমি তাঁর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করি।

আমি আমার আকস্মিক বদলি সম্পর্কে সেনাপ্রধানের সঙ্গে কথা বলি। স্বভাবতই আর্মিতে এ ধরনের বদলি সম্পর্কে সেনাপ্রধান কর্তৃক আমাকে পূর্বেই অবহিত করার কথা। তিনি জানান, তাঁর কোনোরূপ সুপারিশ ছাড়াই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এ বদলির আদেশ হয়েছে। আমি তাঁকে সবিনয়ে জানাই, যদিও আমি পূর্ণাঙ্গ কর্নেল এবং বাংলাদেশ সামরিক অ্যাকাডেমিতে ওই পদের বিপরীতেই আমাকে বদলি করা হয়েছে, কিন্তু গত দুই বছর যাবৎ আমি অফিশিয়েটিং ব্রিগেডিয়ার হিসেবে কাজ করে আসছি। ব্রিগেডিয়ার পদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া যেহেতু আমার এ বদলি কোনো পেশাগত অযোগ্যতা বা অদক্ষতার কারণে নয়, সেহেতু কর্নেল হিসেবে মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে যোগদান করা পদাবনতিরই শামিল। তা ছাড়া সম্প্রতি আমার ঊর্ধ্বতন রিপোর্টিং কর্মকর্তা উপসেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান আমার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে (যা

আর্মিতে দেখিয়ে স্বাক্ষর নেওয়াই নিয়ম) আমাকে একজন 'অসাধারণ দক্ষ অধিনায়ক' হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন।

আমার বক্তব্য শুনে সেনাপ্রধান বললেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করে তিনি আমাকে জানাবেন। দুদিন পর তিনি আমাকে জানালেন, ঢাকাতে প্রথমবারের মতো 'লজিস্টিক এরিয়া কমান্ড' গঠিত হচ্ছে এবং আমাকে তার অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করা হবে, যে পদ ব্রিগেডিয়ার-এর মর্যাদাসম্পন্ন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানান, আমার বদলি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী যখন তাঁকে বললেন, তখন তিনি প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, দেশের এ পরিস্থিতিতে আমাকে ঢাকা ব্রিগেডে রাখাই সমীচীন হবে। কেননা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে আমি ঢাকায় এবং সে সময় থেকে একটি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলাম। পরে আবার ঢাকাতেই আমাকে ঢাকা ব্রিগেডেরই অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। ঢাকায় আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সেনাপ্রধান হয়তো আমাকে ঢাকা ব্রিগেডেই রাখা সমীচীন মনে করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এর উত্তরে বলেন, রাজনৈতিক স্বার্থে এ বদলি প্রয়োজন ছিল, যার অর্থ সেনাপ্রধান বুঝে উঠতে পারেননি বলে আমাকে জানান।

আমি আমার নতুন কর্মস্থল ঢাকা সেনানিবাসে লগ এরিয়ার অধিনায়ক হিসেবে যোগদান করি। এ লগ এরিয়া ছিল সম্পূর্ণ নতুন। তাই আমি এ নতুন সংস্থাকে গড়ে তোলার কাজে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করি। তবে প্রায় বিকেলবেলায় আমার নিয়মিত অভ্যাসমতো বিভিন্ন সেনা ইউনিটে গিয়ে জুনিয়র এবং নন-কমিশন্ড অফিসার এবং সৈনিকদের সঙ্গে বাস্কেটবল খেলতাম। বাইরে আমি এমনিতেই খুব কম যেতাম। শুধুমাত্র ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ছাড়া অন্যদের সঙ্গে আমার তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না।

সরাজ শিকদার : হত্যা না মৃত্যু!

১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে ঢাকায় এক বিয়ের অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রভাবশালী নেতা এবং বাংলাদেশ রেডক্রসের চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফার জনৈক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও তাঁর সঙ্গীরা মেজর শরিফুল হক ডালিমের স্ত্রীর সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। এর প্রতিশোধ হিসেবে মেজর ডালিম তার কিছু সঙ্গী আর্মি অফিসার এবং সৈনিক

নিয়ে গাজী গোলাম মোস্তফার বাসা আক্রমণ ও তচনচ করে। এর ফলে সামরিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে কয়েকজন অফিসারকে প্রশাসনিক আদেশে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মেজর শরীফুল হক ডালিম এবং মেজর এস এইচ এম বি নুর চৌধুরী। এঁরা দুজনই ১৯৭৫-এর আগস্ট মাসে শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

ওই বছরেরই শেষদিকে গুপ্তদল সর্বহারা পার্টির মূল নায়ক সিরাজ শিকদারকে চট্টগ্রামের গোপন আস্তানা থেকে পুলিশ তাঁর পার্টির একজন লোকের সহায়তায় গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় এবং কড়া নিরাপত্তায় ঢাকায় নিয়ে আসে। আগেই বলেছি, এ সর্বহারা দলে ঢাকা ব্রিগেডে আমার পূর্বসূরি লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ একজন উচ্চপদস্থ নেতা ছিলেন। তিনি আত্মগোপনপূর্বক পার্টির কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে তৎপর ছিলেন। সিরাজ শিকদারকে ঢাকায় নিয়ে আসার দুই/তিনদিন পর এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পুলিশ হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গুলিতে সিরাজ শিকদার নিহত হয়েছেন। এ সরকারি ভাষ্য তখন অধিকাংশ জনগণ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যরা বিশ্বাস করেনি। সিরাজ শিকদারকে ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে পুলিশ হেফাজতে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হতো এবং বিনা বিচারে হত্যার জন্য লোকজন সরকারকে দায়ী করত।

এ ব্যাপারে দ্য রেপ অফ বাংলাদেশ খ্যাত এবং লন্ডনের সানডে টাইমসের সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাস (বর্তমানে প্রয়াত) তার লেখা দ্য লিগেসি অফ ব্লাড বইয়ের ৪৬ পৃষ্ঠায় সিরাজ শিকদারের ভগ্নীপতি (শামিম শিকদারের স্বামী) জাকারিয়া চৌধুরীকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'হ্যান্ডকাপ পরিয়ে, চোখ বেঁধে রাতের বেলায় ঢাকার অদূরবর্তী কোনো এক জায়গায় নিয়ে গুলি করে সিরাজ শিকদারকে হত্যা করা হয়।' উল্লেখ্য, এরশাদের শাসনামলে ১৯৮৬ সালে বিশেষ মহলের সহায়তায় মাসকারেনহাসের ওই বইটি প্রকাশিত হয়। মাসকারেনহাসের সঙ্গে লন্ডনে আমার পরিচয়। এই লেখায় তাঁকে নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো।

সিরাজ শিকদার হত্যাকাণ্ড আসলেই রহস্যজনক। সত্যিকার ঘটনা যে কী ছিল বা তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে তা এখনও পরিষ্কার নয়। দেশে বিভিন্ন হত্যাকাণ্ড নিয়ে বর্তমানে তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু সিরাজ শিকদার হত্যাকাণ্ড নিয়ে কোনো তদন্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ওই সময় ঢাকা ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে পুলিশের তৎকালীন একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে সিরাজ শিকদার প্রসঙ্গে কথা বললে তিনি হঠাৎ বলে বসেন, 'কর্নেল সাহেব, আমাদের এবং আপনাদের যুদ্ধের মধ্যে তফাত এটাই।' শুনেই আমি চমকে উঠি, একটু হতভম্ব হয়ে পড়ি।

সিরাজ শিকদার সেদিনের গ্রাম গঞ্জ ও শহরে কিছু লোকের কাছে, বিশেষ করে যাঁরা সরকারি কর্মকাণ্ডে হতাশ ছিলেন, রবিনহুডের মতো এক আকর্ষক চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীদের ছদ্মবেশে অতর্কিত উপস্থিতি ও নিমেষে মিলিয়ে যাওয়া নিয়ে সে সময় বেশ মুখরোচক গল্প শোনা যেত। তাঁর দল সর্বহারা পার্টির সদস্যদের প্রচারপত্র বিলি, হঠাৎ চিকামারা ইত্যাদি এবং অতর্কিতে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের ওপর হামলা চালানো নিয়ে লোকজন, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত থাকত। এ রকম পরিস্থিতিতে ১৯৭৩ সালের বিজয়দিবসের আগের রাতে শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, সিরাজ শিকদার ও তাঁর দল এসে ঢাকায় সরকারবিরোধী লিফলেট প্রচার ও বিভিন্ন স্থানে হামলা চালাতে পারে। এই আশঙ্কায় শহরে রাতের বেলায় সাদা পোশাকে পুলিশ গাড়ি নিয়ে টহল দিতে থাকে।

গুলিবিদ্ধ শেখ কামাল

ওই রাতেই প্রধানমন্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল, যিনি একজন ছাত্রনেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে প্রথম সামরিক অফিসার্স কোর্সে (শর্ট সার্ভিস-১) সামরিক প্রশিক্ষণ নেন ও যুদ্ধের সময় কর্নেল ওসমানীর এডিসি হিসেবে কাজ করেন, তিনি ধানমণ্ডি এলাকার তাঁর সাতজন সমবয়সী বন্ধুকে নিয়ে একটি মাইক্রোবাসে শহরে টহলে বের হন। এক পর্যায়ে সিরাজ শিকদারের খোঁজে টহলরত স্পেশাল পুলিশ তাঁদের মাইক্রোবাসটি দেখতে পায় এবং সন্দেহ ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কোনো সতর্ক সঙ্কেত না দিয়েই অতর্কিতে মাইক্রোবাসের ওপর গুলি চালায়। এতে কামালসহ তাঁর ছয়জন সঙ্গী আহত হন। পরে পুলিশই তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। শেখ কামালকে পরে পিজি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

পরদিন সকালে আমি ৪৬ ব্রিগেডের অধিনায়ক হিসেবে বর্তমান মানিক মিয়া এভিনিউতে বিজয়দিবসের সম্মিলিত সামরিক প্যারেড পরিচালনা করি। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সালাম গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব অত্যন্ত গম্ভীর ও মলিন মুখে বসে ছিলেন। কারো সঙ্গেই তেমন কোনো কথাবার্তা বলেননি। তাঁর সঙ্গে সবসময়ই আমার একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। যখনই আমি তাঁর কাছে গিয়েছি, উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। কিন্তু ওইদিন তিনি আমার সঙ্গে কোনো কথাই বললেন না। '৭২-এর ১০ জানুয়ারির

পর থেকে অনেকবার তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি। এতো মর্মাহত হতে আমি তাঁকে কখনো দেখিনি।

যাহোক, একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কামালের সঙ্গে আমারও পরিচয় ছিল এবং তাকে আমি খুব ভালোভাবেই জানতাম। প্যারেডশেষে আমি তাকে দেখতে হাসপাতালে যাই। বেগম মুজিব তখন তাঁর পাশে বসে ছিলেন। কামালের কাঁধে গুলি লেগেছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব কামালের ওই রাতের অবাঞ্ছিত ঘোরাফেরায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মনঃক্ষুণ্ন হন। প্রথমে তিনি তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যেতে পর্যন্ত অস্বীকৃতি জানান। পরে অবশ্য বিকেলের দিকে তিনি কামালকে দেখতে যান।

এদিকে স্বাধীনতাবিরোধী ও আওয়ামী লীগ বিদ্বেষীরা এই ঘটনাকে ভিন্নরূপে প্রচার করে। 'ব্যাংক ডাকাতি' করতে গিয়ে কামাল পুলিশের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে তারা প্রচারণা চালায় এবং দেশে-বিদেশে ভুল তথ্য ছড়াতে থাকে। যদিও এসব প্রচারণায় সত্যের লেশমাত্র ছিল না।

বাকশালের অভ্যুদয়

সে সময় দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে এবং দুর্নীতি, অরাজকতা, লুণ্ঠন ইত্যাদিতে দেশ ছেয়ে যায়। এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, দেশের পরিস্থিতি ক্রমেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারিতে হঠাৎ করে দেশে সরকারপদ্ধতির পরিবর্তন করেন। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারপদ্ধতি প্রণয়ন করে তিনি নিজে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি এবং মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী করে নতুন সরকার গঠন করা হয়। এরপর ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিকে সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একদলীয় শাসনব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা 'বাকশাল' নামে দল গঠন করা হলো। সরকারের এ সিদ্ধান্তে দেশে-বিদেশে অনেকেই হতবাক হয়ে যায় এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের পাশ্চাত্য শুভাকাঙ্ক্ষীরা মর্মাহত হয়।

অনেকে এমন মত পোষণ করতে লাগলেন, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে শেখ মুজিব একটা নিবর্তনমূলক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়া গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর সারাজীবনের যে ত্যাগ-তিতিক্ষার জন্য তিনি জনগণের আপনজনে পরিণত হলেন, এই ব্যবস্থাকে

তাঁরা সেই গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর চরম আঘাত বলে ভাবতে লাগলেন। সামরিক বাহিনীতেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলো। অনেকেই এই ভেবে অস্বস্তি বোধ করছিলেন যে, সামরিক বাহিনীর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আর থাকবে না এবং এই ব্যবস্থা সামরিক বাহিনীকে রাজনৈতিক দলের একটা অঙ্গসংগঠনে পরিণত করবে।

জনসাধারণের মনেও ধারণা জন্মে যে, বাকশালের মাধ্যমে সামরিক-বেসামরিক তথা প্রশাসনের প্রতিটি স্তরকে একদলীয় রাজনীতির আওতায় আনা হবে। কারণ বাকশাল কায়েম করার পর গণ্যমান্য ব্যক্তি, যেমন সাংবাদিক, অধ্যাপক, ডাক্তার, বুদ্ধিজীবী এ ধরনের লোকজন তৎকালীন সংসদভবনে (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর অফিস) লাইন ধরে শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিনন্দন জানাতে যান। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ লাইন ধরে সংসদভবনে যাচ্ছিল এবং টিভিতে তা সরাসরি প্রচার করা হচ্ছিল। সেই দৃশ্য আমি আমার ঘরে বসে টিভিতে দেখেছি। আজও মনে পড়ে, স্বাধীনতার পর এতো হতাশা আমাকে আর কখনো গ্রাস করতে পারেনি। চাটুকারদের এই নির্লজ্জ মহড়া দেখে সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে আমি মানসিকভাবে অসুস্থ বোধ করছিলাম।

কিন্তু আমার জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হওয়ার পর এদেরই অনেককে আবার খন্দকার মোস্তাকের সঙ্গে টিভিতে দেখি। আজকের সমাজের অনেক চেনামুখকে সেদিন দেখলাম উৎফুল্লচিত্তে সেনানিবাসে উদ্দেশ্যহীন (!) ঘোরাফেরা করছেন। হায়রে আমার হতভাগা দেশ! আমার কেবলই মনে হলো, ভবিষ্যতে এই জাতির কপালে আরো অনেক দুঃখ আছে।

বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাজনৈতিক নেতা ছাড়াও সামরিক বাহিনীর তিন প্রধানকেও রাখা হলো। প্রতিটি জেলায় গভর্নর নিয়োগ করা হয়। গভর্নরের সংখ্যা ছিল ৬১ জন। ওই পদে মূলত আওয়ামী লীগ নেতা এবং কিছু প্রশাসনিক ও সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন। প্রশাসন ও সামরিক বাহিনী থেকে যাঁরা গভর্নর হয়েছেন তাদের বেশিরভাগ ছিলেন আওয়ামী লীগের সক্রিয় নেতাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন। যেমন— সেনাবাহিনীর সিগনাল কোরে চাকরিরত কর্নেল আনোয়ারকে খুলনা অথবা যশোরের (স্পষ্ট মনে নেই) গভর্নর করা হলো। এই আনোয়ারের ভাই ছিলেন কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত একজন আওয়ামী লীগ এমপি।

গভর্নরের অধীনে স্থানীয় সরকার প্রশাসন থেকে শুরু করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে ন্যস্ত করার পরিকল্পনা ছিল এবং ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ থেকে এ নতুন সরকারি সিদ্ধান্ত কার্যকরি হওয়ার কথা ছিল। এক সরকারি

আদেশে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হলো। শুধুমাত্র চারটি সংবাদপত্রের প্রকাশনা বহাল রেখে বাকি সমস্ত পত্রপত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হলো। এ অবস্থায় দেশের সর্বস্তরে বাকশালবিরোধী চাপা ক্ষোভ বিস্তার লাভ করে। বাকশাল সরকারের এসব সিদ্ধান্তে সর্বত্রই এমনকি সামরিক বাহিনীতেও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিব ও তাঁর সরকার দ্রুতগতিতে যে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন, তা শেখ মুজিবকে অবহিত করার মতো সৎসাহস তাঁর কোনো উপদেষ্টা, পারিষদবর্গ কিংবা গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের ছিল না বলে আমার বদ্ধমূল ধারণা।

দুঃখজনক হলো, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং ক্ষমতাসীনদের আশপাশে সেসব লোকজনই স্থান পায় যারা ক্ষমতাধর ব্যক্তিটি যা শুনতে চান তাই শোনাতে পারদর্শী। এটাই হলো নেতৃত্বের দুর্বলতা যা আমাদের দেশের জন্য ক্রনিক প্রবলেম। অত্যন্ত কম বয়সেই এসব স্মুথ অপারেটরদের দেখার ও বোঝার সৌভাগ্য (!) আমার হয়েছে। কারণ পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের এডিসি হিসেবে এবং বাংলাদেশ হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য অনেক ক্ষমতাবানকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রাসঙ্গিক প্রবাদ মনে পড়ে। জুলিয়াস সিজারকে একজন চাটুকার বলেছিল, 'জাঁহাপনা, আপনাকে তোষামোদ (ফ্ল্যাটারি) করে খুশি করা যায় না, এটাই আপনার সবচেয়ে বড় গুণ।' মজার ব্যাপার হলো, সিজার এই কথাতেই আমোদিত (ফ্লাটার্ড) হতেন সবচে বেশি। তাই তোষামোদকারীদের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করা ক্ষমতাবানদের জন্য বেশ দুরূহ ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বাংলাদেশে এ ধরনের তোষামোদকারীদের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা তো করা হয়ই না বরং নেতারা এদের দ্বারা পরিবৃত থাকতে ভালোবাসেন এবং সবসময় তোষামোদকারী ও নিজের মনে গড়া স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করেন।

সামরিক প্রতিনিধিদলের যুগোস্লাভিয়া ভ্রমণ

১৯৭৫ সালের জুন মাসের প্রথমদিকে যুগোস্লাভিয়ায় এক সামরিক প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে সেনাপ্রধান আমাকে মনোনীত করেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ছিলেন দলনেতা, মোট সদস্য ছিলাম আটজন। সামরিক অস্ত্রসংগ্রহ ছিল এ সফরের উদ্দেশ্য। আমরা সপ্তাহ দুয়েক যুগোস্লাভিয়ায় ছিলাম। মার্শাল টিটো তখনও সে দেশের রাষ্ট্রপতি। মার্শাল

টিটোর যুদ্ধকালীন সহযোগী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক যোগাযোগ প্রধান জেনারেল পিটার মার্টিস এক অভ্যর্থনায় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও আমার কাছে কথা প্রসঙ্গে জানতে চান, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব বা কলহ-বিরোধ আছে কি না। এরপর নিজেই বললেন, যদি এ ধরনের বিরোধ থেকেই থাকে তবে সামরিক বাহিনীতে একতা, শৃঙ্খলা ইত্যাদি বজায় রাখা সরকারের জন্য কঠিন হবে। আমরা এ ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক জবাব দিতে সক্ষম হইনি। কারণ আমাদের সামরিক বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত থাকায় একতার অভাব ছিল। তা ছাড়া মনে হলো, তিনি আমাদের সামরিক বাহিনী সম্পর্কে পূর্ব থেকেই সম্যক জ্ঞাত আছেন।

প্রসঙ্গক্রমে আমি একটা কাকতালীয় ঘটনার উল্লেখ করছি। ওই সামরিক প্রতিনিধিদলের আট সদস্যের মধ্যে চারজনের মৃত্যু হয়েছে অস্বাভাবিকভাবে। যেমন : ১) খালেদ মোশাররফ, ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে সিপাহি বিদ্রোহের সময়, ২) গ্রুপ ক্যাপ্টেন আনসার আহমদ চৌধুরী বিমানবাহিনীর ১৯৭৭ সালের অক্টোবরের বিদ্রোহে, ৩) এয়ার ভাইস মার্শাল বাশার, ১৯৭৭ সালে প্লেন দুর্ঘটনায় এবং (৪) কর্নেল নওয়াজিশ আলী, ১৯৮১ সালে জিয়া হত্যা মামলায় কোর্ট মার্শালে ফাঁসিতে মারা যান।

আর্মিতে বিশৃঙ্খলার স্ফুরণ

যুগোস্লাভিয়া থেকে ফিরে যথারীতি আর্মি লগ এরিয়ার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এ সময়ে আর্মি হেডকোয়ার্টারে অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে নিয়োজিত তৎকালীন কর্নেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠানো হয়। উক্ত পদ শূন্য হলে সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ আমাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে অ্যাডজুটেন্ট জেনারেলেরও কাজ করতে বলেন। অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে কাজ করার সময় আর্মি শৃঙ্খলা এবং অন্যান্য বিষয় দেখে অত্যন্ত বিচলিত হই এবং আর্মিতে ঐক্যের মারাত্মক অভাব অনুভব করি। অধিনায়কগণ আর্মির শৃঙ্খলা ও অন্যান্য আইনকানুনের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে আমার মনে হয়নি। মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা দ্বন্দ্ব তো ছিলই, সর্বোপরি মুক্তিযোদ্ধাগণ নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, কোন্দল, দলাদলি ও পারস্পরিক রেষারেষিতে লিপ্ত ছিলেন।

আমার মনে হয়েছিল, সেনাবাহিনীকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য দক্ষ অধিনায়কত্ব, কঠোর নিয়মকানুন ও শৃঙ্খলা প্রয়োগ করা দরকার। সেনাপ্রধান

মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ্ অভ্যন্তরীণ এসব বিভেদ ও অনৈক্য দূর করতে সক্ষম হননি। তার ওপর তিনি কিছু সিনিয়র অফিসারের পুরোপুরি সহযোগিতা ও সমর্থন পাননি। মুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র অফিসারদের রেষারেষি ছাড়াও পাকিস্তানফেরত অফিসাররা, বিশেষ করে যাঁরা সিনিয়র ছিলেন তাঁরাও সুযোগ বুঝে এই বিরোধকে উস্কে দিতেন। তা ছাড়া ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলের কোনো কোনো রাজনীতিবিদ সামরিক বাহিনীর সদস্যদের এসব দলাদলিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা মনে করেন, দলাদলিতে উৎসাহিত করে তাঁরা সামরিক অফিসারদেরকে তাঁদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন এবং ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে পারবেন। বিরোধীরাও মনে করেন তাঁরা এসব উস্কে দিয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ক্ষমতায় যাবেন সামরিক বাহিনীর সহায়তায়। কিন্তু তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন না যে, এটা সামরিক বাহিনী তথা দেশের জন্য কত ক্ষতিকর। এটা এমনকি দেশকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ ১৯৯৬ সালের ২০ মে'র কথা বলা যায়। তৎকালীন সেনাপ্রধানসহ আরো কয়েকজন সিনিয়র অফিসার আর্মির নিয়মকানুন উপেক্ষা করে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে তথা নিজেদের অবস্থান, প্রমোশন, পোস্টিং ও অন্যান্য সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলেন। রাজনৈতিক দলগুলোও নিজেদের স্বার্থে ওইসব অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁদেরকে দলাদলি, কোন্দল ইত্যাদি অপেশাদার কাজে উৎসাহিত করে। মূলত সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে সে সময় এমন ধারণার সৃষ্টি হয় যে, নিজের অবস্থান, প্রমোশন, পোস্টিং ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধার জন্য ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সুনজরে থাকা প্রয়োজন। এই অপেশাদার ও অনৈতিক প্রতিযোগিতার ফলে ১৯৯৬ সালের ২০ মে সেনাবাহিনী নিজেদের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যা দেশে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারত।

অভ্যুত্থানের আলামত

মনে পড়ে ১৯৭৫ সালের প্রথমদিকের কোনো এক সন্ধ্যায় আমি ও জেনারেল জিয়া স্কোয়াশ খেলে এসে জিয়ার বাসার সামনের লনে বসে গল্প করছিলাম। আগেই বলেছি, আমার ও জেনারেল জিয়ার বাসা সামনাসামনি। কথাবার্তাশেষে আমি উঠে বাসায় রওয়ানা হচ্ছিলাম। বাইরের গেটে এসে দেখি

মেজর ফারুক একা দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে কী করছে জানতে চাইলে সে জানায়, উপ-সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়ার সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছে। আমি আর কোনো কথা না বলে নিজের বাড়িতে চলে গেলাম। ফারুক তখন আমার সরাসরি অধীনে ছিল না। তা থাকলে তাকে হয়তো আমার আরো অনেক বিস্তারিত প্রশ্নের জবাব দিতে হতো। পরদিন আমি অফিসে জেনারেল জিয়ার কাছে বিষয়টি তুলি। তিনি আমাকে বললেন, 'হ্যাঁ, ফারুক এসেছিল।' সেইসঙ্গে এও জানান যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী অফিসারদের বলে দিয়েছেন, এভাবে জুনিয়র অফিসারদের তাঁর বাড়িতে আসা নিরুৎসাহিত করতে। জেনারেল জিয়ার সঙ্গে তাঁর ওই সাক্ষাতের বিষয়টি ম্যাসকারেনহাসের লিগেসি অফ ব্লাড বইয়ের ৫৪ পৃষ্ঠায় ফারুক বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে আরেকটি ঘটনার কথা বলতে হয়। ১৯৭৫ সালে, খুব সম্ভব জুলাই মাসের প্রথম দিকে, একদিন আমি বাস্কেটবল খেলা শেষ করে বিকেলবেলায় শহীদ মইনুল রোডে অবস্থিত আমার বাসায় ঢুকছিলাম। বাসার গেইটে মেজর রশিদ (মুজিব-হত্যার প্রধান অভিযুক্ত) আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছে। আলাপের শুরুতেই সে সেনাবাহিনী, রাজনীতি, বাকশাল ইত্যাদি সম্পর্কে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে লাগলো। আমি তাকে তার ব্রিগেড অধিনায়ক কর্নেল শাফায়াত জামিলকে এসব জানাতে বলি। আর্মি আইন অনুসারে যদি কোনো বিষয়ে সামরিক বাহিনীর কোনো ব্যক্তির ক্ষোভ কিংবা অভিযোগ থাকে তবে তা তার নিজ অধিনায়কের দৃষ্টিগোচরে আনার কথা। রশিদ ৪৬ ঢাকা ব্রিগেডের ২য় ফিল্ড আর্টিলারির সদস্য ছিল। শাফায়াত জামিলের আগে আমি ওই ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলাম।

আমি তৎক্ষণাৎ অনুধাবন করি, রশিদ হয়তো ভেবেছে, সম্প্রতি আমাকে ঢাকা ব্রিগেড থেকে বদলি করায় আমি হয়তো সরকারের ওপর মনঃক্ষুণ্ন। তাই সে তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে আমাকে উত্তেজিত করতে সক্ষম হবে এবং আমি তার রাজনৈতিক অভিমতকে সমর্থন করবো। কিন্তু সে ভুল লোকটিকে বেছে নিয়েছিল। তবে ঘুণাক্ষরেও এটা বুঝতে পারিনি যে, সে বা তারা জঘন্য কোনো পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে।

ব্যক্তিগত জীবনে দুর্ঘটনা

এর কয়েকদিন পর জুলাই মাসের মাঝামাঝি ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্রিগেড বাস্কেটবল টিমের সঙ্গে খেলছিলাম। খেলার মধ্যেই হঠাৎ করে আমি

মাটিতে পড়ে যাই এবং চামড়া ছিঁড়ে পায়ের অ্যাঙ্কলের হাড় বের হয়ে যায়। প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আমি জ্ঞান হারাই। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রাত দুটোর দিকে সার্জন কর্নেল আলী আমার পায়ে অস্ত্রোপচার করেন। পরের দিন সেনাপ্রধান ও উপসেনাপ্রধানসহ অনেক সামরিক ও বেসামরিক অফিসার, শুভাকাঙ্ক্ষী, আত্মীয়স্বজন আমাকে দেখতে আসেন। এদিকে আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা (৩১ আগস্ট ১৯৭৫ আমার প্রথম সন্তান পিংকি জন্মগ্রহণ করে)। প্লাস্টার খোলার পর দেখা যায়, পায়ে ইনফেকশন আছে এবং ক্ষতের কারণে উরু থেকে চামড়া গ্রাফটিং করে জোড়া দিতে হবে। এর মধ্যে মেজর জেনারেল জিয়া আরো কয়েকদিন আমাকে দেখতে হাসপাতালে আসেন। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবও টেলিফোন করে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে আমার খোঁজখবর নেন। প্রায় তিন সপ্তাহ হাসপাতালে থাকার পর ১২ আগস্ট নিজ বাড়িতে ফেরত আসি। কিন্তু শরীর তখনও অত্যন্ত দুর্বল। হাসপাতাল থেকে লোক বাড়িতে এসে পায়ে ওষুধ ও ব্যান্ডেজ বদল করত। স্বভাবতই অফিসে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সে কারণে ওই সময় সেনাবাহিনীর ভেতরকার খবর বা বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি।

রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব হত্যা

১৫ আগস্ট ভোরে আমার বাড়ির আর্মির টেলিফোনটি বেজে ওঠে। আমি তখনও বিছানায়। আমার স্ত্রী টেলিফোন উঠান এবং আমাকে জানান যে, মেজর জেনারেল জিয়া আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি টেলিফোন ধরামাত্রই জিয়ার কণ্ঠ শুনি। টেলিফোনের ওই প্রান্ত থেকে জিয়া বললেন, তুমি কিছু শুনেছো? আমাকে জবাব দেয়ার অবকাশ না দিয়েই তিনি ইংরেজিতে বললেন, 'প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব হ্যাজ বিন কিল্ড।' আমি হঠাৎ এতোই হতবাক হয়ে যাই যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কীভাবে এ খবর জানেন। উত্তরে তিনি জানান, সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ তাকে এইমাত্র ফোনে জানিয়েছেন এবং সেসঙ্গে আমাকে তাড়াতাড়ি আর্মি হেডকোয়ার্টারে যেতে বলেছেন। আমার পায়ে তখনও ব্যান্ডেজ, চলাফেরায় অসুবিধা এবং শরীরও দুর্বল। তবুও আমি বিছানা থেকে উঠে আর্মি হেডকোয়ার্টারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হই। প্রায় চার সপ্তাহ পর আমি সামরিক পোশাক পরলাম। আমি এবং মেজর জেনারেল

জিয়া সেনানিবাসে শহীদ মইনুল হোসেন রোডে মুখোমুখি বাড়িতে থাকতাম। তিনি ৬নং বাড়িতে (বর্তমানে খালেদা জিয়া থাকেন) এবং আমি ৭নং বাড়িতে থাকতাম।

জেনারেল রব ও মোতাহারউদ্দিন

আর্মি হেডকোয়ার্টারে যাওয়ার জন্য গাড়ির অপেক্ষায় বাসার সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। দেখি, আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাংসদ অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল রব (বর্তমানে মৃত) এবং তৎকালীন চা বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ মোতাহারউদ্দিন গাড়িতে করে আমার বাড়িতে উপস্থিত। আমি কিছু বলার পূর্বেই তাঁরা দুজনে আমাকে অনুরোধ করেন, আমি যেন তাঁদের সঙ্গে আমার বাড়ি সংলগ্ন পুরনো ডিওএইচএস-এ জেনারেল ওসমানীর বাড়িতে যাই। আমি তাঁদেরকে বলি, আমাকে আর্মি হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ওসমানীর বাড়িতে আমার যাওয়া দরকার কেন তাও জানতে চাই। তাঁরা বললেন, জেনারেল ওসমানীকে এ পরিস্থিতিতে খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে যোগদান করা থেকে বিরত রাখার জন্য তাঁদের সঙ্গে আমাকেও নিয়ে যেতে চান। আমি উত্তরে তাঁদের জানাই যে, জেনারেল ওসমানীকে খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে যোগদান করা থেকে বিরত রাখা হয়তো সম্ভব হবে না। কেননা আমি যতোটুকু জানি, স্বাধীনতাযুদ্ধের পর জেনারেল ওসমানী প্রতিরক্ষামন্ত্রী হওয়ার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ওই দপ্তর প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে রাখেন। এ ছাড়া বাকশাল গঠন করার পরেই তিনি মন্ত্রিসভা ও সংসদীয় পদ থেকে ইস্তফা দেন। তাই আমার ধারণা, খন্দকার মোশতাকের সরকার তাঁকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিলে তিনি তা গ্রহণ করতে রাজি হবেন।

আমার এ মতামত শোনার পর জেনারেল রব ও মোতাহারউদ্দিন চলে যান। আমি আর্মি হেডকোয়ার্টারের পথে যেতে থাকি। পথেই আমার সঙ্গে ৪৬ ব্রিগেডের অধিনায়ক কর্নেল শাফায়াত জামিলের দেখা। তাঁকে দেখে প্রথমেই আমি জিজ্ঞাসা করি, মুজিবহত্যায় জড়িত অফিসার ও সৈনিকদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন। উত্তরে তিনি আমাকে জানান, তাদের কয়েকজন ঘটনার পর সকালে তাঁর বাড়িতে দেখা করেছে। একথা শুনে আমি অবাক হই। তিনি আমাকে আরো বললেন, এখন তাদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিতে গেলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে। আমি বুঝতে

পারলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে সাহস পাচ্ছেন না, যদিও আমি বলেছি, এটা তাঁরই ব্রিগেডের কাজ এবং তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহের শামিল। যাহোক এর পর আমি আর্মি হেডকোয়ার্টারে যাই।

কারা খুনি

আর্মি হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত হয়েই জানতে পারি, সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ ও উপসেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান দুজনেই তখন মেজর ডালিমের সঙ্গে ঢাকা বেতার-কেন্দ্রে গেছেন। হেডকোয়ার্টারে বসেই আমি খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারি, ১ম ল্যান্সারের মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান এবং ২য় ফিল্ড আর্টিলারির মেজর রশিদের নেতৃত্বে কিছু চাকুরিরত আর্মি অফিসার, কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার এবং সৈনিক রাতের বেলা নৈশ প্রশিক্ষণের ছলে নতুন বিমানবন্দরে জড়ো হয়। সেখান থেকে রাতে তারা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবার, মন্ত্রী সেরনিয়াবাত ও তাঁর পরিবার এবং শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর পরিবারকে স্ব স্ব বাড়িতে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

আমি ঢাকা ব্রিগেডের অধিনায়ক থাকাকালে মেজর রশিদ ও মেজর ফারুক প্রত্যক্ষভাবে আমার অধীনে কাজ করেছিল। আমি তাদের ভালোভাবেই জানি। এরা দুজনেই পাকিস্তান আর্মিতে স্বল্পমেয়াদি (ছয় মাসের) প্রশিক্ষণে ১৯৬৫ সালে কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার। মেজর রশিদ ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের শেষদিকে ঢাকায় 'ছুটিতে এসে' মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। মেজর ফারুক ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখ বিজয়ের তিনদিন আগে যশোরে তৎকালীন মেজর মঞ্জুরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। আমি যখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল তখন মেজর ফারুককে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমার কাছে ফাইল আসে। সে পাকিস্তানের বাইরে মধ্যপ্রাচ্যে থেকেও ৯ মাসেও স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগদান করেনি। দেশের স্বাধীন হওয়া যখন প্রায় নিশ্চিত তখন অর্থাৎ ১২ ডিসেম্বর যশোরে মুক্তিবাহিনীতে সে যোগদান করে। এসব প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আমি তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজি হইনি। তাই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মেজর ফারুক সামরিক বাহিনীতে স্বীকৃতি পায়নি। যদিও অনেক সিনিয়র অফিসার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য আমাকে সুপারিশ করেছেন, কিন্তু আমি তাতে রাজি হইনি। অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে বিষয়টি দেখার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর।

রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে

দুপুরের দিকে সেনাপ্রধান ও উপসেনাপ্রধান রেডিও স্টেশন থেকে আর্মি হেডকোয়ার্টারে ফেরত আসেন। তাঁরা আমাকে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানান। এর পরই তারা আমাকে বলেন, সাভারে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে প্রায় ১ হাজার অফিসার ও সৈন্য রয়েছে। তখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে আর্মির কোনো যোগাযোগ হয়নি। এদিকে গুজব ছিল, রক্ষীবাহিনী সশস্ত্র প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে আমি যেন সাভারে রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে এ পরিস্থিতিতে শান্ত থাকা এবং শান্তি-শৃঙ্খলাভঙ্গের কাজে যেন জড়িত না হয়, তার ব্যবস্থা করি। আমাকে আরো বলা হলো, আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি করা হবে।

আমি তখন সাভারে রক্ষীবাহিনীর ডেপুটি ডাইরেক্টারস্ সরওয়ার হোসেন মোল্লা ও আনোয়ারুল আলমের (উভয়ে বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মরত) সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমি তাঁদের জানাই যে, সাভারে এসে আমি রক্ষীবাহিনীর অফিসার ও সৈনিকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে চাই এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের জানাতে চাই। সে মোতাবেক বিকেলবেলায় অসুস্থ শরীরে আমি কোনো সৈন্য ছাড়াই একটি জিপ নিয়ে সাভার রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছি। সেখানে রক্ষীবাহিনীর অধিনায়কগণ আমাকে অভ্যর্থনা জানান। আমি আমার বক্তব্যে রক্ষীবাহিনীকে দেশের এ দুর্যোগমুহূর্তে ধৈর্য ধরে শান্ত থাকতে অনুরোধ করি এবং তাদেরকে সামরিক বাহিনীতে আত্মীকরণ করা হবে বলে দৃঢ় আশ্বাস প্রদান করি। আমি তাদের উপদেশ দিই যে, আমরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা, কোনোপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা, অশান্তি ও বিভেদ ইত্যাদিতে জড়িয়ে বহু কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতা যেন বিপন্ন না করি। ঘণ্টা দুয়েক তাদের সঙ্গে থাকার পর আমি সাভার থেকে ঢাকা সেনানিবাসে ফিরে আসি।

বিদ্রোহদমনের উদ্যোগ ছিল না

১৫ তারিখ রাত প্রায় দুটো পর্যন্ত আর্মি হেডকোয়ার্টারে ছিলাম। ততোক্ষণে আমি এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে পারি। রাত দুটোর

পর বাড়িতে আসি। যদিও আমি অত্যন্ত দুর্বল ও ক্লান্ত, শরীর অত্যন্ত খারাপ, তবুও আমার ঘুম আসছিল না। সর্বক্ষণ আমার এ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের কথা মনে হচ্ছিল। সৈনিক হিসেবে স্বাভাবিকভাবে আমি একজন সামরিক ইতিহাসের ছাত্র। এ বিষয়টি আমার খুবই প্রিয়। কাজের অবসরে দেশ-বিদেশের সামরিক ইতিহাস পড়া আমার নিয়মিত অভ্যাস। সামরিক বাহিনীতে যোগদান করা থেকে অদ্যাবধি আমি সামরিক ইতিহাস পড়ে আসছি। আমার জানামতে, এমন জঘন্য কলঙ্কময় ঘটনা কোনো দেশের সামরিক ইতিহাসে নেই। আমি অবাক হই যে, চাকরিরত ও অবসরপ্রাপ্ত গুটিকয়েক জুনিয়র অফিসার ঢাকায় এতো বড় একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ঘটাতে কীভাবে সক্ষম হলো। একজন পেশাদার সৈনিক হিসেবে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক কথায় আমার অভিমত হচ্ছে, উচ্চপদস্থ অধিনায়কদের নিয়ন্ত্রণে বিপর্যয়ের জন্য এ ঘটনা ঘটা সম্ভব হয়েছে, যদিও তাঁরা পরে এ সম্পর্কে নানা গবেষণা, তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকেন।

এখানে বলতে হয়, যদি এই ঘটনার জন্য দায়ী অফিসার ও অন্যদের সামরিক আদালতে (কোর্ট মার্শাল) বিচার করার ব্যবস্থা হতো, তবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দণ্ডবিধি আইনের ৩১ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিরূপে গণ্য হতেন : ১) যিনি বিদ্রোহ আরম্ভ করেন কিংবা বিদ্রোহে অন্যকে উৎসাহিত করেন অথবা ২) যদি উপস্থিত থাকেন এবং সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বিদ্রোহ দমন না করেন। এ আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ডসহ অন্যান্য শাস্তির বিধান রয়েছে। সেনাবাহিনীর সঙ্গে কোনো বেসামরিক ব্যক্তি এই বিদ্রোহের কাজে জড়িত থাকলে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৭নং অনুচ্ছেদের ১৩৯নং ধারা অনুযায়ী তারাও সামরিক আদালতে বিচারের আওতায় আসবে।

তাই এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, চেইন অফ কমান্ডে মুজিবহত্যার ঘটনার পর মেজর রশিদ ও ফারুকের অধিনায়কগণও সামরিক আদালতে দোষীরূপে গণ্য হতেন। কেননা, আমার জানামতে, তারা তৎক্ষণাৎ এ বিদ্রোহদমনের জন্য মোটেই কোনো প্রচেষ্টা চালাননি।

মুজিব হত্যাকাণ্ড : কারণ অনুসন্ধান

গুটিকয়েক উচ্ছৃঙ্খল ও উচ্চাভিলাষী অফিসার কীভাবে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটাতে সক্ষম হলো তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আমার বিশ্লেষণমতে, আমি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে হত্যাকাণ্ডের কারণগুলো তুলে ধরছি।

ক) সে সময় দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। সামরিক বাহিনীতেও এর প্রভাব পড়ে। এমনকি ওইদিন অর্থাৎ ১৫ আগস্টের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীকে যদি আদেশ দেওয়াও হতো, সৈনিকেরা সে আদেশ কতোটুকু পালন করত তা নিয়ে অধিনায়কদের মনে বেশ সন্দেহ ছিল। অনেক সৈনিক তখন নিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করত বলে মনে করা হতো। তবে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের ঘটনায় সামরিক বাহিনীর সদস্যরাও মর্মাহত হয়েছিলেন। তবে এই অজুহাতে অধিনায়কদের বিদ্রোহদমনের চেষ্টা না করা সামরিক আইনে গুরুতর অপরাধ।

খ) কোনোরূপ পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা যাচাই না করে শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক পদে অদক্ষ, অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগদান।

গ) সেনাবাহিনীতে পেশাগত দায়িত্বপালনে অবহেলা এবং অযোগ্য অধিনায়কত্ব। তাই সহজেই হত্যাকারী অফিসারগণ নিজেদের স্বার্থ আদায়ের জন্য সাধারণ সৈনিকদের বিপথগামী করতে সক্ষম হন।

ঘ) এ পরিকল্পিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পূর্বে নৈশ প্রশিক্ষণের নামে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিপুল সৈন্য নতুন বিমানবন্দরে জড়ো হলো। স্বভাবতই এ নৈশ প্যারেডের সময় ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারও এ প্রশিক্ষণে উপস্থিত থাকার কথা। অথচ আমার মনে হয় না, ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের অফিসারগণ নৈশ প্যারেডে উপস্থিত ছিলেন।

ঙ) রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার প্রধান দায়িত্ব সামরিক সচিব ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার। অথচ সে সময় রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তাব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো স্থায়ী আদেশ (স্ট্যান্ডিং অর্ডার) ছিল বলে অদ্যাবধি জানা যায়নি।

চ) কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে ১ম ফিল্ড আর্টিলারির সৈনিকদের ঢাকায় এনে রাষ্ট্রপতির বাড়িতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার বিষয়টি আমার কাছে বোধগম্য নয়। তা ছাড়া নিরাপত্তা ও আনুষ্ঠানিক গার্ড দুটোই ভিন্ন বিষয়। এ দুটোকে এক করার কথা নয়। ওই ১ম ফিল্ড আর্টিলারির তৎকালীন ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ছিলেন ওই ইউনিটেরই অ্যাডজুটেন্ট। ফলে তিনি প্রহরারত সৈনিকগণকে ধোঁকা দিয়ে হত্যাকারীদের নিয়ে অনায়াসে রাষ্ট্রপতির বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তে সক্ষম হন।

ছ) সেনানিবাসে এবং রাষ্ট্রপতির বাড়ির আশপাশে সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দাদের নজর রাখার কথা, বিশেষ করে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির

প্রেক্ষাপটে এটা আরো জরুরি ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি যে, সে সময় সেনানিবাসে কিংবা রাষ্ট্রপতির বাড়ির আশপাশে গোয়েন্দা সংস্থার কেউ কর্তব্যরত ছিল।

পরিস্থিতির এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের পর মনে হচ্ছে, ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা পূর্ব থেকে না জেনে থাকলেও নতুন এয়ারপোর্ট (বর্তমান বিমানবন্দর) থেকে যখন সৈন্যরা ট্যাঙ্ক ও কামান নিয়ে শহরের দিকে রওনা হলো তখনও গোয়েন্দা সংস্থাসহ সংশ্লিষ্টরা জানলে (যা উচিত ছিল) সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে এই বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটানো সম্ভব হতো না। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, আক্রান্ত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির নিজের পক্ষ থেকেই ফোন করে তাঁর ওপর আক্রমণের খবর সংশ্লিষ্টদের জানাতে হলো, যদিও ওই মুহূর্তে প্রতিরোধ প্রচেষ্টা চালানো হলে রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করা হয়তো সম্ভব হতো না। তবে খবর পাওয়ার পরপরই সামরিক আইনকানুন অনুযায়ী সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে বিদ্রোহীদের দমনের জন্য সবরকম প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত ছিল। আর এটা না করা সামরিক আইনে অন্যায় ও শাস্তিযোগ্য।

পরে শুনেছি, অনেকে মনে করতেন বা এখনও করেন, ওই সময় কোনোরকম ব্যবস্থা নিলে নিজেদের মধ্যে অনেক রক্তপাত হতো। কথা হলো, সামরিক শৃঙ্খলা আইনে এ ধরনের অজুহাত দেখিয়ে অধিনায়কদের নিষ্ক্রিয় থাকার কোনো সুযোগ নেই।

খন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বগ্রহণ

শেখ মুজিবের হত্যার পর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা এবং আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য খন্দকার মোশতাক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। সরকার গঠন করে তিনি 'জয়বাংলা' ধ্বনির স্থলে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' ধ্বনি প্রচলন করেন। বাংলাদেশবিরোধী ও পাকিস্তানপন্থী কিছু ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদে বহাল করেন। এ সময় স্বাধীনতাবিরোধী চক্র রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অঙ্গনে বেশ তৎপর হয়ে উঠলো।

ক্ষমতায় এসেই এই সরকার তাড়াহুড়ো করে সামরিক বাহিনীতে পরিবর্তন আনে। জেনারেল ওসমানীকে একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদায় রাষ্ট্রপতির সামরিক উপদেষ্টা করা হলো। উপসেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান করা হলো। আর পূর্বতন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁর চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত

করা হলো রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগের জন্য। তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার এইচ এম এরশাদকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে উপসেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হলো। এই নিয়ে ভারতে প্রশিক্ষণে থাকাকালে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তিনি কর্নেল থেকে দুটি পদোন্নতি পেয়ে মেজর জেনারেল হন যা সেনাবাহিনীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। বিমানবাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন তোয়াব স্বাধীনতাযুদ্ধের পুরো সময় জার্মানিতে ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে অনীহা প্রকাশ করেন। তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে এসে বিমানবাহিনীর প্রধান করা হলো। বিমানবাহিনীর তৎকালীন প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারের চাকরি রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হলো। বিডিআরের প্রধান মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ পদে নিযুক্ত করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে বহাল করা হলো। সামরিক বাহিনীর এসব পরিবর্তনে জেনারেল ওসমানী ও শেখ মুজিব হত্যাকারী মেজর রশিদ, মেজর ফারুক, মেজর শরীফুল হক (ডালিম) এবং তাদের সহযোগীরা সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। কারণ তখন এই অফিসারগণ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাকের আশপাশে থাকতেন।

মেজর রশিদ, ফারুক এবং তাদেরই সহযোগীদের হাবভাব ও চালচলন দেখে মনে হতো, দেশ এবং সেনাবাহিনী তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। মেজর ফারুক বঙ্গভবনের একটি কালো মার্সিডিজ গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়াত। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন লোকজনের কাছ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় এবং অন্যান্য অনিয়মের অভিযোগ ছিল। খন্দকার মোশতাক এদেরকে তার নিজের নিরাপত্তার জন্য বঙ্গভবনেই থাকতে উৎসাহিত করতেন। এর মধ্যে তিনি সেনাবাহিনীর কোনো সুপারিশ ছাড়াই মেজর ফারুক ও রশিদকে লে. কর্নেল পদে পদোন্নতি দেন। ডালিমকেও সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে নিয়ে লে. কর্নেল করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে মোশতাক এক অধ্যাদেশ বলে ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের কোনোরূপ বিচার বা শাস্তি দেয়া যাবে না—এই মর্মে 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' জারি করেন।

সেনাপ্রধান পদে মেজর জেনারেল জিয়া

নতুন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান আমাকে স্থায়ীভাবে অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল পদে কাজ করতে আদেশ দেন এবং রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীতে সত্বর আত্মীকরণের কাজ শুরু করার জন্য বলেন। অবশ্য এ

কাজটি অ্যাডজুটেন্ট জেনারেলেরই কাজ। এ কাজ নিয়ে আমাকে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়। রক্ষীবাহিনীকে পুনর্গঠন করে সেনাবাহিনীতে ধাপে ধাপে আত্মীকরণের প্রক্রিয়া আরম্ভ করি। রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের সেনাবাহিনীতে স্বল্পমেয়াদি কমিশনে আত্মীকরণ করা হয়। অন্যান্যের মধ্যে এ কাজে আমাকে সহায়তা করতেন আমার ব্রাঞ্চের অধীনে পরিচালক লে. কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল) ওয়াজিউল্লাহ। শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের সময়ে রক্ষীবাহিনীর প্রধান (স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন) ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান দেশের বাইরে ছিলেন এবং ফিরে এসে তিনিও আমাকে এদের আত্মীকরণের কাজে সহায়তা করেন। এ আত্মীকরণপ্রক্রিয়া মোটামুটি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়।

শেখ মুজিবের হত্যার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাধারণ অবস্থা ছিল বিভ্রান্তিমূলক। এ পরিস্থিতি নিয়ে আমি নিজেও বেশ অস্বস্তিকর অবস্থায় ছিলাম। এর মধ্যে একদিন মিলিটারি পুলিশ, যা অ্যাডজুটেন্ট জেনারেলের অধীনে, তাদের কয়েকজনকে আমার অজান্তে বঙ্গভবনে নিয়োগ করা হয়। পরে জানতে পারি, মেজর রশিদ ও মেজর ফারুকের আদেশে এই মিলিটারি পুলিশদের বঙ্গভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি রশিদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করি এবং তাদের সেনানিবাসে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিই। তাকে বলি যে, আমার অনুমতি ছাড়া মিলিটারি পুলিশকে কোথাও নিয়োগের প্রশ্নই ওঠে না এবং তৎক্ষণাৎ মিলিটারি পুলিশকে সেনানিবাসে ফেরত আনি।

নিরাপত্তাহীনতায় খালেদ মোশাররফ

এদিকে কিছু-কিছু সিনিয়র আর্মি অফিসার ফারুক-রশিদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। কারণ তাঁরা বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোশতাকের ঘনিষ্ঠ সহচর। অন্যদিকে সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়া মুজিবহত্যায় জড়িত অফিসার এবং অন্যান্যকে আয়ত্তে আনার জন্য কোনোরূপ সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিতে অপারগ ছিলেন। সম্ভবত তিনি নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে ব্যস্ত ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ যিনি আর্মিতে সিজিএস (চিফ অফ জেনারেল স্টাফ) ছিলেন তাঁর সঙ্গে সেনাপ্রধানের সম্পর্ক ভালো ছিল না। তাই জেনারেল জিয়া সেনাপ্রধান হওয়ার পর তিনি আর্মিতে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন এবং কথা প্রসঙ্গে একদিন তা আমাকে বলেনও। কারণ আমি যতটুকু জানি, রাষ্ট্রপতি মোশতাকের সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল ওসমানী জিয়াকে তেমন পছন্দ করতেন না। খালেদ মোশাররফ তাঁর

অধিকতর পছন্দনীয় অফিসার ছিলেন। কিন্তু মেজর ফারুক-রশিদ এবং তাদের সহযোগীদের চাপে খন্দকার মোশতাক মুজিবহত্যার পর জেনারেল জিয়াকে সেনাপ্রধান করেন। সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে জেনারেল ওসমানী হয়তো তখন রাষ্ট্রপতির ওপর কোনোরূপ প্রভাব খাটাতে পারেননি।

সেনাবাহিনীর ২য় ফিল্ড আর্টিলারি ও ১ম ল্যান্সার, যারা সরাসরিভাবে ১৫ আগস্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল তারা, তখনও ফারুক-রশিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আর্মিতে এ নিয়ে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান ছিল। ঢাকা ব্রিগেডের তৎকালীন কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল এ নিয়ে বেশ বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলেন। বস্তুত চারটি পদাতিক বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছাড়া বাকি দুটি তথা ২য় ফিল্ড আর্টিলারি ও ১ম ল্যান্সার তাঁর অধীনস্থ এলাকায় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার পর থেকেই ব্রিগেড ও আর্মি হেডকোয়ার্টারের তত্ত্বাবধান ও আওতার বাইরে চলে যায় যা সেনাবাহিনীর জন্য অস্বাভাবিক ছিল। এ পরিস্থিতির কারণে তিনি সর্বদা ব্যক্তিগতভাবে বিব্রত ও উত্তেজিত থাকতেন।

বঙ্গভবনে চা-চক্র

১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসেরই শেষদিকে একদিন রাষ্টপতি মোশতাক ঢাকায় অবস্থিত সামরিক বাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের বঙ্গভবনে চা-চক্রে নিমন্ত্রণ করেন। শাফায়াত জামিল আমাকে জানান, তিনি এ চা-চক্রে যোগ দেবেন না বলে সেনাপ্রধানকে জানিয়েছেন। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, তাঁর সন্দেহ বঙ্গভবনে নিয়ে মোশতাক এসব মেজরদের দিয়ে আর্মির সিনিয়র অফিসারদের আটক অথবা হত্যা করার জন্য ফাঁদ পেতে থাকতে পারেন। তা ছাড়া ওই চা-চক্রে ফারুক-রশিদ ইত্যাদি জুনিয়র অফিসারগণ থাকবেন। ফলে ওই চা-চক্র সিনিয়র অফিসারদের অসম্মানিত করারই শামিল হবে। এরপর আমি বিষয়টি সেনাপ্রধান জিয়াকে জানাই এবং বলি যে, মেজর ফারুক-রশিদ এবং অন্যরা যারা বঙ্গভবনে আস্তানা পেতেছে তারা এ চা-চক্রে আমন্ত্রিত হলে আমাদের যাওয়া সমীচীন হবে না। তিনি আমাকে এ সম্পর্কে জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে বঙ্গভবনে কথা বলতে বলেন। আমি জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করি এবং জানাই, যদি ফারুক-রশিদ ও তার সহযোগীরা এ চা-চক্রে উপস্থিত থাকেন তা হলে আর্মির সিনিয়র অফিসাররা এতে অংশ নেবেন না। ওসমানী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবেন বলে

আমাকে জানান। পরে ওসমানী ফোনে আমাকে জানান, আমার প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতি সায় দিয়েছেন এবং মেজর ফারুক-রশিদ ও তার সহযোগীরা এ চা-চক্রে থাকবে না। শেষ পর্যন্ত আমি ও কর্নেল শাফায়াত একই জিপযোগে বঙ্গভবনে যাই। চা-চক্রে সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল ওসমানী ও সেনাপ্রধান জিয়া উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি মোস্তাককে বেশ অসহায় এবং বিচলিত দেখাচ্ছিল। ওই চা-চক্রে রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কেউ দেশ বা সামরিক বাহিনী নিয়ে কোনো আলাপ-আলোচনা করেননি এবং চা-চক্রের পরিস্থিতি ছিল অস্বাভাবিক ও থমথমে।

কোনো বর্ণনাতেই বঙ্গভবনের সেদিনের সেই চা-চক্রের অস্বাভাবিক পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। আমার দীর্ঘ সামরিক ও কূটনৈতিক জীবনে এমন চা-চক্র আর দেখিনি। প্রেসিডেন্ট মোশতাক নিজেও কোনো কথাবার্তা বলছিলেন না। আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম তারাও তেমন কোনো কথাবার্তা বলিনি। কথা বলার কোনো পরিস্থিতিই সেখানে ছিল না। ফলে চা-চক্র বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি।

এদিকে ফারুক, রশিদ ও তাদের সহযোগী জুনিয়র অফিসাররা বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি মারছিল এবং ভেতরের অবস্থা আঁচ করার চেষ্টা করছিল। এতো বড় জাতীয় দুর্ঘটনার পর সবাই মানসিকভাবে বেশ উত্তপ্ত ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল। দেশের, বিশেষ করে সামরিক পরিস্থিতি ছিল অস্থিতিশীল।

মোশতাকের প্রতি সিনিয়র অফিসারদের দৃষ্টিভঙ্গি আঁচ করার জন্যই ওই চা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল বলে আমার মনে হয়েছিল। চা-চক্রে যোগদানের ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকজনের অনড় শর্তারোপের ফলে মোশতাক হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, সব সিনিয়র অফিসারই তাঁদের ধারণামতে, ভয়ভীতির মধ্যে চাকরি করছে এমনটি সত্য নয়। তাঁর দুশ্চিন্তার আরো কারণ ছিল। তিনি গুটিকতক জুনিয়র অফিসারের সহায়তায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছেন।

'৭৫-এর উত্তপ্ত নভেম্বর

শেখ মুজিব হত্যার পর বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী ছিল দ্বিধাগ্রস্ত এবং দেশ প্রতিদিন অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। এদিকে খন্দকার মোশতাক ক্ষমতায় এসেই আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা সর্বজনাব নজরুল ইসলাম,

তাজউদ্দিন আহমেদ, মনসুর আলী, এ এইচ এম কামরুজ্জামান ও আবদুস সামাদ আজাদকে আটক করেন এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি করে রাখেন। বাতাসে প্রতিনিয়ত নানা গুজব উড়ছিল ও সাধারণ নাগরিকগণ ভয়ভীতির মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। সেনানিবাসেও অস্থিরতা বিরাজ করছিল এবং ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, নিজেদের মধ্যে যে-কোনো সময়ে সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে। এ পরিস্থিতিতে আর্মিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা খুবই জরুরি ছিল। পদাতিক বাহিনীর মধ্যে, বিশেষ করে ঢাকা ব্রিগেডের ১ম, ২য় ও ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসারগণ মেজর ফারুক, রশিদ ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠছিল এবং আর্মির চেইন অফ কমান্ড পুনঃস্থাপনের জন্য তৎকালীন ব্রিগেড অধিনায়ক কর্নেল শাফায়াত জামিলও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। কারণ তাঁর অধীনস্থ অফিসার ও সৈন্যগণই তাঁর সার্বিক কর্তৃত্ব উপেক্ষা করে শেখ মুজিব হত্যায় জড়িত ছিল। এ পরিস্থিতিতে সেনাসদরে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফও সেনাবাহিনীর জুনিয়র অফিসারদের অনিয়ম ও আইনশৃঙ্খলার অবনতির কথা বলে উত্তেজিত করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। কেননা, তিনি নিজেও জেনারেল জিয়ার অধীনে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন। সামরিক বাহিনীর এই অস্থির অবস্থার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্নেল শাফায়াত জামিল ও ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সেনাপ্রধান জিয়াকে দায়ী করতেন। সেনাপ্রধান জিয়া এবং সেনাবাহিনীর অন্য অফিসাররা যদিও এ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে উদ্যোগী হননি। কেননা জিয়া একধরনের ভারসাম্য রক্ষা করে নিজের অবস্থান ঠিক রেখে আর্মির অধিনায়কত্ব করে চলছিলেন।

জিয়ার বন্দিত্ব

এরই মধ্যে চলে এলো ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বর। আমি তখনও অসুস্থ এবং লাঠিতে ভর দিয়ে চলাফেরা করি। বাসায় আমার স্ত্রী ও দুই মাসের কন্যাসন্তান। ভোর সাড়ে চারটা হবে তখন হঠাৎ আমার বাসার টেলিফোন বেজে ওঠে এবং অন্য প্রান্ত থেকে একজন মহিলা বলে ওঠেন, 'ভাই, এখানে কী হচ্ছে? অফিসার ও সৈনিকরা আমার বেডরুম থেকে "ওকে" ধরে নিয়ে যাচ্ছে।' এ বলেই তিনি ফোন রেখে দেন। আমি ঘুমের ঘোরে পুরো ব্যাপারটি আঁচ করতে পারিনি এবং বুঝতেও পারিনি তিনি কী বলতে চাচ্ছেন। এক

পর্যায়ে ভাবলাম, হয়তো বেগম রওশন এরশাদ, যিনি একাকী আর্মি হেডকোয়ার্টারের অফিসার মেসের পাশে থাকতেন, তিনিই হয়তো টেলিফোন করে থাকবেন কোনো ভীতির কারণে। কেননা তখন পর্যন্ত মেজর জেনারেল এরশাদ সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে ছিলেন। ঠিক ওই মুহূর্তে আবার টেলিফোন বেজে ওঠে। অপর প্রান্ত থেকে বলা হলো—'ভাই, জিয়াকে বেডরুম থেকে ধরে নিয়ে ড্রইংরুমে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।' আমি তৎক্ষণাৎ সম্বিৎ ফিরে পাই এবং অপর প্রান্তে বেগম খালেদা জিয়াকে বলি যে, 'আমি আপনার বাড়িতে আসতে চেষ্টা করবো।' এ বলেই আমি ফোন রেখে দিলাম।

আমি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে সামরিক পোশাক পরে বাইরে আসি। ১৫ আগস্টের ঘটনার পর থেকে আমি ২য় ইস্ট বেঙ্গলের ১৫ জন বিশ্বস্ত নন-কমিশন্ড অফিসার ও সৈনিককে আমার বাড়ির পাহারায় নিয়োজিত করি। ১৯৬৪ সালে এই ২য় ইস্ট বেঙ্গলেই আমার সামরিক জীবনের শুরু। তারপর স্বাধীনতাযুদ্ধে এবং পরেও আমি এই ২য় বেঙ্গলেরই অধিনায়ক ছিলাম। বাইরে এসে আমার গার্ড কমান্ডার হাবিলদার জাকিরকে কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে সে আমাকে বিস্তারিত জানায়। হাবিলদার জাকির পুরো ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছে। সেনাপ্রধানের বাড়ি পাহারায় নিযুক্ত ছিল ১ম বেঙ্গলের সৈনিকেরা। আর ওই ইউনিটেরই অফিসাররা তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করেছে। সেনাপ্রধান জিয়াকে বাড়ির ভিতরে বন্দি করে রাখা হয়েছে বলে জাকিরকে তাঁর (জিয়ার) নিরাপত্তায় নিয়োজিত লোকজন জানিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সে আমাকে সেনাপ্রধানের বাড়িতে একাকী প্রবেশ করতে নিষেধ করে এবং প্রয়োজনে যেন তাদের নিয়েই প্রবেশ করি এমন অনুরোধ করে। আমি তাকে বলি, আমি একাই যাবো এবং তারা যেন আমার বাড়ির ছাদ ও অন্যান্য স্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করে।

ভোরের আলো তখন ফুটছিল। আমি লাঠিতে ভর করে সেনাপ্রধানের বাড়িতে প্রবেশ করি। হাবিলদার জাকির আমার সঙ্গে গেট পর্যন্ত এসে আমার বাড়িতে ফেরত যায়। আমি সেনাপ্রধানের বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি ক্যাপ্টেন তাজ (বর্তমানে আওয়ামী লীগের এমপি) স্টেনগান হাতে পায়চারি করছে। আমাকে দেখে সে সেখান থেকে সরে যায়। বাড়ির গেটে তালা ঝুলানো ছিল এবং ১ম ইস্ট বেঙ্গলের একজন জেসিও দাঁড়িয়ে ছিল। এ ছাড়া সেনাপ্রধানের এডিসি ক্যাপ্টেন জিল্লুর (পরে ব্রিগেডিয়ার অব.) বেসামরিক পোশাক পরে বাইরের গার্ডরুমে বসে আছে। উল্লেখ্য, ক্যাপ্টেন তাজ, উক্ত জেসিও এবং ক্যাপ্টেন জিল্লুর—এরা সবাই আমার অধীনে ছিল। এ ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে আমি এদের ব্রিগেড অধিনায়ক ছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে তারা সবাই

আমাকে চেনে। আমি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে জেসিওকে গেট খুলতে আদেশ করি। সঙ্গে সঙ্গে সে গার্ডরুম থেকে চাবি এনে গেট খুলে দেয়। আমি বাড়িতে প্রবেশ করি এবং ঘরে ঢুকেই দেখি বামদিকে সেনাপ্রধানের বসার ঘরে ক্যাপ্টেন হাফিজউল্লা (বর্তমানে ব্যবসায়ী) খুব সতর্কভাবে স্টেনগান হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে জেনারেল জিয়া ইউনিফর্ম পরে স্থির হয়ে সোফায় বসা। আমাকে বাসার ভেতরে দেখে হাফিজউল্লাহ্ আঁতকে ওঠে এবং জেনারেল জিয়াও হতভম্ব হয়ে যান। আমি কিছু না বলে পাশ কাটিয়ে জিয়ার শোবার ঘরে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি খালেদা জিয়া তাঁর দুই ছেলে পিনো (তারেক) ও কোকোকে (আরাফাত) নিয়ে বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে তিনি অবাক হন। ফোন করলেও তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, এরকম পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি হয়তো তাঁর বাড়িতে যাব না। যাহোক আমি তাঁকে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোর জন্য রেডি করতে অনুরোধ করি এবং বেডরুম থেকে চলে আসি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমেই জিয়ার দুই ছেলেকে বাড়ি থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়া। আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল, প্রহরীরা আমার এই কাজে বাধা দেয় কি না তা যাচাই করা।

ড্রইংরুমে এসে ক্যাপ্টেন হাফিজউল্লাকে একইভাবে দেখি এবং রাগান্বিত স্বরে বলি সে যেন ড্রইংরুম থেকে সরে গিয়ে দাঁড়ায়। আমার আদেশ অনুযায়ী সে ড্রইংরুম থেকে চলে যায়। এরপর আমি জেনারেল জিয়ার পাশে গিয়ে বসি। জেনারেল জিয়া আমার কাছে জানতে চাইলেন, কর্নেল শাফায়াত জামিল কোথায়? আমি কথা বলতে চাই। আমি তাঁকে বলি, কর্নেল শাফায়াত জামিলের আদেশেই তিনি এখন বন্দি এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে কী লাভ হবে। আমি প্রায় মিনিট দশেক তাঁর সঙ্গে আলাপ করি। এ পরিস্থিতিতে তাঁকে ধৈর্য ধরে এখানে থাকার জন্য বলি।

তিনি কর্নেল শাফায়াতকে ডেকে আনতে বললেন। আমি তাঁকে বললাম, আমি তো পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে জানি না। আপনার স্ত্রীর ফোন পেয়ে আমি সোজা আপনার বাসায় চলে এসেছি। তবে বাসায় ঢোকার সময় যা দেখলাম তাতে মনে হলো, কর্নেল শাফায়াতের ব্রিগেডের (৪৬ ব্রিগেড) অফিসার ও সৈন্যরা আপনাকে গৃহবন্দি করেছে। আপনি নিজেও ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন।

তিনি আমার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যার অর্থ হলো, এ পরিস্থিতিতে আমি কীভাবে তাঁর বাড়িতে ঢুকলাম। আমি তাঁকে বললাম, আপনার ছেলেদের বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। তিনি বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ সময় খালেদা জিয়া তাঁর ছেলেদের নিয়ে ডাইনিংরুমে আসেন। আমি তাঁদের নাশতা করতে বললাম

এবং নাশতা শেষ হলে ড্রাইভারকে ডেকে তাদের স্কুলে নিয়ে যেতে বললাম। এ সময় আমাকে কেউ কোনো বাধা দেয়নি।

জিয়া আমাকে বললেন, তুমি কি একা এসেছো? আমি উত্তরে বললাম, হ্যাঁ। যদিও তিনি বেশ শান্ত ও ধীরস্থির ছিলেন, তবু তাঁর বাড়িতে আমার তৎপরতা দেখে তিনি বিস্মিত হন। এরপর আমি বাইরে চলে আসি। এ সময় জিয়াকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত মনে হয়েছিল।

ঘরের বাইরে এসে দেখি ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সেখানে এসে উপস্থিত। সম্ভবত ক্যাপ্টেন তাজ আমাকে সেনাপ্রধানের বাড়িতে অনায়াসে প্রবেশ করতে দেখেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে অবহিত করেন। তিনি প্রথমে আমার পায়ের ক্ষত এবং অসুস্থতার খোঁজখবর নেন। তারপর বলেন, চেইন অফ কমান্ড ঠিক করার জন্য এই অভ্যুত্থান জরুরি ছিল। আকাশে তখন মিগ ও হেলিকপ্টার উড়ছিল এবং সেদিকে তাকিয়ে খালেদ মোশাররফ আমাকে বললেন, চেইন অফ কমান্ড ঠিক না করলে দেশ ও সেনাবাহিনী শেষ হয়ে যাবে, তাই এ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছি। আমি তখন উল্টো প্রশ্ন করলাম, চেইন অফ কমান্ড ভেঙে সেনাপ্রধানকে বন্দি করে কি চেইন অফ কমান্ড ঠিক করা যায়? তিনি উত্তরে কিছুই বললেন না।

আমরা দুজনেই সেনাসদরে পিএসও (প্রধান উপদেষ্টা)—তিনি সিজিএস আর আমি এজি। খালেদ মোশাররফ আমার এক র‍্যাংক সিনিয়র হলেও অ্যাপয়েন্টমেন্টের (পিএসও) দিক থেকে দুজনেই একই পর্যায়ের। জেসিও এবং অন্য সৈনিকগণ সেনাপ্রধান জিয়ার বাড়ির ভিতরে আমার কার্যকলাপে কোনো বাধা না দেওয়ায় তিনি চিন্তিত ছিলেন, যদিও তাদের ওপর নির্দেশ ছিল কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে অথবা বাড়ি থেকে বাইরে যেতে না দেবার। কিন্তু তারা নির্বিবাদে আমার আদেশ পালন করেছে। এতে একটি বিষয় আমার কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সেনাপ্রধানের বাড়িতে নিয়োজিত এসব সৈনিক মনেপ্রাণে সেনাপ্রধানকে বন্দি করার পক্ষে ছিল না।

আমি সেনাপ্রধানের বাড়ি থেকে ধীরে ধীরে হেঁটে আমার নিজের বাড়িতে ফিরে আসি। এসে দেখি আমার বাড়ির সামরিক ও বেসামরিক টেলিফোন দুটোরই সংযোগ বিচ্ছিন্ন। এ হাঁটাচলায় আমার পায়ের ক্ষতে ব্যথা হচ্ছিল। একজন প্রহরীকে পাঠিয়ে গাড়ি আনি। প্রহরীরা আমাকে জানায়, তারা খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে যে, অভ্যুত্থানকারীরা আমার বাড়ির সন্নিকটে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সমবেত হয়েছেন। আমি নাশতা সেরে ওইদিকে রওনা দিলাম। প্রহরীদের সতর্ক থাকতে বললাম। আমার টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় প্রহরীরা উত্তেজিত ছিল। তাদের আমি সান্ত্বনা দিই। আমার ভয় ছিল তারা যে কোনো সময়ে যে কোনো অঘটন ঘটাতে পারে। কারণ তারাও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত ছিল।

৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলে অভ্যুত্থানকারীদের তৎপরতা

আমি সেখানে গিয়ে দেখি, ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সেনাসদরের ও ৪৬ ব্রিগেডের বেশ কয়েকজন অফিসার বাইরে দাঁড়িয়ে জটলা পাকাচ্ছে। তারা আলোচনায় রত। আমি পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে লে. কর্নেল মালেক (পরে ঢাকার মেয়র এবং জাতীয় পার্টি হয়ে বর্তমানে আওয়ামী লীগার) আমার কাছে এসে বললেন, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ তাঁকে বলেছেন আমাকে জানানোর জন্য যে, আজ ভোরে সেনাপ্রধান জিয়ার সঙ্গে আমার যা যা আলাপ হয়েছে তা যেন কাউকে না বলি। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলি, তিনি যেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে অবহিত করেন, আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের কোনো আদেশ বা উপদেশ নিতে প্রস্তুত নই। তাঁকে আরো বললাম, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এখনও সেনাপ্রধান নন। আর যদি হয়েও থাকেন তাও আমার জানা নেই। এর একটু পরেই আমি ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসে অনাহুতের মতো প্রবেশ করি। সেখানে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, কর্নেল শাফায়াত, মেজর হাফিজ, মেজর গাফ্ফার ও অন্যান্য অফিসার যাঁরা এ অভ্যুত্থানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের বিভিন্ন আলাপচারিতায় দেখি। আমি একটি চেয়ার নিয়ে নিজেও বসে পড়ি। তখন সেখানে নানাবিধ আলোচনা চলছিল। বিভিন্ন স্থানে টেলিফোন করা হচ্ছে এবং সবাই উত্তেজিত।

কিছুক্ষণ পর বঙ্গভবন থেকে মেজর শরীফুল হক (ডালিম), মেজর নুর দুজন এসে উপস্থিত হলো। তাদের উপস্থিতি দেখে আমি অবাক হলাম। পরে বুঝতে পারলাম, তারা মেজর রশিদ-ফারুকের বার্তা নিয়ে এখানে এসেছে দুপক্ষের মধ্যে এ বিরোধের একটা সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য, যাতে করে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়ানো যায়। আলোচনায় বুঝতে পারলাম, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল শাফায়াত জামিল মেজর ফারুক, রশিদ ও তাদের সহযোগীদের বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ চায়। এ বার্তা নিয়ে মেজর নুর ও শরীফুল হক (ডালিম) বঙ্গভবনে রওয়ানা হয়। তাদের বলা হয়েছে, এই বার্তা রাষ্ট্রপতি মোশতাক, মেজর রশিদ ও ফারুককে দেওয়ার জন্য এবং এর উত্তর সত্বর যেন দেওয়া হয়। তারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। এরই মধ্যে জেনারেল ওসমানী বঙ্গভবন থেকে ফোন করে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি হুঁশিয়ার করে দেন যেন কেউ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়। কারণ এ পরিস্থিতিতে দেশে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ তাঁকে উত্তরে জানান, যদিও তিনি বর্তমানে

সেনাপ্রধান নন তবুও একটা মীমাংসার চেষ্টা করবেন। তিনি মেজর ফারুক-রশিদকে বুঝিয়ে আত্মসমর্পণ করানোর জন্য ওসমানীকে অনুরোধ করেন।

এর মধ্যে নানারকম হৈচৈ হচ্ছিল। যাহোক, শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হলো মেজর জেনারেল জিয়াকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করানো হবে এবং জেনারেল ওসমানী ও রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাককে জানানো হবে, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে যেন সত্বর সেনাপ্রধান করা হয়। কিন্তু সেনাপ্রধান জিয়ার কাছ থেকে ইস্তফাপত্র নেওয়ার জন্য কে সেখানে যাবেন তা নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছিল এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিলেন না। এসব দেখে আমার বেশ কৌতূহল হলো। কারণ এসব আলোচনায় অভ্যুত্থানকারীরা বেশ সময় নষ্ট করছেন। এ থেকে বোঝা যায়, এ অভ্যুত্থানের কোনো বিশেষ পরিকল্পনা তাদের ছিল না এবং নেতৃত্বের সমস্যা ছিল। তাদের উদ্দেশ্য তাদের কাছেই পরিষ্কার ছিল না।

জিয়ার ইস্তফা আদায়

শেষ পর্যন্ত ব্রিগেডিয়ার রউফ (যিনি ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ডিজিএফআই প্রধান ছিলেন এবং বর্তমানে প্রয়াত) ও লে. কর্নেল আনোয়ার (পরে মেজর জেনারেল ও প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে ডিজি, এনএসআই এবং রাষ্ট্রদূত অব.) এ দুজনকে তাঁদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিয়ার বাড়িতে পাঠানো হলো ইস্তফাপত্রে স্বাক্ষর আনার জন্য। তাঁরা সেনাপ্রধান জিয়ার বাড়িতে যান এবং ইস্তফাপত্রে স্বাক্ষর নিতে সক্ষম হন। এদিকে অনেক আলোচনার পর ঠিক করা হয়, মেজর রশিদ-ফারুকসহ অন্য যারা ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল তারা রাতের বেলায় একটি বিশেষ বিমানযোগে তৃতীয় দেশের উদ্দেশে ব্যাংককের পথে ঢাকা ত্যাগ করবে।

বেলা বাড়ছিল। আমি সেখান থেকে আর্মি হেডকোয়ার্টারে আমার অফিসে চলে যাই। গিয়ে দেখি, অফিসে বিশেষ কোনো অফিসার নেই, শুধু সৈনিক ও স্টাফরা আছেন। আমার অফিসের টেলিফোন সংযোগও বিচ্ছিন্ন। আমি এতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে পাশের কক্ষ থেকে কর্নেল শাফায়াতের সঙ্গে কথা বলি। তাঁকে রাগান্বিত স্বরে জিজ্ঞাসা করি, এসব করা কি ঠিক হচ্ছে? আমার টেলিফোন সংযোগ কেন বিচ্ছিন্ন করা হলো? উত্তরে তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে আমাকে জানান। তাঁর কথা আমি অবশ্য বিশ্বাস করেছি এজন্য যে, এসব ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নির্দেশেই করা হয়েছিল।

আর্মি হেডকোয়ার্টারে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে আলাপ-আলোচনায় বুঝতে পারলাম জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার, নন-কমিশন্ড অফিসার ও সৈনিকগণ সেনাপ্রধান জিয়াকে বন্দি করার ঘোর বিরোধী ও মনঃক্ষুণ্ন। এ অভ্যুত্থানে তাদের মোটেও সায় নেই। আমি দুপুরের দিকে বাড়িতে ফিরি। পথিমধ্যে কর্নেল শাফায়াতের সঙ্গে দেখা। আমি তাঁকে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেসা করলাম, এ অভ্যুত্থানে কি বিভিন্ন পদবির সৈনিকগণের সমর্থন আছে? উত্তরে তিনি হ্যাঁ-সূচক জবাব দেন। আমি আর কিছু না বলে বাড়িতে চলে গেলাম।

খালেদ মোশাররফ সেনাপ্রধান

এদিকে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ জেনারেল জিয়ার ইস্তফার কারণে নতুন সেনাপ্রধান হলেন। তিনি রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল হুদাকে (আগরতলা মামলার আসামি এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন) এবং কর্নেল নওয়াজীশের অধীন ১০ ইস্ট বেঙ্গল যা তাঁর অধীনে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে গঠিত হয়েছিল তাদের ঢাকায় নিয়ে আসেন। কর্নেল হুদাকে ঢাকায় আনা হয়েছিল সম্ভবত আমার স্থলাভিষিক্ত করার জন্য। কারণ আমি এসব অনাকাঙ্ক্ষিত উচ্ছৃঙ্খল ঘটনার বিরোধিতা করে আসছি। তাই খালেদ মোশাররফ আমার কার্যকলাপে বেশ অস্বস্তিতে ছিলেন।

এদিকে ৪ তারিখ সকালবেলায় খবরে জানা যায়, ৩ তারিখ রাতেই জেলে আটককৃত সর্বজনাব নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান—এ চার নেতাকে রাষ্ট্রপতি মোশতাক, মেজর রশিদ ও ফারুকের আদেশে জেলের ভিতরেই নৃশংসভাবে ১ম বেঙ্গল ল্যান্সারের ট্যাংক রেজিমেন্টের কজন সৈনিক হত্যা করে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, জেলখানায় সংঘটিত এ হত্যাকাণ্ডের খবর ৩০ ঘণ্টা পর বাইরের লোকজনের কাছে প্রকাশ পায়। রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক ও ফারুক-রশিদরা যখন ৩ তারিখের অভ্যুত্থানের খবর পায় এবং তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দেয় তখনই এদের ধারণা জন্মে যে, এ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেলে আটককৃত চার নেতাকে বের করে এনে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাককে সরিয়ে নতুন সরকার গঠনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জেলখানায় ওই জঘন্য নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা আরো অনিশ্চিত হয়ে পড়ে ও শৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি ঘটে।

নতুন সেনাপ্রধান হওয়ার পর মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ ৫ তারিখে আর্মি হেডকোয়ার্টারে আর্মির সিনিয়র অফিসারদের একটি সভা আহ্বান করেন। সভায় তেমন কোনো আলোচনা হয়নি। মূলত কোনো সমস্যারই তিনি সঠিক সমাধান করতে পারছিলেন না। বলা যায়, তিনি সমস্যার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। তাই আমার মনে হতে লাগলো, তাঁর এ সেনাপ্রধানের চাকুরি বোধহয় খুবই ক্ষণস্থায়ী হবে। এর মধ্যে শহরে এবং সেনানিবাসে জোর গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, খালেদ মোশাররফ আওয়ামী লীগ ও ভারতের ইঙ্গিতে ও পরোক্ষ সহায়তায় ৩ তারিখের এ অভ্যুত্থান সংঘটিত করেছেন। অর্থাৎ অভ্যুত্থানটি ভারতপন্থী। এর একটি সম্ভাব্য কারণ, আওয়ামী লীগ ৪ তারিখে এই অভ্যুত্থানের পক্ষে ঢাকায় একটি মিছিল বের করে যেখানে অন্যদের মধ্যে সেনাপ্রধান খালেদ মোশাররফের মাও অংশ নেন। এ ছাড়া মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ সম্পর্কে সেনানিবাসে রটনা ছিল যে, তিনি ভারতঘেঁষা।

এটা উল্লেখ করতে হয় যে, আমার জানামতে, এ অভ্যুত্থানে ভারতের কোনো ভূমিকা ছিল না। অভ্যুত্থানকারী অফিসারগণ মোটেই ভারতপন্থী ছিলেন না এবং এই অভ্যুত্থান নিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গেও তাঁদের কোনো বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। আমি ব্যক্তিগতভাবে অভ্যুত্থানকারী সিনিয়র অফিসারদের চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম। এটা নিছক কাকতালীয় এবং সম্পূর্ণভাবে আর্মির অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার ব্যাপার ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সেনাবাহিনীতে ও দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে ধারণা জন্মে যে, এটা ছিল আওয়ামী লীগ ও ভারতের পক্ষে অভ্যুত্থান। আর এটাই পরে তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

বিচারপতি সায়েম নতুন রাষ্ট্রপতি

এদিকে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় চার নেতাকে জেলখানায় বন্দি অবস্থায় হত্যার পর ইচ্ছাকৃতভাবে রাষ্ট্রপতি মোশতাক এ ঘটনা চেপে রাখেন যতক্ষণ মেজর ফারুক-রশিদ ও তাদের সহযোগীরা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশত্যাগ না করেন। ফলে যখন এ ঘটনা প্রকাশ পায়, তখন জনগণ ও আর্মি এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য রাষ্ট্রপতি মোশতাক ও মেজর ফারুক-রশিদকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করে। তাই এ ঘটনার পর খন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্রপতি হিসেবে বহাল থাকার প্রশ্নই ওঠে না। ফলে অভ্যুত্থানকারী অফিসারগণ প্রধান

বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁদের অনুরোধের প্রেক্ষাপটে তিনি ৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। সে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর একজন সিনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে আমিও আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলাম।

আমার মনে হচ্ছিল, সবকিছুই কেমন যেন 'এডহক' ভিত্তিতে হচ্ছিল। সবকিছুই ঘোলাটে মনে হচ্ছিল। তখন পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে খালেদ মোশাররফের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়নি। তিনি বঙ্গভবন আর সেনাসদরের মধ্যেই দেন-দরবারে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি রেডিও-টিভিতে জাতির উদ্দেশে বা সেনাবাহিনীর উদ্দেশে কোনো বক্তব্য প্রচার করেননি। অথচ অভ্যুত্থানের ৭২ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে। ফলে অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য এবং অভ্যুত্থানকারীদের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কারোই পরিষ্কার ধারণা ছিল না। বিশেষ করে ভারতপন্থী বলে অভ্যুত্থান বিষয়ে যে গুজব ছড়িয়েছিল তার সঠিক কোনো প্রত্যুত্তর তার বা তাদের পক্ষ থেকে ছিল না। আর এই সুযোগে একের পর এক গুজব পুরো সেনানিবাসকে গ্রাস করে।

৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান

রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি সায়েমের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানশেষে আমি তাড়াতাড়ি আর্মি হেডকোয়ার্টারে চলে আসি। সেখানে এসে আমি আমার অধীনস্থ অফিসারদের সঙ্গে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করি। বস্তুতপক্ষে ৩ থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত দেশে কোনো সরকার ছিল না বললেই চলে। আর্মিতেও দৈনন্দিন কোনো কাজকর্ম চলছিল না। আর্মি হেডকোয়ার্টারে অচলাবস্থা বিরাজ করছিল। পুরো সেনানিবাসের পরিবেশ ছিল অস্বাভাবিক ও থমথমে। কেউ কোনো কাজকর্ম করছিল না। সবাই এখানে-সেখানে জটলা পাকিয়ে আলাপ-আলোচনা করেই সময় কাটায়। আলোচনা-শেষে অফিস থেকে সবাই চলে যাওয়ার পর আমার দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত সহকারী সুবেদার আলিমুদ্দিন আমাকে একটা বাংলা প্রচারপত্র দেখান। ওই প্রচারপত্র সেনানিবাসে প্রচুর পরিমাণে বিলি করা হয়েছে বলেও আমাকে জানান। প্রচারপত্রটি 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র নামে ছাপানো হয় এবং উত্তেজক ভাষায় বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করা হয়। উল্লেখযোগ্য দাবির মধ্যে ছিল, সেনাবাহিনীতে কোনো অফিসার থাকবে না। কেননা অফিসারগণ সৈনিকদের তাদের নিজ ক্ষমতালাভের প্রয়াসে ব্যবহার করে। এ ছাড়া অফিসারদের জন্য 'ব্যাটমেন'

প্রথা বন্ধ করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ প্রচারপত্রটি অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকরা বিলি করছে বলে আমাকে জানানো হয়।

জিয়ার মুক্তি

বিকেলে আমি বাসায় ফিরে আসি। শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তিবশত আমি আর বাড়ি থেকে বের হইনি। হঠাৎ মধ্যরাতের পর চারদিকে গোলাগুলির আওয়াজ শুনি। গোলাগুলি প্রথমে শুরু হয় বর্তমান এয়ারপোর্ট রোডের পাশে অবস্থিত অর্ডন্যান্স ডিপো থেকে, এরপর গ্যারিসন মসজিদের পাশে অবস্থিত সিগনাল ইউনিট থেকে। আমি উঠে ইউনিফর্ম পরি এবং বাইরে যেতে চাইলে আমার গার্ডরা আমাকে রাতের অন্ধকারে গোলাগুলির মধ্যে বাইরে যেতে নিষেধ করে এবং বাসাতেই থাকতে অনুরোধ করে। এর মধ্যে হঠাৎ করে আমার বাসার টেলিফোন বেজে ওঠে যা গত কয়েকদিন যাবৎ বিচ্ছিন্ন ছিল। সিগনাল সেন্টার থেকে ফোন করে আমাকে জানানো হয় যে, খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে পাল্টা অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়েছে। এরপর আমি বাড়ির বারান্দা থেকে দেখতে পেলাম কিছু কালো পোশাক, কিছু খাকি এবং বেসামরিক পোশাকে সজ্জিত শ'খানেকের মতো লোক ওপরের দিকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে জেনারেল জিয়ার বাড়িতে ঢুকছে। জিয়াকে তাঁর বাড়ির বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করে পাশেই দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি ইউনিটে নিয়ে যেতেও দেখলাম। জিয়া তখন সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরিহিত ছিলেন।

একটু পর আবার আমার টেলিফোন বেজে ওঠে। এবার চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিও লে. কর্নেল আমিনুল হক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার) আমাকে জানান, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে পাল্টা অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে। ৩ নভেম্বরের ক্যুর পর আমিনুল হককে চতুর্থ বেঙ্গলের অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে নিয়ে আর্মি হেডকোয়ার্টারে অ্যাটাচ করা হয়। এদিকে অভ্যুত্থানের গতি-প্রকৃতি ভালোভাবে বুঝতে পারছিলাম না। কোথায় কী ঘটছে তাও জানা সম্ভব না। ভোরবেলায় বাড়িতে তিন/চারজন লোক প্রবেশ করতে চেষ্টা করে। প্রহরীরা তাদের গেটে বাধা দেয়। তাঁরা বলেন, জিয়ার বাড়িসংলগ্ন দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি ইউনিটে আমাকে যাওয়ার জন্য জেনারেল জিয়া খবর পাঠিয়েছেন। এরপর বেসামরিক পোশাকে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট মুনীর (মরহুম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের জামাতা, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল) আমার বাসায় আসে। সে আমাকে বিস্তারিত

তথ্য জানায় এবং আমাকে বলে, জিয়া সত্বর দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি ইউনিটে যাওয়ার জন্য বলেছেন। সে আরো জানায়, ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলীকে নিয়ে আসার জন্য আর্মি ভিআইপি রুমেও লোক পাঠানো হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার শওকত যশোর থেকে ঢাকায় এসেছিলেন মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ সম্প্রতি যে সভা আহ্বান করেছিলেন তাতে অংশ নেওয়ার জন্য। পরে শুনেছি মীর শওকত যে ভিআইপি রুমে ছিলেন সেখানেও সৈনিকরা গুলি চালায়। তিনি সেখান থেকে বের হয়ে পাশেই তৎকালীন মেজর জেনারেল এরশাদের বাসায় আশ্রয় নেন। সেখান থেকে মেজর মহিউদ্দীন (মুজিবহত্যায় দণ্ডপ্রাপ্ত) তাঁকে নিয়ে আসে।

রেডিও স্টেশনে যাওয়ার জন্য তাহেরের অনুরোধ

আমি ইউনিফর্ম পরে লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটে হেঁটে দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি ইউনিটে পৌঁছি। দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি ছিল আমার ও জিয়ার বাসা থেকে শ'দুয়েক গজ দূরে, বর্তমান শহীদ সরণির পাশে। সেখানে গিয়ে দেখি হুলস্থূল অবস্থা। অফিসের ছোট একটি কামরায় জিয়া বসে ছিলেন। কর্নেল আমিনুল হক ও দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি ইউনিটের সুবেদার মেজর আনিস ও কয়েকজন অফিসার সেখানে ছিলেন। একটু পরে একটি বেসামরিক জিপে করে দুই/তিনজন লোকসহ অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল তাহের সেখানে এসে উপস্থিত হন। লে. কর্নেল তাহের মঞ্জুর ও জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে আগস্ট মাসে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে স্বাধীনতাযুদ্ধে জিয়ার অধীনে যোগদান করেন। পরে তিনি সেক্টর কমান্ডার হন এবং একপর্যায়ে যুদ্ধে আহত হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিছুদিন আর্মিতে ছিলেন এবং অবসর নেওয়ার পর ঐ সময় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সংস্থায় চাকরি করতেন। এসেই তিনি জিয়াকে রেডিও স্টেশনে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আমরা জিয়াকে রেডিও স্টেশনে যেতে বারণ করি। এ সময় লে. কর্নেল আমিনুল হক ও তাহেরের সঙ্গে ঝগড়া বেধে যায়। একপর্যায়ে আমিনুল হক তাহেরকে বলে বসেন, 'আপনারা (জাসদ)তো ভারতের বিটিম'। ফলে তাহের রাগান্বিত হয়ে সেখান থেকে চলে যান।

পরে রেডিওতে প্রচারের জন্য জিয়ার ছোট একটা বক্তৃতা টেপ করে পাঠানো হয়। তখনও সেখানে ইউনিফর্ম ছাড়া বেসামরিক পোশাকে কিছু অফিসার উপস্থিত ছিলেন। এঁদের অনেককেই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার লোকজন বাড়ি থেকে ধরে এখানে নিয়ে আসে। আমি মনে করি এরকম পরিস্থিতিতে

আর্মি অফিসারদের ইউনিফর্ম ছাড়া বেসামরিক পোশাকে থাকা ঠিক নয়। কেননা বাস্তবে দেখা গেছে সামরিক অভ্যুত্থান বা বিশৃঙ্খলার সময়ে হতাহত অফিসারদের অধিকাংশই বেসামরিক পোশাক পরিহিত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৫ আগস্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সময় শেখ মুজিবের সামরিক সচিব ড্রেসিং গাউন পরা অবস্থায় নিহত হন। (পৃষ্টা ৭৩, লেগ্যাসি অফ ব্লাড) তখন ঐ পোশাকেই তিনি গাড়ি চালিয়ে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। এ ছাড়া ৭ তারিখের সিপাহি অভ্যুত্থানে হতাহত আর্মি অফিসারগণের অধিকাংশই বেসামরিক পোশাকে ছিলেন। সংকটকালীন সময়ে সেনাবাহিনীর অফিসারদের বেসামরিক পোশাকে থাকার প্রবণতা দেখা যেত যা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

খালেদ মোশাররফ, হুদা ও হায়দারকে হত্যা

সকালেই খবর আসে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা এবং লে. কর্নেল হায়দারকে শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত ১০ বেঙ্গল রেজিমেন্টে হত্যা করা হয়েছে। লে. কর্নেল হায়দার (১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন) স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় খালেদ মোশাররফের অধীনে যুদ্ধ করেন। ৩ তারিখের অভ্যুত্থানের পর তিনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় চলে আসেন। মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হায়দার এবং কর্নেল হুদা প্রমুখ ৭ নভেম্বর বঙ্গভবনে ছিলেন এবং পাল্টা অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে শুনে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। পথিমধ্যে তাঁরা কোথাও ইউনিফর্ম বদল করে বেসামরিক পোশাকে শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে উপস্থিত হন। এই রেজিমেন্ট কর্নেল হুদার অধীনে রংপুরে ছিল এবং ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের পরপর খালেদ মোশাররফ এই ইউনিটটিকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তখন পর্যন্ত ঢাকা ব্রিগেডের কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিলের খবর পাওয়া যায়নি। পরে অবশ্য খবর আসে, কর্নেল জামিল বঙ্গভবনের দেয়াল টপকানোর সময় পায়ে ব্যথা পান এবং আহত অবস্থায় ঢাকার অদূরে আত্মগোপন করে আছেন। এ খবরের পর আমি তাঁর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করে নিরাপত্তার ব্যবস্থাদি দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে ঢাকায় এনে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করি। এর মধ্যে খবর আসে যে, শহরে আরো কয়েকজন আর্মি অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে।

অভ্যুত্থানকারীদের নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ

দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি থেকে বেরিয়ে জেনারেল জিয়া, আমি এবং ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আর্মি হেডকোয়ার্টারে যাই। আর্মি হেডকোয়ার্টারে আলাপ-আলোচনায় ঠিক করা হয়, অভ্যুত্থানকারীদের উদ্দেশে সেনাপ্রধান বক্তব্য রাখবেন। তবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সেনাপ্রধান বক্তব্য রাখার পূর্বে অভ্যুত্থানকারীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। এ পর্যায়ে সেনাপ্রধান এবং ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আমাকে বললেন, যেহেতু আমি অনেকদিন থেকে ঢাকায় আছি এবং ঢাকা ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলাম এবং বর্তমানে অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল সেহেতু এ দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হচ্ছে তাদের সংগঠিত করার কাজে। তাদের সংগঠিত করার ব্যাপারে আমার মধ্যে অনেক সংশয় ও অনিশ্চয়তা ছিল। কারণ তারা হয়তো অনেক দাবি উত্থাপন করবে এবং তাদের বুঝিয়ে শান্ত করা কষ্টকর হবে।

যাহোক, আমি দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি, আর্মি এমপি ইউনিট ও আর্মি হেডকোয়ার্টারের সুবেদার মেজরদের খবর দিলাম যে, অপরাহ্নে সেনা মিলনায়তনে (বর্তমান গ্যারিসন সিনেমাহল) আমি সৈনিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে বক্তব্য রাখবো। সে অনুযায়ী বিভিন্ন ইউনিটের জেসিও এবং এনসিওসহ তাদের প্রতিনিধিদের সেনা মিলনায়তনে উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করতে বলি। তবে তখন বেশির ভাগ অফিসার সিপাহিদের অভ্যুত্থানের কারণে আর্মি হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত ছিলেন না। পরে মিলিটারি পুলিশ ইউনিটের ক্যাপ্টেন মোসাদ্দেক (বর্তমানে আমেরিকায় বসবাসরত) যিনি একজন উদ্যোগী ও কর্তব্যপরায়ণ অফিসার, তাঁকে নিয়ে আমি সেনা মিলনায়তনে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি কিছু সৈন্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে মিলনায়তনে উপস্থিত হয়েছে। আমি তাদের অস্ত্র বাইরে রেখে আসতে নির্দেশ দিই। এই নির্দেশের মাধ্যমে আমি মূলত তাদের পরীক্ষা করছিলাম যে, তারা আমার কথা আদৌ শুনবে কি না। জিয়া আমাকে সেখানে পাঠিয়েছেন তাদের মানসিক অবস্থা যাচাই ও শান্ত করার জন্য, যাতে পরে তিনি এসে বক্তৃতা দিতে পারেন। যাহোক, তারা অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাইরে রেখে আসার পর আমি আমার বক্তব্য শুরু করি।

বিপ্লবীরা তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করে। আমি তাদের জানাই, আর্মি শৃঙ্খলা, নিয়মকানুন ইত্যাদি তড়িঘড়ি করে বদলানো সম্ভব নয়। আমি আরো বলি, উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য দেশ আজ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। যাহোক, আলোচনা শেষে আমি তাদের জানাই, কিছুক্ষণ পর সেনাপ্রধান জিয়া এসে তাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়, ৭ নভেম্বর সৈনিকদের সঙ্গে বেসামরিক প্রশাসনের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কিছু সরকারি কর্মচারীও যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। তারাও বেসামরিক প্রশাসনে তাদের ঊর্ধ্বতন অফিসারদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করছিল। ফলে কিছু কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক তাদের সঙ্গে সেনানিবাসের বাইরে চলেও গিয়েছিল। কিন্তু সেনানিবাসের পরিস্থিতি আয়ত্তে আসায় পরে বাইরে তারা আর তেমন কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা করার সাহস পায়নি। আজও ভাবলে গা শিউরে ওঠে যে, ঢাকা সেনানিবাসের সৈনিকদের যদি সেদিন নিয়ন্ত্রণে আনা না যেত তাহলে সারা দেশে সামরিক-বেসামরিক পর্যায়ে একটা 'নেতৃত্বহীন ভয়াবহ উচ্ছৃঙ্খল শ্রেণী-সংগ্রাম' শুরু হয়ে যেত। সৈনিকদের সেদিনের স্লোগানই ছিল 'সিপাহি সিপাহি ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই। সিপাহি জনতা ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই'।

যাহোক, আর্মি হেডকোয়ার্টারে আমি খবর পাঠানোর পর জেনারেল জিয়া এসে উপস্থিত হন। তখনও পরিস্থিতি কিছুটা অশান্ত ছিল। জিয়া তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে একপর্যায়ে তাঁর কোমরের আর্মি বেল্ট খুলে মাটিতে ছুড়ে দেন এবং বলেন, এতো দাবিদাওয়া ওঠালে আমি আর এ আর্মি চিফ থাকতে চাই না। পরে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। বক্তৃতাশেষে আমরা সবাই আর্মির হেডকোয়ার্টারে ফেরত যাই। এরপর ঠিক করা হয়, ঢাকার বাইরে থেকে কিছু পদাতিক সৈন্য এনে ঢাকা সেনানিবাসে উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদের আয়ত্তে আনা ও সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সে অনুযায়ী যশোর থেকে কিছু পদাতিক সৈন্য এনে বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তার কাজে মোতায়েন করা হয়।

৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে আর্টিলারি, ল্যান্সার, আর্মার, সিগনাল, অর্ডন্যান্স ও সাপ্লাই কোরের বেশিরভাগ সৈনিক জড়িত ছিল। ঢাকায় অবস্থিত পদাতিক বাহিনীর সৈন্যরা এ অভ্যুত্থানে তেমন সাড়া দেয়নি। আবার প্রতিরোধও করেনি। এর কারণ ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল জামিল ঢাকা ব্রিগেডের পদাতিক বাহিনীকে ব্যবহার করেন। কিন্তু সে অভ্যুত্থানে সৈনিকদের তেমন সমর্থন ছিল না। শুধু আদেশের কারণে বাধ্য হয়ে হয়তো তারা অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিল যা আমি আগেও বর্ণনা করেছি। এখানে আরেকটি কথা বলতে হয়, অভ্যুত্থানের পরপরই রেডিওতে জিয়ার একটি রেকর্ড করা ভাষণ প্রচার করা হয়। এ ছাড়া তিনি কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে সাহসের সঙ্গে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।

মীর শওকত ডিভিশন কমান্ডার

ঢাকা ও অন্যান্য সেনানিবাসে ৭ তারিখের সিপাহি বিদ্রোহের প্রভাব খুব ধীরে ধীরে প্রশমিত হতে থাকে। কিন্তু তখনও সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা অত্যন্ত নাজুক এবং অধিকাংশ অফিসার দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন পদবির সৈন্যগণ আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসে। এদিকে এ বিদ্রোহের সময় সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা, বিশেষ করে অফিসার হত্যাকাণ্ডের জন্য দোষী ব্যক্তিদের বিচার করার জন্য আমি অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে সেনাপ্রধানকে বলি। কিন্তু তিনি এতে উৎসাহী ছিলেন না। অপরদিকে তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী যশোর সেনানিবাসে ফেরত না গিয়ে ঢাকায় একটা ডিভিশন গঠন করে তাঁকে ডিভিশন কমান্ডার হিসেবে নিয়োগের জন্য সেনাপ্রধান জিয়াকে অনুরোধ করেন এবং চাপ দিতে থাকেন। আমি এর ঘোর বিরোধিতা করি এবং বলি যে, একটি করে ডিভিশন গঠন করা ঠিক হবে না। করলে সব স্থানেই একসঙ্গে ডিভিশন করা উচিত। যাহোক, শেষ পর্যন্ত ঢাকায় নবম ডিভিশন নাম দিয়ে একটা ডিভিশন করা হলো এবং ব্রিগেডিয়ার শওকতকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে ডিভিশন কমান্ডার করা হলো। তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর ১৯৭৩ সাল থেকে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁকে বদলি করে ঢাকায় এনে আর্মি হেডকোয়ার্টারে সিজিএস করা হলো। খালেদ মোশাররফের মৃত্যুর পর থেকে মঞ্জুর আসার আগ পর্যন্ত মীর শওকত অস্থায়ীভাবে সিজিএস-এর কাজ করেন।

লন্ডন দূতাবাস কাউন্সিলর

এদিকে আমার পায়ের গ্রাফটিংয়ের চামড়া শক্ত হয়ে খসে যাচ্ছিল। উরু থেকে এই চামড়া নিয়ে পায়ে লাগানো হয়। তা শক্ত হয়ে যাওয়ায় পায়ের পাতা নাড়ানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে একদিন আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে সেনাপ্রধান জিয়া আমাকে দেখতে বাড়িতে আসেন। আমি তাঁকে জানাই যে, আমার স্ত্রীর চাচা বিলাতের ম্যানচেস্টারে ডাক্তার। তিনি সত্বর আমাকে সেখানে যাওয়ার জন্য বলেছেন। আমি সেনাপ্রধানের কাছে তিন মাসের ছুটির জন্য বলি। তিনি তৎক্ষণাৎ কিছু বলেননি। পরদিন জানান, আমাকে লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনে কয়েক মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে কাউন্সিলর পদে পাঠাবেন যাতে সেখানে আমার পায়ের চিকিৎসা করাও সম্ভব হয়।

কয়েকদিন পর আমাকে সেনাবাহিনী থেকে প্রেষণে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা দপ্তরের কাউন্সিলর পদে লন্ডন দূতাবাসে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর আমি ও আমার স্ত্রী চার মাসের কন্যাসন্তানকে নিয়ে লন্ডনের পথে ঢাকা ত্যাগ করি।

লন্ডন পৌঁছে প্রথম দুদিন আমি ব্যক্তিগত কাজকর্ম ও পারিবারিক ঝামেলা মেটাতে ব্যস্ত ছিলাম। এরপর বাংলাদেশ দূতাবাসে উপস্থিত হই। সরকার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সেখানেও তখন অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছিল। তখন লন্ডনে হাইকমিশনার ছিলেন ময়মনসিংহের আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ আবদুস সুলতান। প্রেস কাউন্সিলর ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতারের চরমপত্র খ্যাত এম আর আখতার মুকুল এবং জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দার পদে পুলিশবাহিনীর কাউন্সিলর নুরুল মোমেন (মিহির)। এঁরা সবাই আওয়ামী লীগপন্থী ছিলেন বলে সবার প্রবল ধারণা ছিল। নুরুল মোমেনের বিরুদ্ধে ব্রিটেনে বসবাসরত বাঙালিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের প্রচুর অভিযোগ ছিল। অনর্থক অনেক বাঙালির নাগরিকত্ব হরণ ও কালো তালিকাভুক্তিকরণের ব্যাপারেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। তাই শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর একদল ক্ষুব্ধ বাঙালি দূতাবাসে তাঁর ওপর হামলা করে এবং আসবাবপত্র ভাংচুর করে। এদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে নুরুল মোমেন (মিহির) আহত হন। ক্ষুব্ধ বাঙালিদের সেদিনের ওইসব কার্যকলাপ ব্রিটিশ টেলিভিশনেও প্রচার করা হয়েছিল।

মোশতাক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর লন্ডনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের হাইকমিশনার, প্রেস কাউন্সিলর ও কাউন্সিলর নুরুল মোমেনকে দেশে বদলি করা হয়। তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের ধারণা ছিল, এঁরা হয়তো রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে বিদেশেই থেকে যাবেন, দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন না। হাইকমিশনার সৈয়দ সুলতানের সঙ্গে আমার পরিচয় মুক্তিযুদ্ধের সময় ময়মনসিংহে। তিনি আমাকে দেখে খুশিই হলেন। আমি তাঁকে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করি। পরবর্তী সময়ে তিনি ঠিকই দেশে ফিরে যান। নুরুল মোমেন ও এম আর আখতার মুকুলকেও দেশে চলে যেতে বলি এবং তাঁদের আশ্বাস দিই যে, সরকার দেশে তাঁদের চাকরিতে বহাল রাখবেন। কিছুদিন পর উভয়েই দেশে ফিরে যান এবং তৎকালীন সরকার তাঁদের চাকরিতে বহাল রেখেছিলেন। মূলত তাঁদের ব্যাপারে জিয়ার সঙ্গে আমার বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমি তাঁদের রাষ্ট্রীয়ভাবে হয়রানি বা নাজেহাল না করার জন্য জিয়াকে অনুরোধ করি। জিয়া আমাকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করলে আমি তাঁদের দেশে যেতে উৎসাহিত করি।

সৈয়দ আবদুস সুলতানের পর হাইকমিশনার নিযুক্ত হন প্যারিসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবুল ফাতাহ। তিনি পাকিস্তান পররাষ্ট্র সার্ভিসের অফিসার ছিলেন। অনেকে ধারণা করতেন তিনি খন্দকার মোশতাকের প্রিয়ভাজনদের একজন। স্বাধীনতার সময় তিনি ইরাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। পরে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন। আমার কাছে তাঁকে দূতাবাসের কাজকর্মে তেমন উৎসাহী মনে হতো না। সচরাচর রুটিন কাজ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তিনি মনোযোগ দিতেন না। পরে তাঁকে আলজেরিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে বদলি করা হয়। তাঁর ধারণা ছিল, ওই বদলি আমার বিরূপ প্রতিবেদনের জন্য হয়েছিল। তাঁর ধারণা আংশিক সত্য ছিল।

জাতীয় নিরাপত্তার পরিবর্তে ক্ষমতাসীনদলের স্বার্থরক্ষা

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দার প্রতিনিধি হিসেবে ইউরোপের জার্মানি, সুইডেন, বেলজিয়ামসহ অন্যান্য দেশের দায়িত্ব অর্পিত ছিল আমার ওপর। আমার আসল ও প্রধান কর্তব্য ছিল জাতীয় স্বার্থ-সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহ এবং সরকারকে তা অবহিত করা। তা ছাড়া লন্ডন মিশনে তখন প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিনিধি না থাকায় আমাকেই তা দেখাশোনা করতে হতো। ফলে সামরিক ও বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রে আমার দায়িত্ব নির্ধারিত ছিল। বাংলাদেশে তখন জাতীয় গোয়েন্দা নিরাপত্তা প্রধান ছিলেন এ বি এস সাফদার এবং জনাব হুদা নামে পুলিশের এক কর্মকর্তা ছিলেন বহির্বিষয়ক পরিচালক।

লন্ডনে আমার চাকরির অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। বরং আমার ধারণা হয়েছিল, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা জাতীয় স্বার্থরক্ষা করার চেয়ে ক্ষমতাসীন সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। লন্ডনে ওই পদে থাকাকালীম আমি কোনো বিশেষ গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়া বা নিজ দায়িত্বের কাজে গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে অনেক সময়ই ভিন্নরকম নির্দেশ পেয়েছি। বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর নজর রাখা, আওয়ামী লীগপন্থী, বিরুদ্ধবাদী ইত্যাদির ব্যাপারে উচ্চমহল ও যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণের জন্য দেশ থেকে নির্দেশ দেওয়া হতো। ফলে আমার মনে হয়েছে, জাতীয় স্বার্থরক্ষাকারী এ সংস্থাটি তার নিজস্ব রূপ হারিয়ে ক্ষমতাসীন দলের একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু ক্ষমতাসীন দলের সার্বিক স্বার্থরক্ষামূলক ভূমিকার কারণে ক্ষমতাসীনদের পছন্দের লোকদেরই এ ধরনের পদে নিয়োগ করারও প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। বস্তুতপক্ষে এর ফলে জনগণের টাকার অপব্যবহার করা হয়েছে এবং দেশের স্বার্থ ব্যাহত হয়েছে।

পৃথিবীর উন্নত দেশে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ হিসেবে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এসব সংস্থার কার্যকলাপের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সেসব দেশে আইন রয়েছে এবং তা জাতীয় সংসদে সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

ম্যাসকারেনহাস সোনালী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করেননি

লন্ডনে থাকাকালীন আমার সঙ্গে বাংলাদেশবিষয়ক দুজন প্রথিতযশা বিদেশী সাংবাদিকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। এদের একজন লরেন্স লিপশুলজ এবং অন্যজন অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস। লরেন্স লিপশুজলের লেখা 'বাংলাদেশ দি আনফিনিশড রেজুলিউশন' অনেকেই পড়ে থাকবেন। আমার মনে হয়, ওই বইতে অনেক তথ্য ভুল আছে এবং তাঁর মতামতের সঙ্গে আমি একমত নই। এ সম্বন্ধে লন্ডনে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে আমার বিস্তারিত আলাপ হয়েছিল। এমনকি তাঁর ওই বইয়ের ওপর আমাকে মতামত দেওয়ার জন্যও তিনি অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আমি একজন সরকারি কর্মকর্তা, তাই কোনো মতামত দিতে অপারগতা জানাই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং অন্যান্য ঘটনার প্রতি লিপশুলজের উৎসাহ থাকায় তাঁকে আমার ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগত। তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণায় আমার মনে হতো তিনি মার্কসবাদী। অবশ্য তাঁর মা-বাবা অনেক ধনী ছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে লন্ডনে আমার পরিচয় হয়, যখন তাঁরা আমেরিকা থেকে সেখানে বেড়াতে আসেন। ঠাট্টাচ্ছলে আমি লিপশুলজকে প্রায়ই বলতাম, আমার মা-বাবা ধনী হলে আমিও তোমার মতো মার্কসবাদী হতাম।

অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস বাংলাদেশে সমধিক পরিচিত। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর লেখা রেপ অফ বাংলাদেশ বইটি এবং '৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকার জন্য তাঁর এই ব্যাপক পরিচিতি। ১৯৭১ সালে তিনি পাকিস্তানের করাচিতে একটি পত্রিকায় কাজ করতেন। এপ্রিল মাসে পালিয়ে লন্ডনে এসে সানডে টাইমস পত্রিকায় বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংস, বর্বর হত্যাযজ্ঞের বিবরণী লিখে বিশ্ব-জনমতকে সজাগ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তিনি বাংলাদেশ এবং উপমহাদেশ সম্বন্ধে সানডে টাইমসে লিখতেন।

আমি লন্ডনে যাওয়ার পর বছরখানেকের মধ্যে লন্ডনস্থ সোনালী ব্যাংক ইউনিয়ন ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে। এর তদন্তের ভার দেওয়া

হয় আমাকে। তদন্তের একপর্যায়ে সোনালী ব্যাংক ও ম্যাসকারেনহাসের কিছু তথ্য আমার নজরে আসে। ম্যাসকারেনহাস সোনালী ব্যাংক থেকে প্রায় ২০ হাজার পাউন্ড ঋণ নিয়েছিলেন। পরে তা সুদসহ ২৪ হাজার পাউন্ডে দাঁড়ায়। সেদিনের হিসেবে এই টাকার অঙ্ক বেশ বড়। ঋণ দেয়া হয়েছিল বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের নির্দেশে। তাঁকে ওই ঋণ পরিশোধের কথা বলা হলে তিনি তা ফেরত দিতে পরোক্ষভাবে অস্বীকৃতি জানান এবং তাঁকে তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ উপরমহলের নির্দেশে ওই অর্থ দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এসব বিষয় জানার পর এবং অন্যান্য আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণের পর তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা অনেকটা বদলে যায়।

এ পর্যায়ে আমি সরকারকে অবহিত করি, তাঁকে যেন বাংলাদেশে তেমন গুরুত্ব দেয়া না হয়। পরে তাঁকে আর ঢাকাতে ততো গুরুত্ব কিংবা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি, যা বিদেশী সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে সচরাচর দেওয়া হলো দেশে এলে। ম্যাসকারেনহাস সে সময় বাংলাদেশ থেকে ঘুরে গিয়ে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে কর্নেল ফারুকের একটি সাক্ষাৎকার ছাপান। ওই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল তদানীন্তন জিয়া সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করা। আমি দূতাবাসের প্রেস কাউন্সিলর মাহবুবুল আলমের মাধ্যমে (বর্তমানে ঢাকায় ইনডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার সম্পাদক) সানডে টাইমস পত্রিকার সম্পাদককে স্বাধীনতার পরপর ম্যাসকারেনহাস বাংলাদেশ থেকে যে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে পরোক্ষভাবে অবহিত করি। এসব জানার পর সানডে টাইমস পত্রিকার প্রধান সম্পাদক তাঁকে আর বাংলাদেশ-সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে ওই পত্রিকায় লিখতে দেননি।

ইতিমধ্যে একদিন ম্যাসকারেনহাস প্রেস কাউন্সিলর মাহবুবুল আলমকে টেলিফোনে খুব রাগান্বিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তাঁর ভাষা ছিল 'হোয়াই মইন ইজ ট্রাইং টু ওয়্যারি মি?' এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, পরবর্তী সময়ে ১৯৮৬ সালে তৎকালীন এরশাদ সরকারের পরোক্ষ মদদে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ম্যাসকারেনহাস লেগ্যাসি অফ ব্লাড নামে আর একটি পুস্তক রচনা করেন। বইটি ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে তাঁর লেখার উদ্দেশ্য ও প্রেরণা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

শেখ মুজিবের ছবিসম্বলিত টাকা পোড়ানো হয়

১৯৭৬ সালের প্রথম দিকের একটা ঘটনার কথা এখানে বলতে হয়। ঢাকা থেকে নির্দেশ যায়, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে দুজন প্রতিনিধি যাবেন বিশেষ

কাজে, তাঁদের সহায়তা করতে হবে। ওই সময় লন্ডনের অদূরে মুদ্রা ছাপানোর কোম্পানি ব্রেডবারিতে ছাপানো শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি অঙ্কিত বিভিন্ন মানের নোটে কোটি কোটি টাকা জমা ছিল। ওই অর্থ পুড়িয়ে ফেলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই দুজন কর্মকর্তাকে লন্ডন পাঠানো হয়। তাঁরা গিয়ে যথারীতি কাজ শেষ করেন। দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে টাকা ছাপানো ও পোড়ানোর যাবতীয় খরচ বাংলাদেশ সরকারকেই বহন করতে হয়েছিল।

লন্ডনে ভাসানীর চিকিৎসা

'৭৬ এর খুব সম্ভব মাঝামাঝিতে ঢাকা থেকে খবর আসে মওলানা ভাসানী অসুস্থ এবং চিকিৎসার জন্য তাকে লন্ডনে পাঠানো হবে। তাকে দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে। সরকারি খরচে লন্ডনে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য বলা হলো। কয়েকদিন পর ছেলে নাসের ভাসানী ও পার্টির নেতা আবদুস সাত্তারকে নিয়ে ভাসানী লন্ডনে আসেন। তাকে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। আমি প্রায়ই তাকে দেখতে ক্লিনিকে যেতাম। তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হতো। দেশভাগের আগে তিনি যখন আসামে রাজনীতি করতেন তখন থেকেই সিলেটের আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনকে তিনি চিনতেন। ফলে তার সঙ্গে আমার বেশ হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, বিলেতের কলকারখানা, বিল্ডিং-ইমারত এসব আমাদের দেশের সম্পদ লুট করেই করা। তাই এগুলোর ওপর আমাদের হক আছে। লন্ডনে অবৈধ বাঙালিদের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলতেন, বাঙালিদের অধিকার আছে এই দেশে থাকার এবং কাজ করার। বৈধ অবৈধ আবার কি ?

মওলানা ভাসানিকে আমি এর আগে কখনো সামনাসামনি দেখিনি। আমার মনে হয়েছে তিনি একজন ইন্টারেস্টিং পলিটিক্যাল পার্সনালিটি। আগে কখনও না দেখলেও ১৯৬৯ সালে আমি তার সম্পর্কে একটি গল্প শুনেছি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক এবং জিওসি মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা আমাকে ঐ গল্পটি বলেন। আমি তখন তার এডিসি। তবে যেহেতু মিলিটারি একাডেমিতে তার ছাত্র ছিলাম তাই আমাদের মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিক ও খোলামেলা সম্পর্ক ছিল।

ঘটনাটি এরকম। ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভাসানীকে বিষয়টি জানানো হলো। কিন্তু তিনি ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। পরে সেনাবাহিনীর লোকজন গিয়ে টাঙ্গাইলের সন্তোষ

থেকে তার কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে ঢাকায় নিয়ে আসে। রাতে তৎকালীন ১৪ ডিভিশনের অফিসার্স মেসে (বর্তমানে আর্মি হেডকোয়ার্টার অফিসার্স মেস) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। বৈঠকে ইয়াহিয়া খান মওলানা ভাসানীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মওলানা সাব, মাশরেকি (পূর্ব) পাকিস্তান মে হামকো কেয়া কেয়া এডমিনিস্ট্রেটিভ কাম করনা চাহিয়ে, জ্যেইসে ইহাকা লোক খোশ হো।' ভাসানী উর্দুতে বললেন, 'ইয়ে আপকো পাতা হোনা চাহিয়ে। কিউকে এডমিনিস্ট্রেশন আপকা কাম হে।' ইয়াহিয়া খান হেসে প্রশ্ন করলেন, 'তো আপকা কাম স্রেফ এজিটেশন হ্যায়?' ভাসানী মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হামারা কাম এজিটেশন হ্যায়।'

এখানে বলতে হয়, এ ধরনের মিটিংয়ের আগে জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাধারণত মদ্যপান করতেন এবং এর প্রভাব তার কথাবার্তায় থাকত। আমার মনে হয়েছে, মওলানা ভাসানীর প্রতি উচ্চপদস্থ পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদের কিছুটা সহানুভূতি ছিল। খুব সম্ভবত তার ভারতবিরোধী এবং চীনপন্থী প্রীতির কারণে তাকে তারা কিছুটা পছন্দ করত।

কর্নেল তাহেরের ফাঁসি ও প্রতিক্রিয়া

লন্ডনে থাকাকালীন আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে কর্নেল তাহেরের ফাঁসির প্রতিক্রিয়া। জিয়া যখন মিলিটারি ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে তাহেরের ফাঁসির আদেশ জারি করেন, লন্ডনে এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে এক বাঙালি মহিলা (তাঁর পরিচয় এখন মনে নেই) দূতাবাসের সামনে অনশন শুরু করেন। খবরের কাগজে তাঁর ছবি ছাপা হয়। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তাহেরের ফাঁসি কার্যকর হয়। উল্লেখ্য, সামরিক বাহিনীতে উসকানি ও নাশকতামূলক কাজের জন্য ৭ নভেম্বর ১৯৭৫-এর পর তাহের, জলিল, রবসহ জাসদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের আটক করা হয়েছিল। মিলিটারি ট্রাইব্যুনালে বিচার করে তাহেরকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য স্থানীয় পত্রিকায় সরকারের সমালোচনা করা হয়।

ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে আলোচনা

লন্ডন থাকাকালীন অন্য একটি ঘটনাও উল্লেখ করতে চাই। বাংলাদেশের সাবেক আইন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন শেখ মুজিব হত্যার পর থেকে

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। আমি বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর মুফলেহ্ ওসমানীর (পরে রাষ্ট্রদূত ও পররাষ্ট্র সচিব) মাধ্যমে অনুরোধ জানাই যে, তাঁর সঙ্গে আমি বাংলাদেশের সেই সময়কার পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করতে চাই। তিনি প্রথমে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনীহা প্রকাশ করেন। পরে আমার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পর এবং বিশেষ করে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা সে হিসেবে দেখা করতে অনুরোধ জানানোর পর তিনি রাজি হন। আমি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট্ট একটি কক্ষে দূতাবাসের কাউন্সিলর ওসমানীকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

আলাপের শুরুতেই তিনি জানতে চান, রাষ্ট্রপতি মুজিব হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কেন তৎকালীন সরকার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন না? একজন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এ ব্যাপারে তিনি আমার অভিমতও জানতে চান। আমি তাঁকে বলি, রাষ্ট্রপতি মুজিব ও তাঁর পরিবার এবং আওয়ামী লীগের অন্য শীর্ষস্থানীয় নেতাদের হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া উচিত। আমি আরো বলি যে, সব রকমের হত্যাকাণ্ডের আমি বিরোধী। আমি সিরাজ শিকদার হত্যারও বিচার হওয়া উচিত বলে মত ব্যক্ত করি। তিনি উত্তরে আমার অভিমতের সপক্ষে সায় দেন। একপর্যায়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, বর্তমান সরকার যদি তাঁকে মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানায় তবে তিনি তাতে যোগ দেবেন কি না। আমার প্রশ্নের উত্তর তিনি এড়িয়ে যান। আমার মনে হয়েছিল ওই সরকারের মন্ত্রিপরিষদে যোগ দিতে তিনি উৎসাহী ছিলেন না।

লন্ডনে থাকাকালীন আমার সঙ্গে ভারতের নির্বাসিত নাগা বিদ্রোহী নেতা ড. ফিজুর সঙ্গে পরিচয় হয় (বর্তমানে তিনি প্রয়াত)। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা মাধ্যমে ভারতে নাগাল্যান্ডের সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে অবগত হই। নাগা নেতা ড. ফিজু যদিও দেখতে ছোটখাটো, হালকা-পাতলা গড়নের লোক এবং স্বল্পভাষী ছিলেন, তবু আমার মনে হয়েছিল তিনি অত্যন্ত তেজস্বী, বুদ্ধিমান ও আত্মনিবেদিত প্রকৃতির লোক ছিলেন।

ঢাকা থেকে খবর পাই কমনওয়েলথ সরকারপ্রধানদের সভায় যোগদানের জন্য জিয়া লন্ডনে যাচ্ছেন। জিয়ার যাওয়ার কয়েকদিন পূর্বে বেসরকারিভাবে মওদুদ আহমেদ ও জাকারিয়া খান চৌধুরী লন্ডনে গিয়ে হাজির হন। আমার স্থলাভিষিক্ত অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল নুরুল ইসলাম এঁদের পাঠিয়েছেন লন্ডনে জিয়ার জন্য রাজনৈতিক প্লাটফর্ম ও অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার জন্য। এজন্য দূতাবাসকে সবরকম সাহায্য করতে বলা হয়।

লন্ডন-প্রবাসীদের ভূমিকা

বিদেশে বসবাসকারী আমাদের নাগরিকদের জাতীয় রাজনীতিতে উৎসাহিত ও সম্পৃক্ত করার প্রবণতা প্রতিটি দলেরই রয়েছে। লন্ডনের ক্ষেত্রে এটা আরো বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাঙালির বসবাস। ফলে প্রতিটি দলেরই প্রবণতা থাকে এখানে স্বীয় রাজনৈতিক দলের আধিপত্য বিস্তারের। প্রতিযোগিতা চলে ক্ষমতার, লড়াই চলে পেশির। আমি মনে করি, এ ধরনের প্রবণতা আমাদের দেশ তথা বাঙালি জনগোষ্ঠীর স্বার্থের ওপর বিদেশে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এতে বিদেশে বসবাসকারী বাঙালিদের ঐক্যে ফাটল ধরে। ফলে বিদেশের মাটিতে সামগ্রিক স্বার্থ আদায়ের পরিবর্তে এরা নিজেদের দলীয় স্বার্থ আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে। মূলত কার্যক্ষেত্রে নিজেরা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও হানাহানি করে বিদেশীদের চোখে নিজেদেরই হেয় করে তোলে। অন্যভাবে দেখতে গেলে, বিদেশে বসবাসকারী বাঙালিরা স্থানীয় রাজনীতিতে কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা যে রাখে না তার পেছনে, আমার মতে, এটাও অন্যতম কারণ।

একজন মুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র সামরিক অফিসার ও সিলেটের লোক হিসেবে লন্ডনের প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে আমার একটা গ্রহণযোগ্যতা ছিল। আমার নিজের এলাকার অনেক লোক ইস্ট লন্ডন, বার্মিংহাম— এসব এলাকায় থাকতেন। দলমত নির্বিশেষে আমি সবার কাছেই যেতাম এবং তাঁরাও আমাকে বেশ শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন। জেনারেল জিয়ার আমলে আমি লন্ডনে থাকলেও তাঁরা কখনোই আমাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেননি।

কমিউনিটি লিডার তসাদ্দক আহমদ চৌধুরী যিনি হাইকমিশনে তেমন একটা আসতেন না, তিনিও আমি থাকাকালীন আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। এ ছাড়া মোহাম্মদ গাউস খান, যিনি শেখ মুজিবের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খানসহ সব নেতার সঙ্গেই আমার সুসম্পর্ক ছিল।

তখন লন্ডনে মূলত প্রখ্যাত সাংবাদিক গাফ্ফার চৌধুরীর সম্পাদনায় বাংলার ডাক এবং অলি আশরাফের সম্পাদনায় জনমত নামে দুটো পত্রিকা বের হতো। বাংলার ডাক ছিল আওয়ামী লীগপন্থী এবং ঘোর সরকারবিরোধী। সে সময় লন্ডনে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকারের পক্ষে জনমত গঠনের ধুয়ো তুলে একটি বিশেষ মহল সরকারি মদদে আরেকটি বাংলা পত্রিকা বের করার পাঁয়তারা শুরু করে। জিয়ার ক্ষমতাগ্রহণের পর যারা বিভিন্ন রকম

সুযোগ-সুবিধার আশায় তাঁর আশপাশে জড়ো হয় তারাই মূলত এর জন্য উঠেপড়ে লাগে।

ঢাকা থেকে এ ব্যাপারে আমার মতামত চাওয়া হয়। আমি ওই পত্রিকা প্রকাশের ঘোর বিরোধিতা করি। কারণ সরকারের মদদপুষ্ট পত্রপত্রিকা দিয়ে জনমত গঠন করা কখনোই সম্ভব হয় না। বিশেষ করে লন্ডনের মতো জায়গায় যেখানে লোকজন প্রতিনিয়ত বিভিন্ন মাধ্যমে দেশের সব ধরনের খোঁজখবর পায় এবং দেশের সঙ্গে প্রায় প্রতি সপ্তাহে তাদের যোগাযোগ হয় সেখানে এ ধরনের পদক্ষেপে হিতে বিপরীত হতে বাধ্য। এ ধরনের প্রকল্পে সরকারি অর্থের যথেষ্ট অপচয় হয়। বস্তুত এ ধরনের কাজ কিছু লোককে 'পাউন্ড কামানোর' সুযোগ করে দেয়। আমি এর ঘোর বিরোধী ছিলাম।

লন্ডন থেকে প্রেরিত বার্তায় আমি এও বলি যে, দেশের পরিস্থিতি যদি ভালো হয় তা হলে টাকা-পয়সা অপচয় করে লন্ডনে বাঙালি জনমত গঠনের প্রয়োজন হবে না। এমনিতেই জনমত তৈরি হবে। কারণ বাঙালিরা দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সবসময়ই খবর পায়। যাহোক, আমি যতোদিন লন্ডন দূতাবাসে ছিলাম ততোদিন এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবের মুখ দেখেনি।

লন্ডনে থাকার সময় আমি প্রবাসীদের সবসময় দেশের দলীয় রাজনীতি করতে গিয়ে প্রবাসে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না করতে উৎসাহিত করতাম। বরং তাদের স্থানীয় রাজনীতি ও কাউন্সিল ইত্যাদিতে নিজেদের স্থান করে নিতে উৎসাহিত করতাম। তবে আমার মনে হয়েছে সাধারণ প্রবাসীরা দেশের রাজনীতির প্রতি ততোটা উৎসাহী ছিল না। সুযোগসন্ধানী কিছু লোক সেখানে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের প্রয়াসে রাজনীতির খেলায় অবতীর্ণ হতো এবং নেতা, এমপি, মন্ত্রী ইত্যাদির সঙ্গে ওঠাবসা ও চলাফেরা করে লোকজনের কাছে নিজের ক্ষমতা জাহির করত। সেই সুবাদে, তারা মনে করত, দেশে এসেও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাবে।

ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান প্রসঙ্গ

তৎকালীন রক্ষীবাহিনীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান শেখ মুজিব হত্যার সময়ে দেশের বাইরে ছিলেন। কয়েকদিন পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। তখন রক্ষীবাহিনীকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণের প্রক্রিয়া চলছিল। ওই প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমি সরাসরি জড়িত ছিলাম, যা আগেই বলেছি। নভেম্বরের ৩ তারিখে খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানে যদিও ব্রিগেডিয়ার

নুরুজ্জামান সরাসরি জড়িত ছিলেন না তবে বিভিন্নভাবে পরে তাঁকে এক্ষেত্রে সক্রিয় দেখা যায়। ৭ তারিখের অভ্যুত্থানের পর তিনি দেশত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান। তবে তাঁর পরিবার তখন ঢাকায় ছিল। কিন্তু ঢাকায় এসে পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের কোনো সুযোগ তাঁর ছিল না।

১৯৭৬ সালে তৎকালীন সিজিএস জেনারেল মঞ্জুর তাঁকে ভারত থেকে ফেরত আনার উদ্যোগ নেন। পরে তিনি ভারত থেকে সরাসরি লন্ডনে আসেন। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লন্ডনে আমি তাঁর দেখাশোনা করি এবং তাঁকে আমেরিকা পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। তিনি সেখানে তার শ্যালক আমেরিকায় বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে অবস্থান করেন। এরপর ঢাকা থেকে তাঁর পরিবার লন্ডনে আসে এবং পরে আমেরিকায় চলে যায়। বছরখানেক পর নুরুজ্জামানকে হংকং-এ এবং পরে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে কনসাল জেনারেল নিয়োগ করা হয়। এরশাদের আমলে তাঁকে প্রথমে ফিলিপাইনে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স এবং পরে রাষ্ট্রদূত করে কানাডায় বদলি করা হয়। ১৯৮৬ সালে আমি যখন সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশের হাইকমিশনার তখন সেখানে ভারতীয় দূতাবাসে হাইকমিশনার হয়ে আসেন ভারতের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (র) অবসরপ্রাপ্ত প্রধান দক্ষিণ ভারতীয় নাগরিক শংকর নারায়ণ। একদিন প্রসঙ্গক্রমে তিনি ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চান। নুরুজ্জামান তখন কানাডাতে আমাদের রাষ্ট্রদূত। কিন্তু আমি তা না জানার ভান করে তাঁর সে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাই।

১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা ও বগুড়া সেনানিবাসে এক সেনা-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। অভ্যুত্থানে বেশকিছু সামরিক, বিশেষ করে বিমানবাহিনীর অফিসার নিহত হন। ওই ঘটনার দুদিন পর লন্ডনে তৎকালীন উপ-সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল এরশাদের টেলিফোন পাই। তিনি ফোনে আমাকে জানান, রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধান জিয়া আমাকে সত্বর ঢাকায় আসতে বলেছেন। আমি পরের দিনই আমার স্ত্রী ও কন্যাকে লন্ডনে রেখে ঢাকায় চলে আসি।

জেনারেল জিয়ার রাজনৈতিক উত্তরণ

লন্ডন থেকে ফিরেই জেনারেল জিয়ার সঙ্গে সেনানিবাসে তাঁর শহীদ মইনুল রোডের বাড়িতে দেখা করি। আমি আসার পূর্বেই ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল

রাষ্ট্রপতি সায়েমকে সরিয়ে দিয়ে জিয়া নিজেই রাষ্ট্রপতি হন এবং একই সঙ্গে নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করেন। তাঁর সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েকের মতো আলাপ করে বুঝতে পারি সেনাবাহিনীতে, বিশেষ করে ২ অক্টোবর ১৯৭৭-এ সংঘটিত অভ্যুত্থানের প্রভাব তখনও বিরাজ করছে। পরদিন সকালে সেনাসদরে গিয়ে এরশাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি তখন উপ-সেনাপ্রধান। আমি সবকিছু পর্যবেক্ষণপূর্বক অনুধাবন করি, গত দুবছরে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা বা পরিবেশের খুব একটা উন্নতি হয়নি। সবকিছুই যেন আগের মতো। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবনতি হয়েছে এবং দলাদলি বেড়েছে। অফিসাররা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে কনফিডেন্সের অভাব ছিল।

এখানে প্রাসঙ্গিক হবে মনে করে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। লন্ডন থেকে দেশে ফেরার কয়েকদিন পর সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়ার অফিসকক্ষে বসে তিনি, আমি ও জেনারেল এরশাদ কথা বলছিলাম। জেনারেল জিয়া সে সময় আমাকে বললেন, লন্ডনে তোমার জায়গায় একজন যোগ্য অফিসার পাঠানো দরকার। কাকে পাঠালে ভালো হয় বলে তুমি মনে কর। আমি উত্তরে কর্নেল সাবিউদ্দীনকে (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার, আমেরিকায় বসবাস করেন) পাঠানোর সুপারিশ করি। সঙ্গে সঙ্গে উপ-সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ, যিনি আমার পাশে ছিলেন, বললেন, 'তুমি জান না, হি ইজ নট আওয়ার ম্যান।' আমি একটু হতবাক হলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। আমরা সবাই তো সেনাবাহিনীর লোক এবং আমাদের প্রধান কাজ দেশের প্রতি সর্বতোভাবে অনুগত থাকা। আমি একটু রূঢ় ভাষায়ই বললাম, 'আই অ্যাম অলসো নট এনিবডিজ ম্যান, মাই লয়ালিটি ইজ টু মাই কান্ট্রি অ্যান্ড আর্মি।' এ সময় জেনারেল জিয়া একটু উঁচুস্বরে 'চুপ করো, চুপ করো' বলে আমাদের থামিয়ে দিলেন।

কর্নেল সাবিউদ্দীনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জানাশোনা ছিল না। আমরা একসঙ্গে কখনও চাকরি করিনি। তিনি ছিলেন সিগন্যাল কোরের একজন অফিসার। তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা স্কুলের ইনস্ট্রাক্টরও ছিলেন একসময়। ১৯৭৩ সালে পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগমনের পর তাঁকে ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানের অধীনে প্রেষণে রক্ষীবাহিনীর পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণ করা হলে তিনিও আর্মিতে ফিরে আসেন এবং তখন সেনাসদরে চাকরিরত ছিলেন। গোয়েন্দাকাজে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য যোগ্যতা বিবেচনা করে আমি তাঁর

নাম প্রস্তাব করি। যাহোক, পরে কর্নেল মোতাহের নামে আরেকজন পাকিস্তান-প্রত্যাগত অফিসারকে লন্ডনে পাঠানো হয়। পরে তিনি কর্নেল হিসেবেই অবসর গ্রহণ করেন।

মীর শওকত ও মঞ্জুরের দ্বন্দ্ব

আমি মনে করি, সে সময়ে সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের যে অভাব ছিল তার বহু কারণ ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সেনাবাহিনীতে নিজেদের প্রাধান্যবিস্তারের লক্ষ্যে জেনারেল মঞ্জুর ও জেনারেল মীর শওকত আলীর মধ্যে প্রতিযোগিতা। বস্তুতপক্ষে এঁরা দুজনেই মুক্তিযোদ্ধা। একজন আরেকজনের দীর্ঘদিনের পরিচিত। অথচ শুধু প্রাধান্যবিস্তারের প্রতিযোগিতার ফলেই দুজনের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় এবং সেনাবাহিনীতে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

পাকিস্তানফেরত কিছু-কিছু অফিসার এই রেষারেষিকে জিইয়ে রাখতে সহায়তা করতেন। কারণ তাঁরা জানতেন এটা করতে পারলে তাঁদেরই সুবিধা। আমি ঢাকা আসার আগে সেনাপ্রধান জিয়া একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে জেনারেল মঞ্জুর ও মীর শওকতকে ঢাকা থেকে বদলি করেন। মীর শওকতকে যশোরের জিওসি এবং মঞ্জুরকে চট্টগ্রামের জিওসি করা হলো। মীর শওকতের স্থলাভিষিক্ত করা হলো মেজর জেনারেল শামসুজ্জামানকে। মঞ্জুরের স্থলে জেনারেল মান্নাফকে চিফ অফ জেনারেল স্টাফ করা হলো। এঁরা দুজনেই ছিলেন পাকিস্তান-প্রত্যাগত অফিসার।

সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ও ঐক্যের ক্রমাবনতির আরেকটা কারণ ছিল সেনাপ্রধান জিয়া সামরিক আইন প্রশাসক হওয়ায় দেশের রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং তা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। ফলে সেনাবাহিনীর নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা কিংবা খেয়াল রাখার অভিপ্রায় কোনোটাই তাঁর ছিল না। আমি আসার আগ পর্যন্ত ব্রিগেডিয়ার নুরুল ইসলাম ছিলেন জিয়ার পিএসও এবং একই সঙ্গে অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল। তিনি আর্মির কাজের চেয়ে জিয়ার রাজনৈতিক কাজ ও তাঁর জন্য দলগঠন নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৭৬ সালে এই নুরুল ইসলামই লিবিয়া গিয়ে মুজিব হত্যাকারীদের ফরেন সার্ভিসে আত্তীকরণের ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ নেন। ফারুক-রশীদ ছাড়া বাকি সবাইকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আত্তীকরণ করা হয়। রশীদ ও ফারুক লিবিয়ায় ব্যবসায় জড়িত ছিল বলে তারা ওই প্রস্তাবে সায় দেয়নি। যাহোক,

সে সময় আমি জিয়াকে নিষেধ করি যেন এদের এভাবে বৈদেশিক চাকরিতে সুযোগ দেওয়া না হয়। কারণ, এতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে বলে আমি তাঁকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাই। কিন্তু জেনারেল জিয়া সবকিছু উপেক্ষা করে নুরুল ইসলাম ও অন্যান্য কিছু লোকের সুপারিশে এদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আত্তীকরণ করেন।

মুজিব হত্যাকারীদের সঙ্গে আপস করিনি

অদৃষ্টের খেলায় অনেক পটপরিবর্তন হয়েছে। আমাকেও সেনাবাহিনী ছেড়ে হতে হয়েছিল রাষ্ট্রদূত। কিন্তু নীতির প্রশ্নে এবং বিবেককে শুদ্ধ রাখার তাগিদে নিজের ভালোমন্দ তোয়াক্কা না করে পরবর্তী সময়েও নিজের অবস্থানে অটল ছিলাম। ১৯৭৬ সালে যেমন মুজিব হত্যাকারীদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আত্তীকরণ না করার জন্য জিয়াকে অনুরোধ করেছিলাম তেমনি ১৯৮২ এবং ১৯৯৪ সালেও এদের ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন করিনি।

১৯৮২ সাল, এরশাদ তখন ক্ষমতায়। আমি ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। আলজেরিয়া থেকে মুজিবহত্যার সঙ্গে জড়িত তৎকালীন কাউন্সিলর মেজর মহিউদ্দীনকে (বর্তমানে কারারুদ্ধ) জাকার্তায় বাংলাদেশ দূতাবাসে বদলি করা হয়। আমি তাকে আমার দূতাবাসে নিতে অস্বীকৃতি জানাই। জেনারেল এরশাদের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ আর এস দোহাকে আমি সরাসরি বলি, দেশের রাষ্ট্রপতিহত্যার সঙ্গে জড়িত এসব উচ্ছৃঙ্খল অফিসারকে আমি আমার সঙ্গে চাকরি করতে দিতে রাজি নই। পরে ফিলিপিন থেকে তার স্থলে মোতাহার হোসেনকে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি ওআইসিতে চাকরি করেন।

১৯৯৪ সালে আবারও একই রকম সমস্যায় পড়তে হয়। আমি তখন অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। বেগম খালেদা জিয়া সরকারপ্রধান। সে সময় মুজিবহত্যার সঙ্গে জড়িত লে. কর্নেল পাশাকে জিম্বাবুয়ে থেকে অস্ট্রেলিয়ায় আমার অধীনে বদলি করা হলে আমি তাকে গ্রহণ করতে অপারগতা জানাই। পাশার বদলির আদেশ পেয়ে আমি তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানের (বর্তমানে প্রয়াত) সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি। তাঁকে না পেয়ে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব মহিউদ্দীন আহমদের (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ও নেপালে রাষ্ট্রদূত) সঙ্গে কথা বলি। তিনি আমাকে জানান, সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে মানবিক কারণে তাঁকে অস্ট্রেলিয়ায় বদলি করা

হয়েছে। আমি তাঁকে বলি যে, আপনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিন, আমি কোনো অবস্থাতেই কর্নেল পাশাকে আমার দূতাবাসে নিতে রাজি নই। তিনি আমাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। ফলে আমি বিষয়টি তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সরাসরি জানাই এবং আমার অবস্থান ব্যাখ্যা করি। তিনি বলেন, চিকিৎসার স্বার্থে তাকে সেখানে বদলি করা হয়েছে এবং আমাকে তা গ্রহণ করতে হবে। এর পরও আমি তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাই এবং বলি, প্রয়োজনে আমাকে দেশে নিয়ে আসতে পারেন। তিনি আমাকে এ বিষয়ে পরে জানাবেন বলে জানান। সপ্তাহখানেক পরে পাশার বদলির আদেশ প্রত্যাহার করা হয় এবং তার স্থলে জাপান থেকে মোস্তাকিমকে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি হংকং-এ বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল।

যাহোক, সে সময়ে ক্ষমতাসীন সরকার শেখ মুজিব হত্যায় জড়িত অফিসারদের ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বরের পর দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর তাঁরা মনে করেছিলেন দেশে আসতে পারবেন। কিন্তু জিয়া তাঁদের সে সুযোগ দেননি। তবে এদের মধ্যে ফারুক, রশীদ ও ডালিম সরকারের বিনা অনুমতিতে দুএকবার দেশে এসেছিল। কিন্তু বিভিন্ন উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে আবার তাদের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদের মধ্যে ফারুককে একবার গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়। পরে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওই সময় ফারুক-রশীদদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়ে জিয়া বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াবকে বরখাস্ত করেন। মোশতাকের সময় এরাই তাঁকে জার্মানি থেকে ডেকে এনে বিমানবাহিনীর প্রধান বানান। ফারুক-রশীদ ছাড়া মুজিবহত্যার সঙ্গে জড়িত বাকি সবাই চাকরি নেয়। এদের মধ্যে কমিশন্ড র‍্যাংকের নিচের কয়েকজন, যেমন হাবিলদার মারফত আলী শাহ ও মোঃ আবদুল বারীকে নিম্নপদে চাকরি দেওয়া হয়।

ব্রিগেডিয়ার নুরুল ইসলামের সঙ্গে কাজী জাফর আহমদ, মওদুদ আহমেদ, ডা. মতিন, মশিউর রহমান এসব রাজনীতিবিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং যাতায়াত ছিল। ফলে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা দেখার সময় তাঁর ছিল না। তিনি নিজেকেও একজন ভবিষ্যৎ রাজনীতিবিদ হিসেবে তৈরি করছিলেন এবং পরে জিয়ার আমলে তিনি মন্ত্রীও হন।

আর্মি আইন সংশোধন

১৯৭৮ সালে জিয়া আর্মি আইন সংশোধন করে সেনাবাহিনীতে কর্মরত থেকেই রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করেন। জিয়ার বিপক্ষে জেনারেল ওসমানীকে

দাঁড় করানো হয়। জিয়া বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। এর আগের হ্যাঁ-না ভোটের তুলনায় ওই নির্বাচন নিরপেক্ষ ছিল। সরকারপ্রধান হিসেবে ১৯৭৭ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদানের লক্ষ্যে উপদেষ্টাদের পরামর্শে জেনারেল জিয়া হ্যাঁ-না ভোটের প্রহসন করেন। ওই নির্বাচনকে দেশে ও বিদেশে হাস্যকর নির্বাচন হিসেবে গণ্য করা হয়। অবশ্য সেনা আইন সংশোধন করে করা পরবর্তী নির্বাচনের সময় জিয়ার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ছিল।

আইন মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন ড্রাফটিং ইন-চার্জ যুগ্মসচিব আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী আর্মি আইনের খসড়া নিয়ে আসেন যাতে করে জিয়া সেনাবাহিনীতে থেকেই নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন। আমি তখন অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে সামরিক আইনকানুন দেখাশোনার দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাই খসড়ার ওপর কুদ্দুস সাহেব আমার মন্তব্য জানতে চাইলে আমি বলি, 'ফিল্ড মার্শাল'-এর স্থলে 'মেজর জেনারেল' শব্দ প্রতিস্থাপন করলেই তো হয়- এর জন্য খসড়া আইন তৈরির কী দরকার ছিল। তিনি আমার এ বক্তব্যে মনঃক্ষুণ্ন হন এবং চলে যান। উল্লেখ্য, পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খানও ফিল্ড মার্শাল থাকাকালীন এক সামরিক আদেশবলে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী পরেও বিভিন্ন সংশোধনীর উদ্যোক্তা ছিলেন এবং এরশাদের আমলে সচিব ও বিচারক হন।

এরশাদ জিয়াকে রাজনীতিতে উৎসাহিত করতেন

ওই বছরই জিয়ার পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মদদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হলো জাগদল বা জাতীয় গণতান্ত্রিক দল। এদের সমন্বয়ে পরবর্তী সময়ে জিয়া গঠন করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা সংক্ষেপে বিএনপি। ১৯ দফা কর্মসূচি দিয়ে শুরু হয় সংগঠনের কার্যক্রম। বিভিন্ন দল থেকে ছুটে আসে রাজনীতিবিদগণ। এর সঙ্গে যুক্ত হয় জাতীয় গোয়েন্দা নিরাপত্তা, সামরিক নিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন আমলা, ব্যবসায়ী ও কিছু সাংবাদিকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগোষ্ঠী। ক্ষমতার লোভে এবং বিভিন্ন সুবিধাপ্রাপ্তির আশায় নতুন ওই দলে অনুপ্রবেশ ঘটে অনেক ভুঁইফোঁড় নেতার। অনেক অখ্যাত অথচ হঠাৎ-ধনবান এবং কিছু স্বাধীনতাবিরোধী লোকজন ওই দলে ভিড়ে যায়।

ব্রিগেডিয়ার নুরুল ইসলামের সঙ্গে মেজর জেনারেল এরশাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমি যখন লন্ডন থেকে ঢাকায় আসি এরশাদ তখনও উপ-সেনাপ্রধান। এরশাদ ভারতে প্রশিক্ষণে থাকা অবস্থাতেই রাষ্ট্রপতি মোশতাক, ওসমানী, ফারুক ও রশীদের সমর্থনে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি পান এবং উপ-সেনাপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন। উপ-সেনাপ্রধান থাকা অবস্থাতেই এরশাদ জিয়াকে রাজনীতিতে জড়ানোর জন্য উৎসাহিত করতেন। এর পেছনে লুকানো ছিল এরশাদের নিজের স্বার্থ এবং ভবিষ্যতের উচ্চাভিলাষী আকাঙ্ক্ষা। এ ছাড়া অন্যান্য কিছু সুবিধাবাদী, অপেশাদার সামরিক অফিসার ও তথাকথিত কিছু নেতা যাঁরা স্বাধীনতার পর রাজনীতিতে সুবিধা করতে পারেননি তাঁরা জিয়াকে রাজনীতিতে জড়ানোর জন্য উৎসাহ যোগাতেন।

এরশাদের উচ্চাভিলাষ ও ক্রমোন্নতি

জেনারেল এরশাদের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। ১৯৬৪ সালে এরশাদ যখন ক্যাপ্টেন, তখন আমি যশোরে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট। এরশাদকে অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল থেকে স্বল্পমেয়াদি কমিশন্ড অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে। এই অফিসার প্রশিক্ষণ স্কিম ছিল স্বল্প সময়ের জন্য। যুদ্ধের প্রয়োজনে ১৯৪৮ সালের কাশ্মীর যুদ্ধের পর ১৯৫০-এর প্রথম দিকে জরুরি ভিত্তিতে পাকিস্তানের কোহাট শহরে এ প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছিল।

অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল নামে ওই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মাত্র ৯ মাসের ট্রেনিংয়ের পর এদের স্বল্পমেয়াদি কমিশন দেওয়া হতো। বয়সসীমা এবং অন্য শর্তাবলি শিথিল করার কারণে অনেকে অন্য চাকরি ছেড়ে এতে যোগ দেয়। পরে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের আমলে ওই ট্রেনিং স্কুল থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া অধিকাংশকে লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেন ইত্যাদি পদে থাকাকালে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কারণ এদের ব্যাপারে শর্তই ছিল সরকার ইচ্ছা করলেই তাদের অব্যাহতি দিতে পারবে। স্কিম এক্স-এর অধীনে এরশাদের ব্যাচের অনেককেই মাত্র কয়েক বছর চাকরি করার পর অব্যাহতি দেওয়া হয়।

১৩ বছর চাকরির পর ১৯৬৫ সালে এরশাদ মেজর পদে উন্নীত হন। একজন দক্ষ, চৌকস ও বিচক্ষণ সেনাকর্মকর্তা হিসেবে যদিও তাঁর সুনাম ছিল না, কিন্তু 'চতুর সামাজিক যোগাযোগের' ক্ষেত্রে তাঁর প্রচুর দক্ষতা ছিল। যেমন তিনি জেনারেল ওসমানীর প্রিয়পাত্র হতে পেরেছিলেন। পাকিস্তান-প্রত্যাগত

এরশাদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ১৯৭৩ সালে। এরপর মাত্র সাত বছরে তিনি লে. কর্নেল থেকে তরতর করে লে. জেনারেল ও সেনাবাহিনী প্রধান হয়ে যান। আর আট বছরের মাথায় তিনি সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে যান।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অনৈক্যের একটা প্রধান কারণ ছিল মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধা সেনা-অফিসারদের দ্বন্দ্ব। এরশাদ উপসেনাপ্রধান হওয়ায় এ সুযোগকে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে কাজে লাগান। তিনি এদের মধ্যে বিভেদের ফাটল সৃষ্টি করেন। মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের দাবিয়ে রেখে অমুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধার পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেন। তখন মেজর জেনারেল পদমর্যাদার সেনা অফিসারদের মধ্যে চারজন ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। এই চারজনের মধ্যে একজন ছিলেন ডা. শামসুল হক। বাকি তিনজন মীর শওকত, মঞ্জুর ও আমি। আবার এঁদের মধ্যে দুজন— শওকত ও মঞ্জুরের সম্পর্ক ভালো ছিল না, যা আগেই বলেছি।

২৮ জন কর্নেলের পদোন্নতি

রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য জিয়াকে এরশাদ খুব উৎসাহিত করতেন যা আগেই বলেছি। এরশাদ জিয়াকে প্রায়ই বলতেন, 'আপনি সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে খুব জনপ্রিয়।' অথচ আমার মতে, তখন জিয়ার জনপ্রিয়তা ক্রমাবনতির দিকে। সে সময়ের একটি ঘটনার কথা বলতে পারি যা সেনাবাহিনীতে বেশ অসন্তোষ সৃষ্টি করে। কোনোরকম যোগ্যতার বিচার না করেই জিয়া ২৮ জন কর্নেলকে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত করেন। এদের অনেকেই ছিল অযোগ্য ও অদক্ষ, যা নিয়ে সেনাবাহিনীতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় এবং জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এখানে তিনি সেনাবাহিনীর স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে শুধু রাজনৈতিক স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেন। পদোন্নতিপ্রাপ্ত এ ২৮ জনের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার সাদেকুর রহমানও ছিলেন। এই কর্নেল সাদেক যখন বগুড়াতে অফিসিয়েটিং ব্রিগেড কমান্ডার তখন ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত বগুড়াতে সেনাবিদ্রোহ হয়। সে বিদ্রোহের ঘটনা তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন পাকিস্তান-প্রত্যাগত মে. জেনারেল লতিফ। জেনারেল লতিফ ওই বিদ্রোহের জন্য সাদেককেই দায়ী করেন। ব্রিগেডিয়ার পদে সাদেকুর রহমানের পদোন্নতির কথাবার্তা যখন চলছিল আমি

তখন অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল। সে হিসেবে আর্মি প্রমোশন বোর্ডের একজন সদস্যও। ফাইল পড়ার সময় জেনারেল লতিফের ওই মন্তব্য আমার নজরে আসে। কর্নেল সাদেক তখন জিয়ার সামরিক সচিব। ফলে জিয়াকে তোষামোদ করার উদ্দেশ্যে মন্তব্যকারী কর্মকর্তা জেনারেল লতিফ ও অন্যান্য কর্মকর্তা বোর্ড সভায় আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর প্রমোশন সমর্থন করে বসেন। মিটিংয়ে আমি সাদেকুর রহমান সম্পর্কিত জে. লতিফের ওই মন্তব্য জিয়ার দৃষ্টিগোচরে আনার চেষ্টা করি। জিয়া তখন রাগান্বিত হন এবং বিরক্তির সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, তদন্ত রিপোর্টে কী আছে পড়ো। আমি তখন জিয়াকে ইংরেজিতে বলি, 'মি. প্রেসিডেন্ট, আই অ্যাম ট্রাইং টু ডু মাই ডিউটি অ্যাজ অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল অ্যান্ড ইফ ইউ আর আনউইলিং টু হিয়ার হোয়াট ইজ রিটেন ইন দি কোর্ট অফ ইনকোয়ারি কনসারনিং ইওর মিলিটারি সেক্রেটারি ; আই ডুনট থিঙ্ক আই শুড সিট হিয়ার অ্যাজ এ মেম্বর অফ এ প্রমোশন বোর্ড।' এই বলে আমি ফাইলটি বন্ধ করে ফেলি। পরে তিনি স্বর নিচু করে আমাকে পড়তে বলেন। আমি তা পড়ে শোনাই। এরপর তিনি সভা শেষ না করে উপ-সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদকে সভা পরিচালনার ভার দিয়ে চলে যান। জিয়া পরে ঐ ২৮ জনের সঙ্গে সাদেকের প্রমোশন অনুমোদন করেন।

মজার ব্যাপার হলো, এ ধরনের মিটিংয়ের বিষয়বস্তু অত্যন্ত গোপন থাকার কথা। মিটিংয়ে সব উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থাকেন। শুধু সদস্য সচিব হিসেবে মাত্র একজন জুনিয়র অফিসার থাকেন। আর পদাধিকারবলে সচিব হিসেবে সে মিটিংয়ে তৎকালীন কর্নেল সুবেদ আলী ভূঁইয়াও ছিলেন। মিটিংয়ে আমি জিয়াকে সাদেকুর রহমান সম্পর্কে যা বলেছি সুবেদ আলী ভূঁইয়া তা সাদেকুর রহমানকে বলে দেন, যা গুরুতর বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ এবং শাস্তিযোগ্য। সাদেক যেহেতু জিয়ার সামরিক সচিব তাই তাঁকে খুশি করার জন্য ভূঁইয়া তাকে মিটিংয়ের তথ্য দেন। সাদেকুর রহমান আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয়। মিটিংয়ে তাঁর পদোন্নতির ব্যাপারে আমার আপত্তির কথা শুনে তিনি আমার বাসায় আসেন এবং অনুযোগ করেন। সভার এসব গোপন সিদ্ধান্ত তাঁর জানার কথা নয়। আমি তার কাছে জানতে চাই, তিনি এসব কোথা থেকে জানলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি তৎকালীন কর্নেল সুবেদ আলী ভূঁইয়ার নাম বললেন। আমি বিষয়টি জেনারেল জিয়াকে অবহিত করি এবং সুবেদ আলী ভূঁইয়াকে অন্যত্র বদলি করার সুপারিশ করি। জিয়া আমাকে জানান, তৎকালীন উপ-সেনাপ্রধান এরশাদের সুপারিশেই সুবেদ আলী ভূঁইয়াকে আর্মি হেডকোয়ার্টারের সামরিক সচিবের মতো স্পর্শকাতর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যাহোক, পরে তাঁকে অন্যত্র বদলি করা হয় এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয় তৎকালীন কর্নেল নাসিমকে।

ছলনা ও চাতুর্য দিয়ে এরশাদ জিয়ার আস্থাভাজন হন

এদিকে এরশাদ ধীরে ধীরে জিয়ার কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ও আস্থাভাজন হওয়ার পথ করলেন। ছলনা ও চতুরতার মাধ্যমে এরশাদ জিয়ার খুব প্রিয়পাত্র হলেন। জিয়াও তাঁকে বিশ্বাস করতে শুরু করলেন। একসময় জিয়া এরশাদকে সেনাপ্রধান করে নিজে ওই পদ থেকে সরে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। এ পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে জিয়া একদিন আর্মি হেডকোয়ার্টারের সামনের লনে হাঁটতে হাঁটতে কথা প্রসঙ্গে আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি জেনারেল মঞ্জুরকে সেনাপ্রধান করার কথা বললাম। জিয়া আমার ওই মতামতকে অন্যভাবে নিলেন। ভাবলেন, আমি আর মঞ্জুর একই পক্ষের। তাই জিয়া আমার দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ করে বললেন, তোমরা দুজনেই চিফ হবে, তবে অপেক্ষা করতে হবে। শুধু আমি নই, জিয়ার অন্যান্য সুহৃদ, শুভাকাঙ্ক্ষী, অনুগত ও বন্ধুবান্ধবরা এরশাদকে সেনাপ্রধান করার বিপক্ষে ছিলেন। এরশাদ তখন জিয়া সরকারের দুর্নীতি দমনের (কো-অর্ডিনেশন সেল) প্রধান সমন্বয়কারী, অথচ তাঁর বিরুদ্ধেই অনেক দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সেনাবাহিনীতে কথাবার্তা হতো। এ ছাড়া তাঁর নৈতিক চরিত্র নিয়ে অনেক কানাঘুষা ছিল। সেনাবাহিনীতে এসব নিয়ে তখন কথাবার্তা হতো। এতকিছু সত্ত্বেও জিয়া ১৯৭৯ সালের ২৯ এপ্রিল এরশাদকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে সেনাপ্রধান করেন। সেনাপ্রধান হওয়ার পর এরশাদ অত্যন্ত সুকৌশলে পদক্ষেপ নিতে লাগলেন। তাঁর নিজের পছন্দের লোকদের গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বসম্পন্ন পদগুলোতে বহাল করলেন। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের পার্বত্য বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বদলি করা হলো। কৌশলে স্পর্শকাতর পদগুলো থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সরিয়ে দেওয়া হলো। সেনা ও সামরিক গোয়েন্দা বিভাগগুলোতে তিনি নিজের কাছের লোকদের নিয়োগ করলেন। পরে ক্ষমতাদখলের সময় এসব লোক তাঁকে সহায়তা করে এবং তাঁর রাজনীতির দোসর হয়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো লে. জেনারেল মহব্বত জান চৌধুরী, যিনি পরে মন্ত্রী হন। বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য নিজের পছন্দমতো লোকদের পাঠিয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্যের জন্য পুরস্কৃত করতেন। আর্মি হেডকোয়ার্টারের একজন পিএসও হিসেবে এসব বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর পরামর্শ করার কথা। কিন্তু এরশাদ সেটা এড়িয়ে যেতেন।

মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলি

'৮০ থেকে '৮১ সালের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পোস্টিং দেওয়া হয়। এটা ছিল একটা কষ্টকর স্থান এবং সেনাবাহিনীতে এটা 'হার্ড স্টেশন' নামে পরিচিত। বিষয়টি নিয়ে আমি এরশাদের সঙ্গে কথা বলি। ওইসব পোস্টিং রাষ্ট্রপতি জিয়ার ইঙ্গিতেই হচ্ছিল বলে তিনি আমাকে বোঝাতে চান। এরপর আমি বিষয়টি রাষ্ট্রপতি জিয়ার দৃষ্টিতেও আনি। কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পোস্টিং পাওয়া ওইসব মুক্তিযোদ্ধা অফিসার স্বাভাবিক কারণে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের তৎকালীন জিওসি মে. জেনারেল আবুল মঞ্জুরের অধীনে ছিলেন। দুঃখজনক হলেও সত্য, ১৯৮১ সালে জিয়াহত্যার পর সেনাবাহিনী থেকে প্রকাশিত তথাকথিত শ্বেতপত্রে এত মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে 'জড়ো' করার জন্য জেনারেল মঞ্জুরকে দোষারোপ করা হয়। অথচ প্রকৃত সত্য হলো, আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকেই ওই সেনা-অফিসারদের বদলি করা হয়েছিল। আইন অনুযায়ী এক্ষেত্রে জিওসির বিশেষ কিছু করণীয় ছিল না।

জিয়ার সঙ্গে সম্পর্কে শীতলতা

এদিকে আমি বিদেশ থেকে আসার আগেই অনেকগুলো বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের কোর্ট মার্শাল ও ফাঁসির হুকুম হয়ে গিয়েছিল। এদের কাগজপত্র দেখে মনে হয়েছে, তারা সত্যিকারভাবে ন্যায় বিচার পায়নি। তড়িঘড়ি করে তাদের বিচার করা হয়। সমস্ত পরিস্থিতি অনুধাবন করে ১৯৮০ সালে আমি জিয়াকে একটি চিঠি লিখি। আমি মনে করেছিলাম, এত ব্যস্ততার মধ্যে জিয়াকে হয়তো কথা না বলে চিঠি লেখাই সমীচীন হবে। কারণ ব্যস্ততার ফাঁকে হয়তো তিনি চিঠিটা পড়ে বিস্তারিত অবহিত হবেন। চিঠিটা আমি নিজহাতে তাঁকে দিই। কিন্তু বাস্তবতা হলো, জিয়া চিঠিটার বিষয়বস্তু নিয়ে আমার সঙ্গে কোনো আলাপ করেননি এবং উত্তরও দেননি।

জিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কের ক্রমেই অবনতি হচ্ছিল। মূলত আমি সবসময় সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ও এর সার্বিক স্বার্থের ওপর জোর দিয়েছি। আমি সরল মনে জেনারেল জিয়াকে রাজনীতিতে না জড়ানোরও পরামর্শ

দিয়েছিলাম। কেননা, মার্শাল ল' ও অন্যান্য কারণে কিছু সামরিক কর্মকর্তা দুর্নীতি এমনকি চাকরিরত অবস্থাতেই সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছিলেন। এসব বিবেচনা করে একদিন বঙ্গভবনে জেনারেল জিয়ার সঙ্গে কর্নেল তাহেরের ফাঁসি ও আর্মির বিদ্যমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করি। আলোচনার এক পর্যায়ে আমি জেনারেল জিয়াকে অনুরোধ করি যে, দেশে একটা সাধারণ নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পুরোপুরি সেনাবাহিনীতে ফিরে আসুন। আমি তাঁকে এও বলেছিলাম, এভাবে যদি ক্ষমতা আঁকড়ে থাকেন, তা হলে জনগণের মাঝে সেনাবাহিনী সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হবে। জেনারেল জিয়া তখন এসব ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি।

আমি ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো আমার প্রস্তাব ভালোভাবেই গ্রহণ করেছেন। আমার ওই ধারণা আরো বদ্ধমূল হলো এই কারণে যে, জিয়া পরে এ সম্পর্কে জেনারেল এরশাদ ও নুরুল ইসলামের সঙ্গে আলাপ করেন। এঁরা দুজনই জিয়াকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়ানোর ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন বলে আমার মনে হতো। বাস্তবতা হলো, জিয়ার রাজনীতিতে জড়ানোর ব্যাপারে আমার নেতিবাচক মনোভাব এবং মিটিংয়ে তাঁর সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার সাদেকের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার কথোপকথনের ফলস্বরূপ তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক শীতল হতে থাকে।

এখানে বলতে হয়, ১৯৭৭ সালের অক্টোবরের অভ্যুত্থান ও সেনাবিদ্রোহ এবং অন্যান্য উচ্ছৃঙ্খলতার প্রেক্ষাপটে জিয়া আমাকে লন্ডন থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তখন আমার ওপর জিয়ার আস্থা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, সেনাবাহিনীতে কোনো গ্রুপিং বা দলাদলির সঙ্গে আমি সম্পৃক্ত নই। পরে রাজনীতিসংক্রান্ত কার্যকলাপের প্রতি আমার নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমার প্রতি তিনি আস্থা অব্যাহত রাখতে পারেননি।

১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে আমি ক্যাডেট কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসেবে সস্ত্রীক চট্টগ্রাম ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান করি। রাতে জিওসি জেনারেল মঞ্জুরের সঙ্গে ব্যক্তিগত নৈশভোজে অংশগ্রহণ করি। সেখানে আলাপচারিতায় মঞ্জুরের স্ত্রী জিয়ার ওপর খুব বিরক্তি প্রকাশ করেন। তিনি অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় খোলামেলাভাবে সরকার ও সেনাকর্তৃত্বের সমালোচনা করতে শুরু করেন। এতে আমি ও আমার স্ত্রী অস্বস্তি বোধ করছিলাম এবং অন্য প্রসঙ্গ টানতে চেষ্টা করি। যাহোক খাওয়াদাওয়ার পর আমরা চলে আসি। কিন্তু সামরিক গোয়েন্দারা অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিকভাবে সাজিয়ে সেই নৈশভোজের কথা সেনাপ্রধান এরশাদ ও জিয়ার কানে তোলে।

আমাকে বগুড়ায় ও মঞ্জুরকে ঢাকায় বদলি

এর কয়েকদিন পরেই এরশাদ আমাকে জানালেন, রাষ্ট্রপতি জিয়ার নির্দেশে আমাকে ঢাকায় অ্যাডজুটেন্ট জেনারেলের পদ ছেড়ে বগুড়াতে জিওসি হয়ে চলে যেতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে আমি জানতে চাইলাম, আর কার পোস্টিং হয়েছে। এরশাদ উত্তরে বললেন, জেনারেল মঞ্জুরকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় স্টাফ কলেজে বদলি করা হয়েছে এবং আমার বর্তমান অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল পদ আপাতত খালি থাকবে এবং লে. জে. এরশাদ নিজেই সে দায়িত্ব পালন করবেন।

আর্মি হেডকোয়ার্টারের পিএসও (অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল) থাকাকালে আমাকে প্রায়ই তৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে হতো। কিন্তু জেনারেল এরশাদ সেনাপ্রধান হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে আমার তেমন দেখা-সাক্ষাৎ হতো না এবং আমিও নিজে থেকে কোনোরকম যোগাযোগ রাখা থেকে বিরত থাকতাম। অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে অফিসিয়ালি আমার তেমন দেখাসাক্ষাৎ হওয়ার কথাও নয়। তা ছাড়া অফিসিয়াল প্রয়োজন ছাড়া রাষ্ট্রপতি কিংবা মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সামরিক আচারে অবাঞ্ছনীয়।

১৯৮১ সালের মে মাসে জিয়া নিহত হওয়ার পাঁচদিন পূর্বে বগুড়া সেনানিবাসে বদলির আদেশ পেলাম। বদলির আদেশ পেয়ে আমি চিফ অফ স্টাফ জেনারেল এরশাদকে রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক জেনারেল জিয়ার সঙ্গে আমার সৌজন্য সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করি। আমি তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করি যে, বদলি রহিত করার কোনো তদবির নিয়ে আমি রাষ্ট্রপতি জিয়ার কাছে যাচ্ছি না। ঢাকা থেকে যাওয়ার আগে সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে চাই। তবে আমার এই ইচ্ছা অবশ্যই ছিল যে, সাক্ষাতের সুযোগে আর্মির অব্যবস্থা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অসন্তোষের বিষয়ে জিয়াকে অবহিত করব।

প্রথমে জেনারেল এরশাদ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে রাজি হলেন না। আমাকে বললেন, নিজেই যেন সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি। কিন্তু আমি রাষ্ট্রাচারের নিয়মকানুনের উপর জোর দেওয়ায় দুদিন পর জেনারেল এরশাদ ৩০ মে বিকেল বেলায় প্রেসিডেন্টের বাড়িতে আমার সঙ্গে জিয়ার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল এরশাদ আমাকে এও জানালেন যে, রাষ্ট্রপতি জিয়া চান আমি যেন খুব তাড়াতাড়ি বগুড়ায় যোগদান করি। আমি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা হওয়ার দুএকদিন পরেই বগুড়ায় চলে যাব বলে এরশাদকে জানাই। কিন্তু জিয়ার সঙ্গে আমার সেই সাক্ষাৎ আর হলো না। আগের রাতেই তিনি নিহত হন। সেকথায় পরে আসছি ।

এদিকে রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের ব্যবস্থা হওয়ার পর আমি জেনারেল মঞ্জুরকে চট্টগ্রামে ফোন করি। জেনারেল মঞ্জুর ফোনে আমাকে এমন ইঙ্গিত করলেন যে, রাষ্ট্রপতি জিয়া নিশ্চয় ভাবেন আমরা দুজন এক পক্ষের, বিশেষ করে তাঁর রাজনৈতিক ও সমসাময়িক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। এজন্যই আমাদের বদলি করে দিলেন।

যাহোক আমার বগুড়ায় বদলির খবরে ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে হতাশ হন। কারণ, সেনাসদরে চারজন পিএসও-এর মধ্যে তখন আমিই একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল ছিলাম। সেনাপ্রধান এরশাদসহ বাকি সবাই অমুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তান-প্রত্যাগত।

জিয়ার হত্যাকাণ্ড ও এরশাদের তৎপরতা

৩০ মে শুক্রবার আমি তখনও বিছানায় শোয়া। ভোরেই আমার সহকর্মী আর্মি হেড-কোয়ার্টারের পিএসও জেনারেল নুরুদ্দিন (বর্তমানে মন্ত্রী) ফোন করে আমাকে সত্বর সেনাসদরে যেতে বললেন। সেসঙ্গে জানালেন, জেনারেল জিয়া চট্টগ্রামে নিহত হয়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি ইউনিফর্ম পরে সেনাসদরে উপস্থিত হই। সেখানে গিয়ে দেখি জেনারেল এরশাদ আগেই উপস্থিত হয়েছেন। এরশাদ ছিলেন সামরিক পোশাক পরিহিত এবং ধীর, স্থির ও শান্ত। আমার পরে সেনাসদরে এলেন আরেক পিএসও জেনারেল মান্নান সিদ্দিকী (পরে এরশাদ সরকারের মন্ত্রী)। আমরা জেনারেল এরশাদকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কী হবে? জেনারেল এরশাদ সরাসরি কোনো উত্তর দিতে চাননি, বরং পরোক্ষ ইঙ্গিতে সামরিক আইন জারির কথা বললেন। আমরা বললাম, সামরিক আইন জারির কোনো যুক্তি বা অবস্থা এখন নেই। উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তার আছেন। তিনি তখন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, তখনও পর্যন্ত জেনারেল এরশাদ উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে জিয়া নিহত হওয়ার খবর জানাননি। আমরা বলার পর জেনারেল এরশাদ গেলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য।

সকাল ৯টার দিকে জেনারেল মঞ্জুর চট্টগ্রাম থেকে আমাকে ফোন করলেন। আমি তখন জেনারেল নুরুদ্দিনের কক্ষে। জেনারেল মঞ্জুর আমাকে আমার অফিসকক্ষে না পেয়ে জেনারেল নুরুদ্দিনের কক্ষেই ফোন করেন। ফোনে মঞ্জুর বললেন, 'জেনারেল জিয়ার নিহত হওয়ার ব্যাপারে পরে

বিস্তারিত জানাবেন। কিন্তু এ মুহূর্তে সবাই যেন শান্ত থাকে। ঢাকায় আর যেন রক্তক্ষয়, সংঘর্ষ ইত্যাদিতে কেউ জড়িয়ে না পড়ে। আমি আর বলতে পারছি না, অসুবিধা আছে।' এরপর ফোন লাইন কেটে যায়। অনেক পরে ১৯৯০ সালে আমি জানতে পারি, জেনারেল মঞ্জুর তখন জুনিয়র অফিসারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও চাপের মধ্যে ছিলেন।

জিয়াহত্যার ব্যাপারে অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস তাঁর এ *লেগ্যাসি অফ ব্লাড* বইতে (পৃ. ১৬৯) জেনারেল মঞ্জুর ও জেনারেল শওকতের ষড়যন্ত্রের আভাস দিয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁদের উভয়ের সম্পর্ক ভালো ছিল না তা আমি আগেই বলেছি। একইভাবে ওই বইয়ে বলা হয়, জেনারেল মঞ্জুর ঢাকায় একাধিকবার ফোন করেছেন এবং আমি তাঁর ফোন পেয়ে অস্বস্তি বোধ করেছি বা হতবাক হয়েছি— এটাও সম্পূর্ণ বানোয়াট। আমি এসব ঘটনার সাক্ষী। জেনারেল এরশাদের শাসনামলে এসব ভুল তথ্য আর্মিতে মুক্তিযোদ্ধা-বিরোধীরা ম্যাসকারেনহাসকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সরবরাহ করে। বইটি পড়লেই এর উদ্দেশ্য বোঝা যায়।

হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে খালেদ ও মোজাফফর যা বলেন

এ ছাড়া আমি যখন থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত (১৯৮৯-৯৩) তখন জিয়াহত্যায় অভিযুক্ত অন্যতম পলাতক আসামি মেজর খালেদ ব্যাংককে ছিলেন। অপর পলাতক আসামি মেজর মুজাফফর ছিলেন ভারতে। ভারত থেকে এসে মেজর মুজাফফরও খালেদকে নিয়ে ব্যাংককে আমার সঙ্গে দেখা করেন। জিয়াহত্যার বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। ওই হত্যাকাণ্ডের সঠিক তথ্য জানার ইচ্ছা আমার ছিল এবং সেরূপ চেষ্টাও করি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আমি যা জেনেছি তা সংক্ষেপে এরকম : মতি, মাহাবুব ও খালেদের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম ২৪ ডিভিশনের জুনিয়র অফিসাররা জিওসি জেনারেল মঞ্জুরের অজান্তে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সার্কিট হাউস থেকে অপহরণ করে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল— জিয়াকে চাপ দিয়ে বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়, বিশেষ করে সেনাপ্রধান এরশাদসহ অন্যান্য দুর্নীতিপরায়ণ সামরিক অফিসার এবং পাকিস্তানপন্থী শাহ আজিজ ও অন্য দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করানো। কারণ এরশাদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের হয়রানি, বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের ঢালাওভাবে

পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলি করাসহ সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের বিভিন্নস্তরের ব্যাপক দুর্নীতি নিয়ে জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ ছিল। মূলত এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাদের ওই উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে।

বিদ্রোহের সেই রাতে বেশ ঝড় হচ্ছিল এবং জিয়া সার্কিট হাউসের দোতলায় ঘুমিয়ে ছিলেন। ভোর ৪টার দিকে অফিসাররা অতর্কিতে সার্কিট হাউস আক্রমণ করে। ওই আক্রমণের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, তাতে কোনো সৈনিক, জেসিও বা এনসিওকে সরাসরি জড়ানো হয়নি। জুনিয়র অফিসাররা নিজেরাই দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রথমে সার্কিট হাউসে রকেট ল্যাঞ্চার নিক্ষেপ করে। পরে এক গ্রুপ গুলি করতে করতে ঝড়ের বেগে সার্কিট হাউসে ঢুকে পড়ে। গুলির শব্দ শুনে জিয়া রুম থেকে বের হয়ে আসেন এবং কয়েকজন অফিসার তাঁকে ঘিরে দাঁড়ায়। ওই সময় লে. কর্নেল মতিউর রহমান মাতাল অবস্থায় টলতে টলতে 'জিয়া কোথায়, জিয়া কোথায়' বলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে আসে এবং পলকেই গজখানেক সামনে থেকে তার চাইনিজ স্টেনগানের এক ম্যাগজিন (২৮টি) গুলি জিয়ার উপর চালিয়ে দেয়। অন্তত ২০টি বুলেট জিয়ার শরীরে বিদ্ধ হয় এবং পুরো শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। উপস্থিত অন্য অফিসাররা ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যায়। তারা কোনো গুলি ছোড়েনি। শুধু দুএকজন অফিসার 'কী করছেন, কী করছেন' বলে চিৎকার করে ওঠেন। কিন্তু ততক্ষণে প্রেসিডেন্ট জিয়া মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন।

লে. কর্নেল মতির ক্ষোভের কারণ ছিল ভিন্ন

থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত থাকা অবস্থায় ঢাকায় এলে (১৯৯১ সালে) আমি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে মেজর খালেদ ও মুজাফফরের সঙ্গে আমার আলোচনা বিস্তারিতভাবে অবহিত করি। যেসব অফিসারের উপস্থিতিতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে জেনারেল জিয়াকে হত্যা করা হয় তাঁদের মধ্যে একমাত্র মেজর খালেদ ও মেজর মুজাফফরই তখন জীবিত ছিলেন। লে. কর্নেল মতিউর রহমান এবং লে. কর্নেল মাহবুব দুজন পালিয়ে যাওয়ার সময় মানিকছড়ির কাছে গোলাগুলিতে নিহত হন। মুজাফফর ও খালেদ পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে মুজাফফর ভারতে এবং খালেদ ব্যাংককে চলে যান। বাকিদের কোর্ট মার্শালে ফাঁসি দেওয়া হয়। ১৯৯৩ সালে খালেদ ব্যাংককে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান এবং তাঁর লাশ ঢাকায় পাঠানো হয়।

বস্তুত ঘটনার পরদিন মঞ্জুরের সঙ্গে কথা হওয়ার পর আমি বুঝতে পারি, মঞ্জুর জিয়াহত্যার সঙ্গে জড়িত নয় এবং পরে মেজর খালেদের কাছ থেকেও জানতে পারি যে, আমার ধারণাই সঠিক। আমার মনে হয়, জিয়াকে হত্যার পেছনে লে. কর্নেল মতির ক্রোধ ও আক্রোশের কারণ ছিল অন্যত্র। ১৯৮১ সালের মে মাসের প্রথম দিকে আমেরিকাতে সামরিক প্রশিক্ষণে মনোনয়নের জন্য তৎকালীন লে. ক. মতিউর রহমান, লে. কর্নেল ইমামুজ্জামান (বর্তমানে মেজর জেনারেল) ও পাকিস্তান-প্রত্যাগত লে. কর্নেল সাখাওয়াত (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার)সহ ৫ জনকে একত্রে সেনাসদরে বাছাইয়ের জন্য ডাকা হয়। এঁদের মধ্যে সাখাওয়াত ছিলেন ১০ মার্চ ১৯৮১ সালে এরশাদ কর্তৃক মনোনীত একটি কোর্ট মার্শালের প্রসিকিউটর, যেখানে ষড়যন্ত্র ও অভ্যুত্থান পরিকল্পনার দায়ে মুক্তিযোদ্ধা অফিসার লে. ক. নুরুন্নবী বীর বিক্রম, কর্নেল দিদার ও একজন বেসামরিক ব্যাংকার মনির হোসেনের বিচার হয়েছিল। কোর্ট মার্শালে লে. ক. নুরুন্নবীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত এবং এক বছরের কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়। দিদারকে ১০ বছরের জেল এবং মনির হোসেনকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সেনাপ্রধান ইমামুজ্জামান ও মতিকে বাদ দিয়ে সাখাওয়াতকে আমেরিকায় প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করেন, যদিও যোগ্যতাবলে বাকি এক অফিসার সাখাওয়াতের চেয়ে ভালো ছিল বলে অনেকের ধারণা। মনোনয়ন না পেয়ে মতিউর রহমান অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হন এবং ওইদিনই বঙ্গভবনে গিয়ে জিয়ার সামরিক সচিব মেজর জেনারেল সাদেকের সঙ্গে দেখা করেন। মনোনয়নে অনিয়মের কথা তিনি সরাসরি জেনারেল সাদেককে বলেন। তিনি আরো অভিযোগ করেন, মুক্তিযোদ্ধা অফিসারগণ আর্মিতে হয়রানির শিকার হচ্ছেন এবং বিষয়টি রাষ্ট্রপতিকে জানানোর জন্য জেনারেল সাদেককে অনুরোধ করেন। জিয়াহত্যার পরদিন সকালেই কথা প্রসঙ্গে জেনারেল সাদেক আমাকে মতিউর রহমানের ক্ষোভের বিষয়টি অবহিত করেন। জেনারেল সাদেক আরো বলেন, মতিই সম্ভবত জেনারেল জিয়াকে হত্যা করেছে।

মঞ্জুর জিয়া হত্যায় সরাসরি জড়িত ছিলেন না

আমি ভালোভাবেই জানতাম, রাষ্ট্রপতি জিয়াহত্যা কোনো পরিকল্পিত সামরিক অভ্যুত্থান বা বিদ্রোহ ছিল না। এটা ছিল কিছু তরুণ সেনা-অফিসারের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ এবং তা ক্ষমতাদখলের জন্য ছিল না। রাষ্ট্রপতি

জিয়াহত্যার পর জেনারেল মঞ্জুরের অধীনস্থ অফিসারগণ যখন তাঁর কাছে গিয়ে এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানান, তখন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন ডিভিশন কমান্ডার হিসেবে তিনি ওই ঘটনার দায়দায়িত্ব নিতে বাধ্য হন। তাঁর অধীনের অফিসারগণ যদিও তাঁর অজান্তে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তবুও একজন সামরিক অধিনায়ক হিসেবে তাঁকেই ওই ঘটনার জন্য দায়ী করা হতো। তা ছাড়া এই হত্যাকাণ্ডে তিনি যে জড়িত নন, সহজভাবে তা বিশ্বাসযোগ্য হতো না। অথচ জেনারেল মঞ্জুরকে পলাতক অবস্থা থেকে ধরে এনে কোনো তদন্ত ছাড়াই সুপরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রপূর্বক ঠাণ্ডা মাথায় অন্তরীণ অবস্থাতেই হত্যা করা হয়। হত্যার পর তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে জিয়াহত্যার জন্য দায়ী করা হয়। জেনারেল মঞ্জুরকে অন্তরীণ অবস্থায় হত্যার কারণ হলো, নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচার হলে জিয়াহত্যার ষড়যন্ত্রের আদ্যোপান্ত প্রকাশ পেয়ে যেত। আর তাঁকে হত্যা করা না হলে ভবিষ্যতে অনেকের স্বার্থসিদ্ধির পথ হতো কণ্টকময়।

৩০ মে জিয়াহত্যার পর সেনাসদরে আমার সঙ্গে মঞ্জুরের ফোনে কথোপকথন থেকে আমি বুঝতে পারি তিনি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন না। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই অধিনায়ক হিসেবে তাঁকে এই হত্যাকান্ডের দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছিল। আমার এই ধারণা আমি আর্মি হেডকোয়ার্টারে সেনাপ্রধান এরশাদসহ আমার অন্য সহকর্মী, পিএসওদের সামনে ব্যক্ত করি। কিন্তু তাঁরা বিভিন্নভাবে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বেই ওই হত্যাকাণ্ড ঘটে।

এ ছাড়া বেশ তড়িঘড়ি করেই ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মঞ্জুরকে জড়িত করে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে প্রচারণা শুরু হয়ে যায়। যদিও আমি মতপ্রকাশ করি যে, কোনোপ্রকার খোঁজখবর না করেই রেডিও-টিভিতে এরকম প্রচারণা ঠিক নয়।

মঞ্জুর যে জিয়াহত্যায় জড়িত ছিলেন না তা আরো দুটি ঘটনা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। ৩০ মে ভোরে যখন মঞ্জুরকে জিয়াহত্যার খবর দেওয়া হয় তখন তিনি বাসায় ঘুমিয়ে ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী যখন শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন তখন তাঁরা স্লিপিং ড্রেস পরা ছিলেন।

আরেকটি ঘটনা হলো, ওই হত্যাকাণ্ডের সময় দুজন অফিসার, একজন পুলিশ ও চারজন গার্ড রেজিমেন্টের সদস্য মারা যান। ঢাকা থেকে যাওয়া প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের আহত ও নিহত সৈন্যদের পেনশনাদির জন্য পরে তাদের ইউনিটে একটি লোকাল কোর্ট অফ ইনকোয়ারি করা হয়। অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে সেই কোর্ট অফ ইনকোয়ারির রিপোর্ট আমার গোচরে আসে। ওই রিপোর্টে গার্ড রেজিমেন্টের দুজন সদস্যের বক্তব্য বেশ প্রণিধানযোগ্য। তাদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, জিয়াহত্যার পর বিদ্রোহীরা গার্ড রেজিমেন্টের সদস্যদের সার্কিট হাউস থেকে একটি গাড়িতে করে চট্টগ্রাম

সেনানিবাসে নিয়ে যান। বিদ্রোহে জড়িত অফিসাররা তাঁদের গাড়িতে তোলার আগে এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন যে, সেনানিবাসে যাওয়ার পর তাঁরা যেন কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলেন। তবে যদি জিওসি জেনারেল মঞ্জুর এসে তাঁদের কাছে সার্কিট হাউসের ওই রাতের ঘটনা জানতে চান তা হলে তাঁরা যেন বলেন, 'ঝড়বৃষ্টি এবং অন্ধকারের কারণে কারা গোলাগুলি করেছে আমরা দেখিনি।'

মঞ্জুরহত্যা ছিল পরিকল্পিত

এসব ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, জেনারেল মঞ্জুরের অজ্ঞাতসারেই ওই হত্যাকাণ্ড ঘটে। বস্তুত জিয়াহত্যার পর থেকেই জেনারেল এরশাদ ক্ষমতাদখলের পাঁয়তারা শুরু করেন। তৎকালীন কিছু-কিছু রাজনীতিবিদের আনাগোনাও শুরু হয়ে যায় সেনানিবাসে। আর এসব লোকের ক্ষমতার পথ কণ্টকহীন করতেই বলির পাঁঠা হতে হয় জেনারেল মঞ্জুরকে। অথচ সেনাবাহিনীতে রটানো হয় যে, মেজর জেনারেল মঞ্জুরকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে সিপাহিরা হত্যা করেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মঞ্জুর-হত্যার খবর পাই আমার তৎকালীন সহকর্মী সিজিএস মেজর জেনারেল নুরুদ্দীনের কাছ থেকে। ঐদিন দুপুরে তাঁর অফিসে আমি নিজ থেকে যখন মঞ্জুর সম্পর্কে জানতে চাই তখন তিনি আমাকে বলেন, 'মঞ্জুরকে স্কট করে সেনানিবাসের ভিতর দিয়ে অন্তরীণ করার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় সৈনিকরা তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করেছে।' এর আগ পর্যন্ত আমি জানতাম, মঞ্জুরকে আটক করে সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মূলত জেনারেল মঞ্জুরকে হত্যা করা হয়েছে ক্ষমতালোভী, উচ্চাভিলাষী, ষড়যন্ত্রকারী ও কিছু অমুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে। এটা সুদূরপ্রসারি ষড়যন্ত্রের ফল। বর্তমানে মঞ্জুর হত্যা মামলা আদালতে বিচারাধীন।

আর্মির মুক্তিযোদ্ধা অফিসার নিধনের নীলনকশা

দুই-তিন দিনের মধ্যে চট্টগ্রামের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। আমি দেখলাম জিয়া-হত্যার সুযোগে জেনারেল এরশাদ ও অমুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র

কয়েকজন অফিসার মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের শায়েস্তা ও সেনাবাহিনী থেকে অপসারণের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছেন। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের এরা সন্দেহ ও হয়রানি করতে লাগল আরো বেশি করে। তারা আমাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। আমার বাসার চারদিকে সিভিল ড্রেসে ডিজিএফআই-এর লোকজন লাগানো হলো। খোলাখুলিভাবে আমাকে অনেকটা নজরবন্দির মতো রাখা হলো। জেনারেল জিয়া নিহত হওয়ার পর বিচারপতি সাত্তার যদিও রাষ্ট্রপতি ছিলেন, কিন্তু কার্যত এরশাদ সব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেলেন। তিনি নিজের লোকদের পছন্দমাফিক গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল করে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের কোণঠাসা করতে লাগলেন বিনা বাধায়।

জেনারেল এরশাদের আদেশে জিয়াহত্যার পর গ্রেপ্তারকৃত অফিসারদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো যাতে করে তাদের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শাল করা যায়। তদন্ত কমিটি গঠন করার সময় যখন তদন্তের বিষয় নিশ্চিত করার আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল তখন আমি প্রস্তাব দিই যে, কী কারণে অফিসাররা ওই বিদ্রোহ করল তাও এ তদন্তের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অকারণে কখনও বিদ্রোহ হয় না। কিন্তু তৎকালীন সেনাপ্রধান এরশাদ আমার ওই প্রস্তাব অনুমোদন করেননি। তাই অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে ওই তদন্তের আদেশে আমার স্বাক্ষর করার কথা থাকলেও আমি তা করতে অস্বীকৃতি জানাই। ফলে জেনারেল এরশাদ নিজেই ওই তদন্ত আদেশে স্বাক্ষর করেন। খুব তাড়াহুড়া করেই তদন্ত কমিটি গঠিত হলো। তৎকালীন মেজর জেনারেল (বর্তমান অবঃ) মোজাম্মেলের সভাপতিত্বে তদন্ত অনুষ্ঠিত হলো। তদন্তে ৩৩ জন অফিসার ও দুজন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারকে কোর্ট মার্শাল করার জন্য সুপারিশ করা হলো। এরা প্রায় সবাই মুক্তিযোদ্ধা। তারপর তাদের কোর্ট মার্শালের জন্য একটি কোর্ট গঠন করা হলো। কোর্ট মার্শালের সভাপতি করা হলো তৎকালীন মেজর জেনারেল (বর্তমানে মৃত) আব্দুর রহমানকে। সব আইনকানুন ও নিয়মনীতি ভঙ্গ করে চট্টগ্রামের বেসামরিক জেলখানায় বিচারকার্য চলে। অভিযুক্তদের ভালোভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই বিচার করা হয়। তদন্তের সময় তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগও ওঠে। সামরিক আইন অনুযায়ী বেসামরিক আইনজীবীরাও এরকম কোর্ট মার্শালে অভিযুক্তদের পক্ষে কৌসুলি নিয়োজিত হতে পারেন। কিন্তু তাদের কোনোরূপ সুযোগ-সুবিধা না দিয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজেদের ইচ্ছামতো সেনাবাহিনীর অফিসার দ্বারা অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করে দেন। এতে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আগে থেকেই এ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এ প্রহসনের কোর্ট মার্শালে ১৩ জন অফিসারের ফাঁসি এবং ১৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। দুজন জুনিয়র কমিশন্ড

অফিসারকে ইচ্ছাকৃতভাবে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, যাতে করে মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক এনসিও ও জেসিওদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়। কেননা, জুনিয়র কমিশন্ড অফিসাররা সৈনিক থেকে পদোন্নতি পেয়ে থাকেন।

আমার বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা নিয়োগ

যেহেতু আমি অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল তাই নিয়ম অনুসারে আমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে কোর্ট মার্শাল হওয়ার কথা। অথচ, আমাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে না জানিয়ে এবং না জড়িয়ে সেনাবাহিনীর প্রচলিত আইন ভেঙে ওইসব কোর্ট মার্শাল ও তদন্ত করা হয়। এদিকে আমার পেছনে সর্বক্ষণ গোয়েন্দা। আমার টেলিফোনে আড়িপাতা হচ্ছে। ২৪ ঘণ্টা বাসাতে আমার চালচলন পর্যবেক্ষণের জন্য সামরিক গোয়েন্দারা গাড়িতে ওয়্যারলেস লাগিয়ে পাহারা দিচ্ছে। একপর্যায়ে একদিন আমি গোয়েন্দাদের সার্বক্ষণিক পাহারায় অতিষ্ঠ হয়ে টেলিফোনে খুব রূঢ় ভাষায় সামরিক গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল মহব্বতজান চৌধুরী (পরে এরশাদের মন্ত্রী) ও সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদকে বিষয়টি অবহিত করি। তাঁরা দুজন এমন ভান করলেন যেন তাঁদের অজান্তেই আমার ওপর নজরদারি হচ্ছে। বস্তুত তাঁদের অজান্তে এমনটি হবে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ

এদিকে অভিযুক্ত ওইসব মুক্তিযোদ্ধা আর্মি অফিসারদের নিকটতম আত্মীয়স্বজন আমার কাছে এসে তাঁদের খবরাখবর জানতে চাইতেন। কারণ, আমি তখনও অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল ও সেনাসদরে একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা পিএসও। তা ছাড়া সেনাসদরের অন্য অফিসাররা কোনোরূপ বিপদে জড়ানোর ভয়ে এসব লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে সাহস পেতেন না। কোর্ট মার্শাল আইনে অভিযুক্ত ১৩ জন অফিসারের ফাঁসির রায় হয়ে গেলে আমি জানতাম কোনো আপিলের সুযোগ না দিয়ে তাড়াহুড়ো করে তাঁদের ফাঁসি কার্যকর করা হবে। তাই শেষ চেষ্টা হিসেবে আমি মনস্থির করলাম এ ব্যাপারে জেনারেল ওসমানীর সাহায্য নেব। যেহেতু আমার পেছনে সর্বদা গোয়েন্দা লাগানো, তাই

খোলাখুলিভাবে জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা না করে বিকল্প পন্থা খুঁজলাম। আমার আত্মীয় কায়সার রশীদ চৌধুরীর (স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর ভাই, বর্তমানে প্রয়াত) ধানমণ্ডির ২নং সড়কের বাড়ির পেছনে আরেকটি বাড়িতে থাকতেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মহাপরিচালক (পরে রাষ্ট্রদূত ও পররাষ্ট্র সচিব) মুফলেহ ওসমানী। তিনি জেনারেল ওসমানীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। দুই বাড়ির পেছনের দিকে শুধু একটা দেয়াল। একদিন আমি জেনারেল ওসমানীকে মুফলেহ ওসমানীর বাসায় রাত ১২টায় উপস্থিত থাকতে গোপনে খবর পাঠাই। রাতে আমি সেনাবাহিনীর গাড়ি নিয়ে কায়সার রশীদের বাড়িতে যাই। গোয়েন্দাদের দুটি গাড়ি সেনানিবাস থেকেই আমার পিছু নিল। আমি কায়সার রশীদের বাসায় প্রবেশ করি এবং পেছন দিয়ে দেয়াল টপকে মুফলেহ ওসমানীর বাড়িতে ঢুকি। আমি তাঁদের রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকি। মুফলেহ ওসমানীর স্ত্রী মিসেস শিরিন আমাকে ওই অবস্থায় দেখে আঁতকে ওঠেন। যাহোক, একটু পরে জেনারেল ওসমানী ওই বাসায় আসেন।

আমার সঙ্গে কথা বলার সময় জেনারেল ওসমানীকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল এবং তিনি শুধু এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি মুফলেহ ওসমানীকে পাশের রুমে চলে যেতে বললেন। আমি কোনো ভূমিকা ছাড়াই তাঁকে সোজাসুজি অনুরোধ করি, সেই রাতেই তিনি যেন পত্রিকায় এই বলে একটি বিবৃতি দেন যে, 'রাষ্ট্রপতি জিয়া-হত্যার কোর্ট মার্শালে সেনাবাহিনীর আইনকানুন ভেঙে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের বিচার করা হয়েছে, যা ঠিক হয়নি। এই বিচার মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের শায়েস্তা করা ও চাকরি থেকে অপসারণ করার জন্যই করা হয়েছে।' আমি তাঁকে আক্ষরিক অর্থে কাকুতি-মিনতি করে বোঝাতে চেষ্টা করি যে, মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের নিধনের জন্য প্রহসনমূলকভাবে ওই কোর্ট মার্শাল করা হয়েছে। তারা কোনো ন্যায়বিচার পাচ্ছে না। তিনি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'তুমি দেশে হানাহানি শুরু করাতে চাও নাকি?' আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বলি যে, শুধু সুবিচারের জন্য এবং নির্দোষ ছেলেদের জীবন বাঁচানোর জন্য আমি একটা উপায় খুঁজছি এবং আপনার কাছে এসেছি। এরপর তিনি উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে বসলেন, 'তা হলে তোমরা (মুক্তিযুদ্ধার) দুবছরের সিনিয়রিটি নিলে কেন? সেজন্যই আজ এত গণ্ডগোল হচ্ছে, তারা প্রতিশোধ নিচ্ছে' ইত্যাদি। আমি প্রত্যুত্তরে বললাম, ওই প্রশ্নে যদি যেতে চান তা হলে তা পরে হবে। দয়া করে এই মুহূর্তে নিষ্পাপ প্রাণগুলো বাঁচানোর চেষ্টা করুন।

আমি কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ওসমানী ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে রেখে চলে গেলেন। তাঁর আচরণে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কী করব কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এখনও মনে পড়ে, আমি হতবাক হয়ে মাথায় হাত

দিয়ে বসে পড়লাম। উনি চলে যেতেই মুফলেহ্ ওসমানী রুমে এসে ঢুকলেন। মুফলেহ্ ওসমানীকে আক্ষেপ করে বললাম, ছেলেগুলোকে আর বাঁচানো গেলো না! তিনি বললেন, আমিও ভেবেছিলাম এপথে সফল হবেন না। তিনি আরো কিছু কথা বললেন, যা আজ আর বলতে চাই না। জেনারেল ওসমানীর নিকটাত্মীয়ের মুখে ওইসব কথা শুনে আমি ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

বিচার সম্পর্কে কোনো কথা না বলেও জেনারেল ওসমানী পরে বিবৃতি দিয়ে রাষ্ট্রপতি সাত্তারের কাছে ওদের প্রাণদণ্ড মওকুফের জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি সাত্তার সে আবেদনে সাড়া দেননি, প্রাণদণ্ড মওকুফ করেননি। এদিকে জেনারেল এরশাদ ও তাঁর আর্মি সহচরগণ ক্যান্টনমেন্ট ও অন্যান্য জায়গায় প্রচার করতে লাগলেন যে, খালেদা জিয়া এ ফাঁসি তাড়াতাড়ি কার্যকর করার জন্য চাপ দিচ্ছেন। খালেদা জিয়ার চারপাশে তখন এরশাদের লোকজন এবং তাঁকে ওঁরাই নিজেদের মতো করে খোঁজখবর দিচ্ছিলেন এবং বোঝাচ্ছিলেন।

যাহোক, ঢাকার কয়েকজন আইনজীবী ওই কোর্ট মার্শাল ও এর রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন। কিন্তু হাইকোর্ট সেই আপিল গ্রহণ করতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানায়। তখন ক্যান্টনমেন্ট থেকে নানা অজুহাতে বিচারপতিদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছিল বলে শোনা যায়। শেষ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলখানায় নির্দয়ভাবে দণ্ডপ্রাপ্তদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। এমনকি ফাঁসির সময় তাঁদের নিকটতম আত্মীয়স্বজনকে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেও দেওয়া হয়নি। ফাঁসির পর কোনো কোনো শহরে ছোটখাটো মিছিল, প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে দেশব্যাপী ব্যাপকভিত্তিক কোনো জোরালো প্রতিবাদ কিংবা প্রতিক্রিয়া হয়নি ওই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। সে সময় ওইসব মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের ছেলেমেয়ে ও পরিবার-পরিজন অসহায়ের মতো শহরে ঘোরাঘুরি করতেন।

মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের বিরুদ্ধে আরো পদক্ষেপ

মুক্তিযোদ্ধানিধনের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে জেনারেল এরশাদ ও তাঁর সহচরগণ পাকিস্তান-প্রত্যাগত মেজর জেনারেল (বর্তমানে অবঃ) সামাদকে সভাপতি করে প্রহসনমূলকভাবে মুক্তিযোদ্ধা আর্মি অফিসার ছাঁটাই করার জন্য একটি বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ডের মাধ্যমে আরো প্রায় ৬০ জন মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে বিভিন্ন অজুহাতে সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ ছাড়া

আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা অফিসার পরিস্থিতির চাপে অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। পরবর্তী সরকারসমূহ এসব মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে কেন ও কী কারণে ফাঁসি, জেল ও চাকরিচ্যুত করা হলো তার কোনো নিরপেক্ষ তদন্তের আগ্রহ দেখায়নি কিংবা একটু উদ্বেগও প্রকাশ করেনি। এসব সরকার স্বাধীনতার বর্ষপূর্তিতে এবং অন্যান্য সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অভ্যর্থনা, সনদ বিতরণ ও তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে শুধু মোনাজাত, সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। বস্তুত এটা এখন একটা উৎসবের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এসব ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তান থেকে আগত কিছু উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসার মুক্তিযোদ্ধাবিরোধী সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তি ও রাজনীতিবিদদের সহযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের দুই বছরের জ্যেষ্ঠতা প্রাপ্তি, পদোন্নতি ইত্যাদির জন্য বিগত কয়েক বছরের সঞ্চিত ক্ষোভ ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় রাষ্ট্রপতি জিয়াহত্যার অজুহাতে। যদিও জিয়াহত্যার সময় মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল ছিলেন একজন ডাক্তারসহ চারজন। আর পাকিস্তান থেকে ১৯৭৩ সালে আগতদের মধ্যে সেনাপ্রধান এরশাদসহ ছিলেন ১৪ জন জেনারেল।

আগেই বলেছি, এসব ঘটনার প্রাক্কালে আমিই ছিলাম ঢাকা সেনাসদরে একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল। বাকি সবাই পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত। সুপ্রিম হেডকোয়ার্টারে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী। রাষ্ট্রপতি জিয়াহত্যার পর তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে লে. জেনারেল করা হলো এবং সেনাবাহিনী থেকে অবসর দিয়ে কায়রোতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগের জন্য তাঁর চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হলো। জেনারেল মীর শওকতের অবসরগ্রহণের পর ডাক্তার মেজর জেনারেল শামসুল হক (পরে এরশাদের মন্ত্রী এবং বর্তমানে জাতীয় পার্টির সঙ্গে জড়িত) ছাড়া আমিই তখন আর্মিতে একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল। তদন্তের সময় রাষ্ট্রপতি জিয়াহত্যায় আমাকেও জড়ানোর চেষ্টা চলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে জড়ানো সম্ভব হয়নি। যশোর থেকে জনৈক লে. কর্নেল মুজিবকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল এভাবে যে, রাষ্ট্রপতি জিয়াহত্যার পরপরই আমি আর্মির মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের আরেকটা অভ্যুত্থানের জন্য সংগঠিত করতে চেষ্টা করি, যা ছিল ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

আর্মি হেডকোয়ার্টারে আমাকে মোটামুটিভাবে বিচ্ছিন্ন করা হলো। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো সভা, সিদ্ধান্ত ইত্যাদির কিছুই আমাকে জানানো হতো না। জিয়াহত্যার কোর্ট অফ ইনকোয়ারি এবং কোর্ট মার্শালের কাগজপত্রে অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে যেমন আমার অভিমত নেওয়া হয়নি তেমনি

মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের আর্মি থেকে ছাঁটাইয়ের জন্য যে তালিকা তৈরি করা হয় সে বিষয়েও আমার সঙ্গে আলাপ করা হয়নি।

আগেই বলেছি, আমার পেছনে সর্বদা সামরিক গোয়েন্দা লেগে ছিল এবং টেলিফোনে আড়িপাতা হচ্ছিল। বস্তুতপক্ষে এসবের মাধ্যমে আর্মি হেডকোয়ার্টারে অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে আমাকে অফিসের কোনো কাজকর্ম করতে না দেওয়ার জন্য এ পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছিল। একজন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন পেশাদার সৈনিক হিসেবে আর্মিতে আমার এরূপ অবস্থান অপমানজনক। ফলে কাজ করা দুঃসহ হয়ে উঠছিল। ওই পরিস্থিতিতে আমি সেনাপ্রধান এরশাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করি। কিন্তু এর কোনো প্রতিকার করার মতো সদিচ্ছা তাঁর ছিল বলে আমার মনে হয়নি।

বিমানবাহিনী প্রধান সদরুদ্দীনের পদত্যাগ

ওই সময় বিমানবাহিনীর তৎকালীন প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দীন বিমানবাহিনীর একজন সিনিয়র অফিসারের বদলির ফাইল নিয়ে রাষ্ট্রপতি সাত্তারের কাছে যান। কিন্তু রাষ্ট্রপতি সাত্তার ওই বদলি অনুমোদন না করে ফাইলটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তাঁর কাছে পাঠানোর জন্য বলেন। সদরুদ্দীন তাতে অপমানিত বোধ করেন এবং বলেন, সিনিয়র অফিসারদের বদলি সামরিক প্রধানরা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করেই করে থাকে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার সময়ও তাই হয়েছিল। আমি বিমানবাহিনীর প্রধান এবং আপনি আমার সুপ্রিম কমান্ডার ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী, তাই বিষয়টি নিয়ে আপনার আমার সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করা উচিত।

তার পরও রাষ্ট্রপতি সাত্তার ফাইলটি অনুমোদন করতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং বিরক্তির সঙ্গে ফাইলটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তাঁর কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে উত্তপ্ত বাগ্‌বিতণ্ডা হয় এবং একপর্যায়ে সদরুদ্দীন ফাইলটি তাঁর সামনে ঠেলে দিয়ে বলেন, বিমানবাহিনীর প্রধান হিসেবে আমার প্রতি যদি আপনার কোনো আস্থা না থাকে তাহলে আমি আর এই পদে থাকতে চাই না। আপনি অন্য একজন এয়ার চিফ নিয়োগ করুন। এই বলে তিনি রাষ্ট্রপতির অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ওইদিনই পদত্যাগ করেন।

এ থেকে বোঝা যায় যে-সিনিয়র অফিসারের বদলির জন্য সদরুদ্দীন রাষ্ট্রপতি সাত্তারের কাছে গিয়েছিলেন তাঁর সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে কেউ আগেই

অবহিত করেছিল যাতে ওই বদলি কার্যকর করা না হয়। যাহোক, পরে রাষ্ট্রপতি সাত্তার এরশাদের সঙ্গে পরামর্শ করে সদরুদ্দিনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন।

সদরুদ্দীন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতাম। তিনি অত্যন্ত সৎ, দক্ষ, দেশপ্রেমিক ও একজন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন অফিসার ছিলেন। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'অ্যান অনেস্ট ম্যান ডাজ নট মেক হিমসেলফ এ ডগ ফর দি সেক অফ এ বোন'। সৎ, সাহসী, দক্ষ ও চরিত্রবান লোকের মূল্যায়ন আমাদের সমাজে নেই। বর্তমানে তিনি আমেরিকায় বসবাস করছেন।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, সদরুদ্দীনের ঘটনার ঠিক ১৫ বছর পর ১৯৯৬ সালের মে মাসে দুজন অফিসারকে অবসর দেওয়ার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস ও সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিমের দ্বন্দ্বের ফলে দেশে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিমের সঙ্গে আলোচনা না করেই দুজন অফিসারকে প্রশাসনিকভাবে বাধ্যতামূলক অবসর দেন। জেনারেল নাসিম এতে ক্ষুব্ধ হয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে ওই আদেশ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। রাষ্ট্রপতি তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং ওই দুই অফিসারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ তোলেন।

তার পরের ঘটনা সবার জানা। জেনারেল নাসিম তাঁর তথাকথিত অনুগতদের বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে ঢাকায় জড়ো করার চেষ্টা করেন যা বিদ্রোহের শামিল। ফলস্বরূপ তাঁকে বরখাস্ত ও সেনাবাহিনীর দ্বারাই বন্দি করা হয়। তাঁর এই অনৈতিক কাজের জন্য আরো কয়েকজন অফিসারের চাকরি খোয়া যায়।

অথচ সেনাপ্রধান হিসেবে জেনারেল নাসিমের উচিত ছিল রাষ্ট্রপতি যেহেতু তাঁর ওপর আস্থা দেখাননি, এমনকি তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করেছেন ; তখন একজন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন অফিসার হিসেবে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করা। যেমনটি এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দীন ১৫ বছর আগেই করেছেন। তা করলে জেনারেল নাসিমকে পরবর্তী সময়ের অপমানজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হতো না এবং আরো অনেকগুলো অফিসারের চাকরিও যেত না।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয় আমার চাকরি

যাহোক, আবার নিজের কথায় ফিরে আসি। পরিশেষে '৮১ সালের অক্টোবর মাসে আমার চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। আমাকে প্রেষণে

রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগের জন্য এ মর্মে রাষ্ট্রপতির এক আদেশ জারি করা হলো যে, 'মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, বীর বিক্রমের চাকরি পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত "জাতীয় স্বার্থে" রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হলো।' এদিকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে আসছিল এবং বিএনপির প্রায় মন্ত্রী ও নেতারা এবং অন্য অনেক রাজনীতিবিদ ও মুখচেনা লোক সেনাপ্রধান এরশাদের কার্যালয়ে খোলাখুলিভাবে যাতায়াত করতে শুরু করল। এ থেকে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, সেনাপ্রধান এরশাদের ইঙ্গিতেই দেশ চলছিল এবং দেশের ক্ষমতা দখল তাঁর জন্য সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এরশাদের প্রকাশ্য তৎপরতা

১৯৮১ সালের নভেম্বরে দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী এবং ড. কামাল হোসেন ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী। নির্বাচনে সেনাবাহিনী বিএনপি প্রার্থী সাত্তারকে খোলাখুলি সমর্থন দিল। সাত্তার রাষ্ট্রপতি পদে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি সাত্তারের ক্ষমতাগ্রহণের পর সেনাপ্রধান লে. জেনারেল এরশাদ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে দেশে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন এবং রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা রাখা উচিত বলে দাবি তোলেন। চাকরিরত একজন সেনাপ্রধান একজন রাষ্ট্রপতির কাছে পত্রিকায় প্রবন্ধের মাধ্যমে এরকম দাবি তুলে ধরায় অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হন। সেনাপ্রধান এরশাদের প্রবন্ধটি ছাপা হওয়ার পর জেনারেল ওসমানী পত্রিকার মাধ্যমে তার সমালোচনা করে বলেন যে, এটা গণতন্ত্রবিরোধী। কিন্তু এর পরের দিনই লে. জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন (অবঃ) পত্রিকাতে আরেকটি প্রবন্ধের মাধ্যমে সেনাপ্রধান এরশাদকে সমর্থন করেন এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন এবং রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা থাকা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনের কথা আগেই বলেছি। ১৯৭৩ সালে পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগমনের দিন জেনারেল ওসমানী তাঁকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এবং পরে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। যাহোক, ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ

ক্ষমতাদখলের পর জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেন।

এদিকে রাষ্ট্রপতি সাত্তারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও দলাদলি চরম পর্যায়ে পৌঁছে। এ সুযোগে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতালাভের পথও সহজ হয়ে উঠছিল। বিএনপির অনেক নেতা, মন্ত্রী এবং কয়েকজন সচিব ও বিভিন্ন দলের পরিচিত লোকজন জেনারেল এরশাদের সঙ্গে গোপনে এবং সময় সময় খোলাখুলিভাবে বৈঠক ও শলাপরামর্শ করতেন। পরে এঁদের অনেকেই এরশাদের মন্ত্রিসভার সদস্য হন এবং বিভিন্ন রকম ফায়দা লুটেন। এসব কার্যকলাপে সামরিক গোয়েন্দাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল মহব্বতজান চৌধুরী ও আরো কিছু উচ্চাভিলাষী সামরিক কর্মকর্তা অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। এঁরাই কয়েকজন রাজনীতিবিদ ও কয়েকজন সচিবের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতালাভের পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দিচ্ছিলেন। জেনারেল এরশাদের ক্ষমতাদখলের পর এসব মন্ত্রী, সচিব ও রাজনীতিবিদগণ নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন।

জেনারেল এরশাদের ক্ষমতাদখলের পাঁয়তারা তেমন কোনো গোপন বিষয় ছিল না। কারণ পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ, বেসামরিক কর্মকর্তা ও আর্মির সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে তাঁর কার্যকলাপ ছিল মূলত তৎকালীন সরকারের প্রতি চরম অবজ্ঞাসূচক। যদিও রাষ্ট্রপতি সাত্তার এসব বিষয়ে অবগত ছিলেন কিন্তু সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে কোনোকিছু করার মতো ক্ষমতা তাঁর সরকারের ছিল না। আর্মিকে মোটামুটি মুক্তিযোদ্ধাবিহীন করে পুরো আর্মিকে এরশাদ তাঁর কব্জায় নিয়ে আসেন। বলতে গেলে ওই সময় আর্মিতে তৎকালীন সরকারের কোনো প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণই ছিল না।

আমার চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হওয়ার পরও আমি সেনানিবাসে আমার আগের বাড়িতেই অবস্থান করছিলাম। সেনাবাহিনীর অফিসারগণ ও অন্যান্য লোকজন আমার বাড়িতে তেমন আসতেন না। কারণ, তখনও আমার বাড়ি সর্বক্ষণ গোয়েন্দা বাহিনীর পর্যবেক্ষণে ছিল। তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক আমাকে জানালেন সরকার আমাকে ফিলিপাইনে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত করেছে। তিনি আমাকে তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর (বর্তমানে স্পিকার) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রশাসনিক ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে অতি সত্বর ফিলিপাইনে যাওয়ার জন্য বলেন। আমি এর পরও মাস দুয়েক ইচ্ছে করে ঢাকায় ছিলাম। ওই সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মহাপরিচালক

(প্রশাসন) মহিউদ্দিন আহমেদকে প্রায়ই সামরিক গোয়েন্দা অফিস থেকে তাগাদা দেওয়া হতো যেন আমাকে তাড়াতাড়ি ফিলিপাইনে পাঠানো হয়। এরই মধ্যে ডিসেম্বরের কোনো একদিন আমি রাষ্ট্রপতি সাত্তারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য বঙ্গভবনে যাই। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রপতি সাত্তার আমাকে আগে থেকে ভালোভাবেই জানতেন।

রাষ্ট্রপতি সাত্তারের সঙ্গে সাক্ষাৎ

আমি যখন রাষ্ট্রপতি সাত্তারের অফিসকক্ষে প্রবেশ করি, তখন তাঁকে বিষণ্ন ও বিমর্ষ দেখি। উনি আমাকে নিজে থেকে বলেন যে, এ পরিস্থিতিতে আমার কিছুদিনের জন্য দেশের বাইরে থাকাই শ্রেয়। তখন আমি উত্তরে তাঁকে নির্দ্বিধায় জানাই যে, আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন সেনাপ্রধান এরশাদ মুক্তিযোদ্ধাদের চাকরিচ্যুত ও বিদেশে পাঠিয়ে তাঁর অবস্থান পাকাপোক্ত করছেন এবং শিগ্গিরই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার জন্য তৈরি হচ্ছেন। এর উত্তরে রাষ্ট্রপতি কিছুই বললেন না। তিনি কোনো উত্তর না দেওয়ায় আমি নিজেও অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ফলে অন্য কোনো প্রসঙ্গে না গিয়ে সালাম জানিয়ে তাঁর অফিসকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসি। সেদিন তাঁর চেহারায় একজন অসহায় রাষ্ট্রপতির যে প্রতিকৃতি দেখেছি, অদ্যাবধি আমার স্মৃতিতে তা অটুট আছে।

আজ বলতে হয়, তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী কথা প্রসঙ্গে একদিন আমাকে বলেছেন যে, সামরিক বাহিনী থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেষণে নিয়োগ করার জন্য প্রথমে আমার ফাইল যখন রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়, তখন রাষ্ট্রপতি ফাইল অনুমোদন করেননি এবং ফেরত পাঠিয়ে দেন। পরে সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদের চাপের মুখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি আমাকে বিদেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগের আদেশ অনুমোদন করেন।

খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ

জেনারেল জিয়া ও মঞ্জুরের হত্যার পর আমার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায়। আমি তখন বেশ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম এবং আমাকে মানসিক

চাপের মধ্যে রাখা হয়। আমার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা আমার নিরাপত্তা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন। কারণ মঞ্জুরের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক ও যোগাযোগকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে আভাসে-ইঙ্গিতে জিয়াহত্যার সঙ্গে আমাকে জড়ানোর চেষ্টা করা হয়। আমার প্রতিবেশী বেগম খালেদা জিয়াকে এ ব্যাপারে বিভিন্নভাবে আমার বিরুদ্ধে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়। তাই রাষ্ট্রদূত হিসেবে ফিলিপাইনে যাওয়ার পূর্বে আমি খালেদা জিয়ার সঙ্গে সস্ত্রীক দেখা করার ব্যাপারে মনস্থির করি। মে মাসে রাষ্ট্রপতি জিয়া নিহত হওয়ার পর থেকে আমাদের সঙ্গে তাঁর আর কোনো যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু আমার স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনীহা প্রকাশ করেন। কারণ জেনারেল জিয়া নিহত হওয়ার পর মৃতদেহ যখন সেনানিবাসে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়, তখন আমার স্ত্রী খালেদা জিয়াকে সমবেদনা জানানোর জন্য তাঁর বাড়িতে যান। সেখানে অনেক লোকজনের সামনে খালেদা জিয়া আমার স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, '৩০ মে সকালে মইন ভাইয়ের সঙ্গে জেনারেল মঞ্জুরের কী আলাপ হয়েছিল?' এই প্রশ্ন শুনে আমার স্ত্রী অনেকটা হতভম্ব হয়ে যান এবং উপস্থিত লোকজনের সামনে লজ্জিত হয়ে পড়েন। কারণ, পরোক্ষভাবে এ প্রশ্নের মাধ্যমে আমার স্ত্রীকে অবহিত করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি জিয়াহত্যা সম্পর্কে আমি পূর্ব থেকেই হয়তো অবগত ছিলাম কিংবা ষড়যন্ত্রে জড়িত। বস্তুতপক্ষে আমার সঙ্গে জেনারেল মঞ্জুরের টেলিফোন আলাপ সম্পর্কে আমার স্ত্রী কিছুই জানত না। কারণ, এ সম্পর্কে তাকে আমি কিছুই বলিনি।

খালেদা জিয়ার বাড়ি থেকে তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে আমার স্ত্রী অফিসে ফোন করে আমাকে এ ঘটনা জানান। আমি তখন তাকে মঞ্জুরের সঙ্গে আমার কথোপকথনের সবকিছু খুলে বলি। বেগম খালেদা জিয়ার এ প্রশ্ন থেকে আমার বুঝতে বিলম্ব হলো না যে, মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে জেনারেল এরশাদ এবং তাঁর সহযোগীরা ইতিমধ্যেই তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে এবং তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছিল যে, সেনাবাহিনীর প্রায় সব মুক্তিযোদ্ধা অফিসার রাষ্ট্রপতি জিয়াহত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত। যাহোক, বিশেষ করে ওই কারণেই আমি ফিলিপাইনে যাওয়ার পূর্বে খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মনস্থির করি।

এক সন্ধ্যায় আমি সস্ত্রীক খালেদা জিয়ার বাসায় যাই। বাড়িতে গিয়ে কোনোরকম ভূমিকা না রেখে সরাসরি আমি তাঁকে জানাই যে, আমার স্ত্রী আপনার বাড়িতে আসতে আগ্রহী ছিলেন না। যাহোক, আমি তাঁকে নিয়ে এসেছি ; জুন মাসে রাষ্ট্রপতি জিয়া নিহত হওয়ার পর সমবেদনা জানাতে এলে আপনি আমার স্ত্রীকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তর দেওয়ার জন্য। তবে সে ব্যাপারে কিছু বলার আগে আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৯৭৫

সালের নভেম্বর মাসের ৩ তারিখের কথা। সেদিন জেনারেল জিয়া যখন গৃহবন্দি হলেন আপনার টেলিফোন পেয়ে অসুস্থ শরীরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তখন একমাত্র আমিই আপনার বাড়িতে এসেছিলাম, আর কেউ তো আসেননি। এসব বলার পর তিনি একটু সংকোচ বোধ করছিলেন বলে মনে হলো। এরপর তিনি নিজে থেকে বললেন যে, এখন তিনি সবকিছু ভালোভাবে জানেন এবং জেনারেল মঞ্জুর যে রাষ্ট্রপতি-হত্যায় জড়িত ছিলেন না, তা তিনি বুঝতে পারছেন। কথা প্রসঙ্গে আরো জানতে পারি যে, রাষ্ট্রপতি জিয়াহত্যার পরপর যারা তাকে ভুল ও অসত্য তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেছিল তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখন তিনি ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল। আমি যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসছিলাম তখন তিনি বললেন যে, আপনি এখন দেশে থাকলেই ভালো হতো। আর কোনোকিছু না বলে আমি ও আমার স্ত্রী বিদায় নিয়ে চলে আসি।

আত্মকথা : শেষ পর্ব

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসেবে ফিলিপাইনে যোগদান করি ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসে। সেখানে বসেই খবর পাই মার্চ মাসের ২৪ তারিখ দেশে রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাপ্রধান লে. জেনারেল এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছেন। এ খবর অপ্রত্যাশিত ছিল না। কেননা, ১৯৮১ সালের মে মাসে জেনারেল জিয়াহত্যার পর তাঁর উপরাষ্ট্রপতি সাত্তার নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন বটে ; কিন্তু না ছিলেন তিনি একজন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব কিংবা ছিল না তাঁর তেমন কোনো ব্যাপক রাজনৈতিক প্রভাব। ফলে তিনি সেনাপ্রধান এরশাদ ও আর্মিকে তাঁর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হননি যা আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। তাই জেনারেল এরশাদের ক্ষমতাদখলের প্রক্রিয়া বস্তুতপক্ষে শুরু হয় জেনারেল জিয়াহত্যার পর এবং সে ধারাবাহিকতা চূড়ান্ত রূপ পায় ২৪ মার্চে।

ফিলিপাইনে ছিলাম আট মাসের মতো। সেখান থেকে ইন্দোনেশিয়া হয়ে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াসহ লাওস, নিউজিল্যান্ড, ফিজি ও পাপুয়া নিউগিনিতে প্রেষণে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। দীর্ঘ ১৬ বছর দেশের বাইরে। আমার চাকরিজীবনের প্রধান সময়গুলো কেটেছে সামরিক বাহিনীর বাইরে, দেশের বাইরে। তাই অপেক্ষা করেছি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের জন্য। ১৯৯০ সালে পতন হলো এরশাদ সরকারের। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো

খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে নির্বাচিত বিএনপি সরকার। তাই আশা করেছিলাম এবার হয়তো আমি সেনাবাহিনীতে ফিরতে পারবো। কারণ, সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আমি মনে করতাম আর্মি পোশাকের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আত্মসম্মান, গৌরব ও মর্যাদা। আমার কাছে সামরিক পোশাক ছিল নৈতিকতা আর দেশপ্রেমের প্রতীক। এ পেশাই ছিল আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তাই সর্বদা চেয়েছি পেশাগত দায়িত্বকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে রাখতে, এমনকি নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগদানের ফলে পাকিস্তান আর্মি এপ্রিল মাসে সিলেট শহরে আমাদের ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। সেইসঙ্গে বাড়ির বংশানুক্রমিক সংগৃহীত মূল্যবান জিনিস—কাগজপত্র, দলিলাদি, পারিবারিক ছবি থেকে শুরু করে অন্যান্য সব অস্থাবর সম্পত্তি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ ছাড়া '৭১ সালের ১৯ মার্চের জয়দেবপুরের ঘটনাবলির জন্য পাকিস্তানবাহিনীর প্রচণ্ড ক্রোধ ছিল আমার ওপর। ঐ দিন জয়দেবপুরে কী ঘটেছিল সচেতন পাঠকরা হয়তো তা জানেন। পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার জাহানবার আরভার (পরে লে. জেনারেল) যাঁর হুকুমে ২৫ ও ২৬ মার্চ ঢাকায় তাণ্ডবলীলা সংঘটিত হয়, সেই আরবার জয়দেবপুরে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে যখন সৈন্যদের জনতার ওপর গুলিবর্ষণের জন্য আমাকে আদেশ দিতে বললেন, তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি সৈন্যদের মাটিতে গুলি করার জন্য বাংলায় নির্দেশ দিই। এরপর ব্যারিকেডদানকারী স্থানীয় নেতাদের আমার ওপর বিশ্বাস রেখে ব্যারিকেড সরিয়ে নিতে বললে তারা তা মেনে নেন। ঐ বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে জনতার পক্ষ নেওয়াকে ব্রিগেডিয়ার আরবার আপসকামিতা আখ্যায়িত করে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। যাহোক, এ যুদ্ধের কারণে আমার মা স্মৃতিশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেন এবং পরে মৃত্যুবরণ করেন। আমার পরবর্তী প্রজন্ম ১৯৭১-পূর্ব পারিবারিক কোনো জিনিসপত্র, ছবি ইত্যাদি দেখা থেকে বঞ্চিত হলো।

১৯৯২ সালে সিগনাল কোরের মেজর জেনারেল লতিফ (জেনারেল মঞ্জুরহত্যায় অভিযুক্ত) বিডিআর-এর মহাপরিচালক থাকা অবস্থায় সেখানে কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয় এবং শৃঙ্খলা-নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি প্রায় ভেঙে পড়ে। তখন সেনাপ্রধান ছিলেন জেনারেল নূরুদ্দিন। তিনি পাকিস্তান-প্রত্যাগত অফিসার এবং চাকরিতে আমার জ্যেষ্ঠ ছিলেন। আমি এবং জেনারেল নূরুদ্দিন ১৯৮০ সালে একই দিনে মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পাই। সেনাপ্রধান জেনারেল আতিক অবসর গ্রহণ করলে জেনারেল এরশাদ তাঁকে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন।

যাহোক, বিডিআর-এর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রেক্ষাপটে ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে আমাকে বিডিআর-এর মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে সরকার তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী কর্নেল অলি আহমদকে গোপনীয়তা রক্ষাপূর্বক আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্যাংককে পাঠান। কিন্তু সে সময় আমি বেইজিং ছিলাম এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন এসকাপের সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে। তিনি জানতেন না যে, আমি তখন ব্যাংককের বাইরে যদিও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমার অবস্থান সম্পর্কে অবগত ছিল।

আমি ব্যাংককে ফিরে এসে কর্নেল অলির আসার খবর জানতে পারি। এর কদিন পর তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান (বর্তমানে প্রয়াত) ঢাকা থেকে ফোনে আমার সঙ্গে বিডিআর-এর মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগের ব্যাপারে আলোচনা করেন। আমি এ নিয়োগে সম্মতি জানাই।

কয়েকদিন পর ব্যাংকক থেকে টেলিফোনে সামরিক গোয়েন্দাপ্রধান মেজর জেনারেল (পরে সেনাপ্রধান ও অবসরপ্রাপ্ত) নাসিমের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার বদলিসংক্রান্ত আরো বিস্তারিত জানতে চেষ্টা করি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপের পর বুঝতে পারি যে, তৎকালীন সরকার তাঁকে এ ব্যাপারে কিছুই জানায়নি। বরং তিনি আমার কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে উৎসুক হয়ে ওঠেন।

উল্লেখ্য, মেজর জেনারেল নাসিম আমার অনেক দিনের পরিচিত এবং দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ছিলেন। মেজর জেনারেল নাসিম পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ১৯৬৫ সালে কমিশনের জন্য যোগ দেন এবং একই সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের ফলে আড়াই বছরের প্রশিক্ষণের পরিবর্তে মাত্র সাত মাসের প্রশিক্ষণের পরেই কমিশন লাভ করে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন ক্যাপ্টেন নাসিম জয়দেবপুর থেকে আমার সঙ্গে স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসার পর মেজর জেনারেল নাসিমকে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন।

যাহোক, ফোনে নাসিম আমাকে জানান যে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে আলোচনা করে তিনি আমাকে এ ব্যাপারে জানাবেন। কিন্তু পরে আমি এ সম্পর্কে আর কিছু জানতে পারিনি এবং শেষ পর্যন্ত বিডিআর-এর মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পাইনি। জানতে পারলাম, অন্য একজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর কয়েক মাস পরে আমি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

সাক্ষাৎকালে তিনি আমাকে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে এবং কোনোরকম ইতস্তত না করে সরাসরি বলেন, 'আমি নিজেও জানি এবং সেনাবাহিনীতেও সবাই জানে, শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ এবং অধিনায়কত্ব প্রয়োগে আপনি অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ এবং কঠোর। সবাই আপনার এই দিকটির প্রশংসা করে।' এরপর একটু মুচকি হেসে বললেন, 'আবার অনেকে বলেন, আপনি তো অধীনস্থদের কন্ট্রোল করতে জানেন, কিন্তু আপনাকে কন্ট্রোল করবে কে?'

শুনে আমি একটু থমকে গেলাম। তারপর বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'ম্যাডাম প্রাইমমিনিস্টার, আমি আগাগোড়াই একজন পেশাদার সৈনিক। দেশে এ পর্যন্ত এত অঘটন ঘটেছে কিন্তু একজন সিনিয়র অফিসার হয়েও কোনোকিছুতে জড়াইনি। আপনিও অবগত আছেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও আর্মির শৃঙ্খলারক্ষায় আমি পিছ-পা হইনি। আর এ পর্যন্ত বেআইনি ও শৃঙ্খলাগর্হিত কোনো কাজ আমাকে দিয়ে করানো যায়নি।' এরপর আমি তাঁকে বলি, 'দেশ ও আর্মির প্রচলিত আইনই আমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।'

এই আলাপ-আলোচনা থেকে আমার ধারণা জন্মে এবং অন্যান্য সূত্র থেকে পরোক্ষভাবে আবারও আভাস দেওয়া হয় যে, শিগ্‌গিরই আমাকে সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে আনা হবে। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। পরবর্তী সময়ে সেনাপ্রধান জেনারেল নূরুদ্দিন অবসরে গেলে আমার পাঁচ ব্যাচ জুনিয়র মেজর জেনারেল নাসিমকে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ থেকে এনে লে. জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে সেনাপ্রধান করা হলো।

এরপর ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তখন সেনাবাহিনীতে উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে লে. জেনারেল নাসিমকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস মেজর জেনারেল মাহবুবকে লে. জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন। জেনারেল মাহবুবও আমার জুনিয়র এবং তিনি ১৯৬৪ সালে সামরিক বাহিনীতে 'স্পেশাল পারপাস কমিশনে গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার' হিসেবে যোগদান করে আট মাসের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের পর কমিশন পান। শুধু নির্দিষ্ট কাজের জন্য, যেমন ইলেকট্রিক, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইএমই) গ্র্যাজুয়েট সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি, বিশেষ কোর্সের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের পর এঁদের কমিশন দিয়ে অফিসার বানানো হয়। এ ধরনের স্পেশাল কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসারদের সেনাপ্রধান বানানোর নজির কোনো দেশে আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।

১৯৯৬ সালের জুন মাসের নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। আমি নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমাকে আর্মিতে ফিরিয়ে আনার জন্য অনুরোধ করি। পরে

লিখিতভাবেও তাঁর কাছে আবেদন করি এবং ওই পত্রের অনুলিপি রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছেও পাঠিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত সরকার থেকে সাড়া না পেয়ে আমি বাধ্য হয়ে আর্মিতে ফিরে যাওয়ার জন্য সংবিধানের আওতায় ১৯৯৭ সালে হাইকোর্টে রিট আবেদন করি।

উল্লেখ্য, শৃঙ্খলাজনিত কারণ ছাড়া সেনাবাহিনীর সদস্যরাও দেশের সর্বোচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন। এর নজির অন্যান্য দেশেও আছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের ১৯৯৫ সালের মামলা নং-৩৮৩ (মেজর জেনারেল এলপিএস দেওয়ান বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া)-এর কথা উল্লেখ করা যায়। যাহোক, বাংলাদেশ হাইকোর্ট আমার রিট আবেদনটি খারিজ করেন। পরে আমি ওই রায়ের বিরুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হই। বিস্তারিত শুনানির পর আদালত মামলাটি খারিজ করে দেন।

সমাপনী সারকথা

আমাদের সামরিক বাহিনী স্বাধীনতাযুদ্ধে গৌরবের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে। সামরিক বাহিনীতে যাঁরা আছেন তাঁরাও এদেশের সন্তান। অথচ, আজ যেন সামরিক বাহিনী একটা দ্বীপের মতো যার সঙ্গে মনে হয় জনগণের এবং দেশের স্বার্থের কোনো সম্পর্ক নেই। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কেন এমন হলো? কে এজন্য দায়ী? কীভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধের মতো মহান যুদ্ধে অংশ নেওয়ার পরও সামরিক বাহিনীর মনোবল ক্রমান্বয়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে।

একটি সামরিক বাহিনীকে দক্ষ, কৌশলী, সৎ ও নিষ্ঠাবান করে গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন সৎ, ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব—যার মধ্যে রয়েছে চারিত্রিক দৃঢ়তা, উন্নত আত্মমর্যাদাবোধ, পেশার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং নৈতিক শৃঙ্খলা। আমাদের সেনাবাহিনীতে এসব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত নেতৃত্বের অভাবই ছিল প্রকট। নেতৃত্ব-বিকাশের সুযোগও হয়েছে হীন রাজনৈতিক কারণে বাধাগ্রস্ত। স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসৃত হয়নি। বারবার ভঙ্গ করা হয়েছে সেনাবাহিনীর প্রচলিত নিয়মের। এতে সামরিক বাহিনীর সর্বস্তরে বিশৃঙ্খলা এসেছে, নিয়মনীতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমেছে এবং অজানা আশঙ্কায় সবাই কমবেশি বিচলিত হয়েছেন। সামরিক বাহিনীর চেইন অফ কমান্ড, শৃঙ্খলাবোধ ও দেশপ্রেম যা সবচেয়ে জরুরি, তাই প্রকারান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাজারো

উদাহরণ দেওয়া যাবে। এমন কতগুলো ঘটনা রয়েছে যেগুলো উল্লেখ করা না হলে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ বাদ পড়বে। যেমন, জেনারেল শফিউল্লাকে যখন সেনাপ্রধান করা হয় তখন জিয়াউর রহমান চাকরিতে বহাল আছেন এবং তিনি ছিলেন সিনিয়র। অথচ এই জিয়াউর রহমানই যখন রাষ্ট্রপতি হলেন তখন তিনিও সিনিয়রিটি ভঙ্গ করে জেনারেল এরশাদকে সেনাপ্রধান করেছিলেন যেখানে জেনারেল দস্তগীর ছিলেন এরশাদের সিনিয়র। এই অনিয়মের পুনরাবৃত্তি হয়েছে আরো অনেকবার। যদি মেনে নেওয়া যায়, যিনি সিনিয়র ছিলেন তিনি যোগ্য ছিলেন না বলেই ব্যতিক্রম ঘটানো হয়েছে, তবে পরবর্তী সময়ে সেই যোগ্য (!) সামরিক কর্মকর্তাদের কর্মের খেসারত কেন পুরো জাতিকে দিতে হয়েছে? তখন আরো প্রশ্ন জাগে, কী সেই যোগ্যতার মাপকাঠি? সে কি কেবলই রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি, ব্যক্তি পছন্দ কিংবা নতজানু তাঁবেদারি সামরিক নেতৃত্ব-প্রতিষ্ঠার কূটচক্র?

দেশের শান্তিকালীন অবস্থায় আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব ও আনুগত্য প্রদর্শনমূলক মহড়া ও ক্ষমতাসীন দলকে ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য করা সেসব যোগ্য কর্মকর্তার দ্বারা সম্ভব হলেও দেশের সংকটকালে তাঁদের নেতৃত্ব অধিনস্থদের নিকট প্রশ্নাতীতভাবে গৃহীত হয়নি। ফলে সেনাবাহিনীর একক সত্তা হয়েছে বহুধাবিভক্ত। সেসব অধিনায়কের নেতৃত্ব জাতির ক্রান্তিলগ্নে ভেঙে পড়েছিল, যা পুরো দেশ ও জাতিকে ঠেলে দিয়েছিল সংঘাত ও বিপর্যয়ের মুখে।

আমাদের রাজনীতিবিদরা বুঝতে চান না যে, সেনাবাহিনী একটি ভিন্ন ধরনের সংগঠন এবং এর নেতৃত্ব দেওয়ার যে যোগ্যতা তার মাপকাঠিও ভিন্ন। সামরিক শাসকের পক্ষে যা মানায়, গণতান্ত্রিক সরকারের আমলেও যদি তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়, তবে তার প্রতিফলন সামরিক বাহিনীর সমগ্র কাঠামোয় পড়বে না কেন? ফলে সততা, বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার বদলে সামরিক বাহিনীতে এসেছে দলাদলি, অবিশ্বাস, প্রতারণা ও ভণিতা।

আজ ভাবতে কষ্ট হয়, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে-যুবক জীবনের বিনিময়ে মাতৃভূমির প্রতিটি ইঞ্চি রক্ষার শপথ নিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগদান করে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসারের ব্যক্তিগত হীনস্বার্থে সে কেবল রাজনীতি ও ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ, সামরিক বাহিনীর সাধারণ সদস্যদের মধ্যে কোনোকিছুরই অভাব নেই। সঠিক প্রশিক্ষণ, যোগ্য নেতৃত্ব ও সুদক্ষ পরিচালনা তাদের গড়ে তুলতে পারে দেশপ্রেমিক সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী রূপে।

আমাদের সামরিক বাহিনীর সামনে এখন সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য নেই। লক্ষ্যহীন সামরিক বাহিনী তাই কেবল উদ্দেশ্যহীন বৈষয়িক লাভ-লোকসান বিচারে ব্যস্ত। এ ধরনের অফিসার দ্বারা যখন সামরিক বাহিনী পরিচালিত হয়

তখন সমগ্র বাহিনীর চারিত্রিক দৃঢ়তা ভেঙে পড়ে। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা তখন বিপথে পরিচালিত হয়। মনে করে ক্ষমতার অপব্যবহার আর বৈষয়িক লাভ গনাই তাদের কাজ। রাজনীতি অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আশেপাশে ও ক্ষমতাসীনদের সুনজরে থাকাই তাদের দায়িত্ব। এভাবেই নৈতিকতাহীন কূপমণ্ডূক নেতৃত্ব সমগ্র সামরিক বাহিনীকেই লক্ষ্যভ্রষ্ট করে তুলেছিল।

স্বাধীনতার পর সামরিক বাহিনীর নেতৃস্থানীয় অফিসারদের অধিকাংশই ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এদের ৭০ ভাগ আবার ছিলেন স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এঁদের মেনটাল অ্যাটিচ্যুড অ্যাডজাস্টমেন্ট ট্রেনিং হয়নি। ৬ মাসের প্রশিক্ষণে তা সম্ভবও নয়। অপর দিকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসাররা সামরিক দিক দিয়ে দক্ষ হলেও মানসিকতায় তাঁরা ছিলেন ঔপনিবেশিক। এঁদের অধিকাংশই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও ঔপনিবেশিক ও পাকিস্তানি মানসিকতা বদলাতে পারেননি। ফলে জনসাধারণের প্রতি থেকেছেন উন্নাসিক। নিজ সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিকদের প্রতি থেকেছেন উদাসীন। ফলে নিজেদের মধ্যেও তাঁরা রচনা করেছিলেন মানসিক দূরত্ব যা জন্ম দিয়েছে নিজেদের মধ্যে হানাহানি, দেশপ্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবর্তে সৃষ্টি করেছে ষড়যন্ত্র ও অভ্যুত্থান।

সামরিক বাহিনীর পেশা ও শৃঙ্খলাকে কখনোই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বরং বিভিন্ন সময়ে হীন ব্যক্তিস্বার্থে তা পদদলিত করা হয়েছে। শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের ব্যাপারে কঠোর নিয়ম অনুশীলন করা হয়নি বরং তথাকথিত রাজনীতি ও দলীয় স্বার্থে দেখানো হয়েছে অর্বাচীন উদারতা যা জন্ম দিয়েছিল একের পর এক বিশৃঙ্খলার। দেশের ইতিহাসের সবকটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ে জড়িত ছিল সামরিক বাহিনী। কিছু অফিসারের জন্য এই কলঙ্ক বহন করতে হচ্ছে সমগ্র সংগঠনকে।

সামরিক বাহিনী শুধু একটি পেশা নয়, এটি একটি জীবনধারা, দেশের জন্য ত্যাগই হলো এর মৌলিক উপাদান। কেননা, সামরিক বাহিনীর সদস্যরা যোগদানের সময়ই অঙ্গীকারবদ্ধ হন দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করার। এই সেনাবাহিনীকে ক্ষমতাসীনদের হীনস্বার্থে, অযোগ্য নেতৃত্বে আরাম-আয়েশ, আনুগত্যের মহড়া, উৎসব, অপেশাদার কাজে ও রাজনীতিতে অভ্যস্ত করে ফেলা হয়েছিল, যার ফলে সেনাবাহিনীতে ঘনঘন বিশৃঙ্খলা ও অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে এবং তা দেশকে বারবার ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে।

বস্তুত উন্নয়নশীল দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের মোক্ষম উপায় হলো সুসংহত গণতান্ত্রিক কাঠামো যেখানে রাজনীতিবিদদের ব্যক্তিস্বার্থের কাছে দেশের স্বার্থ কোনোভাবেই ক্ষুণ্ন হবে না এবং যেখানে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই হবেন জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত

প্রতীক। যদি তাঁরা দেশের স্বার্থে সর্বদা সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব সচ্চরিত্র, যোগ্য, পেশাদার ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের হাতে অর্পণ করতেন, তবে কোনো মেজর, কর্নেল বা জেনারেলের দুঃসাহস হবে না গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার।

আমাদের সামরিক বাহিনী অমিত সম্ভাবনা ধারণ করে আছে। এখনই সময় এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার। এজন্য অগ্রসর হতে হবে পেশাগত নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে, যেখানে প্রাধান্য পাবে দেশের স্বার্থ, পেশার বিশুদ্ধতা, সততা ও কর্মনিষ্ঠা। কেননা, পেশাদার সৈনিক গণতন্ত্র, সংবিধান ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

আমরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। এই শতাব্দী আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। দূরদর্শী নেতৃত্ব বিনা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সহজ নয়। সামরিক বাহিনী কি এই চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল? হাজারো সুযোগ-সুবিধা ও টাকা-পয়সা দিয়ে সামরিক বাহিনীতে যোগ্য নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণ করা যাবে না। 'মানি ইজ পুওর সাবস্টিটিউট ফর গুড কম্যান্ড'। টাকা-পয়সা দিয়ে আনুগত্য ভাড়া করা যায়, কিন্তু ক্রয় করা যায় না।

সময় বয়ে যায় তার আপন গতিতে। সে কারো জন্য অপেক্ষা করে না। আজকের সৎ, যোগ্য, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্বই আগামীর বিশ্বস্ত সৈনিক তৈরি করবে। এই কাজে এই নেতৃত্ব ব্যর্থ হলে সময় তার চাহিদা পূরণ করে নেবে ঠিকই। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে আজকের নেতৃত্বের স্থান হবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। কারণ, ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্মম।

পরিশিষ্ট

স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনাপর্ব

মেজর জেনারেল মঈন-উল হোসেইন চৌধুরী (বীর বিক্রম)এর বক্তব্য

১৩ই মে সংখ্যা বিচিত্রায় প্রকাশিত 'ভিন্নমত' শীর্ষক কলামে লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী আবদুর রকীব (অবঃ) বর্ণিত ১৯৭১ সালের ২৫-২৮শে মার্চ সময়ে ঘটিত জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্টের ঘটনাবলির বিবরণ সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ২য় বেঙ্গল রেজিমেণ্ট-এর বিদ্রোহের ইতিহাসের সঠিক প্রতিফলন হোক—এটা নিশ্চিতকরণের জন্যেই আপনার পত্রিকা মারফত এ বিষয়ে আমার বক্তব্য প্রকাশ করতে চাইছি।

কর্নেল রকীব এবং আমার বিবরণের পার্থ্যকের কারণ মূলত একটাই। সেটা হচ্ছে যে ২৫ থেকে ২৮শে মার্চ—এই চারদিন তাঁর কমান্ডিং অফিসার থাকাকালীন সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি কখনোই পুরোপুরি তাঁর আয়ত্তে ছিল না। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যখন পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বাঙালি অফিসার, জেসিও ও সৈনিকেরা জন্মভূমি স্বাধীন করার আহ্বানে জীবনপণ যুদ্ধ করার শপথ নিয়েছিল—সেই ক্রান্তিলগ্নে কর্নেল রকীবকে আমাদের সংগ্রামের অকুণ্ঠ সমর্থক হিসেবে পাইনি। তাই স্বীয় পদমর্যাদা-বলে তিনি আমাদের মাঝে থাকলেও সংগ্রামের পরিকল্পনা এবং যুদ্ধকৌশল নির্ধারণে কখনও তাঁকে আমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করতে সাহস পাইনি। বস্তুত যখন দ্বিতীয় বেঙ্গলের বিদ্রোহের সূচনা ১৯ মার্চের ঘটনাবলির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে তখন হঠাৎ করে কমান্ডিং অফিসার হিসাবে তাঁর ২য় বেঙ্গলে বদলি আমাদের সকলের মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। মেজর (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল) শফিউল্লাহ, ক্যাপ্টেন (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার) নাসিম, ক্যাপ্টেন (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার) আজিজুর রহমান, ক্যাপ্টেন (বর্তমানে কর্নেল) এজাজ, লেফটেন্যান্ট (বর্তমানে

লেফটেন্যান্ট কর্নেল) ইব্রাহিম এবং আমার (তৎকালে মেজর মঈন) মধ্যেই আমাদের পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ থাকত।

বিদ্রোহের বীজ ৭ মার্চ থেকেই বপিত হয়ে গিয়েছিল—যখন শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক বক্তৃতার কিছুক্ষণ আগে তদানীন্তন কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল মাসুদুল হাসান খান (অঃ)-এর অফিসে বসে আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম যে শেখ সাহেব স্বাধীনতার ডাক দিলে ২য় বেঙ্গল তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবে। একই সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, সৈন্য চলাচল এবং মোতায়েনের মোটামুটি একটা রূপরেখাও ম্যাপ দেখে আমরা খাড়া করে ফেলেছিলাম। ১৯ মার্চ থেকেই বুঝে ফেলেছিলাম যে মরণকামড় দেয়া ছাড়া হানাদার বাহিনীর আর গত্যন্তর নেই এবং তখন থেকেই ক্যাপ্টেন নাসিম, আজিজ, এজাজ, লেফটেন্যান্ট ইব্রাহিম এবং আমি পালাবদল করে রাত্রে জয়দেবপুর চৌরাস্তা এবং আশপাশের এলাকা টহল দিতাম। রেজিমেন্ট-এর জেসিও এবং এনসিওরা, যেমন সুবেদার (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সম্মানিত ক্যাপ্টেন) নুরুল হক, সুবেদার (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সম্মানিত ক্যাপ্টেন) মান্নান, সুবেদার চাঁদ মিয়া (বর্তমানে মৃত), সুবেদার (বর্তমানে সম্মানিত ক্যাপ্টেন) গিয়াস, সুবেদার (শহীদ) আবুল বাশার, সুবেদার-মেজর শফিউল্লাহ (বর্তমানে সম্মানিত অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন), সুবেদার ওয়াজিদ আলী ও জাফর এবং অন্যান্যরা আমাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিশদভাবে অবহিত ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯ তারিখের ঘটনার পরপরই আমরা জয়দেবপুরের ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিস এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং সেইদিনই স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীবৃন্দ এবং শ্রমিকনেতাদের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগও স্থাপন করি। উপরোক্ত সকল ব্যবস্থাই লেঃ কর্নেল মাসুদ-এর অবগতি ও সমর্থনের মাঝে করা হয়।

এবারে ২৫ মার্চের কথায় আসি। তাঁর বক্তব্যে এমনই প্রতীয়মান হচ্ছে যে ২৬ তারিখ গোটা দিনে রেডিও মারফত ইয়াহিয়া খাঁর ভাষণ এবং কারফিউ জারি সম্পর্কিত খবর ছাড়া তাঁরা কিছু জানতেন না। ২৭ মার্চ সকালে সর্বপথম রাজেন্দ্রপুর অ্যামুনিশন ডিপোতে গিয়ে আঁচ করতে পারলেন যে 'পাকিস্তানীরা মিলিটারী একশনে অবস্থা আয়ত্তে আনছে না বরং মারণযজ্ঞে নেমেছে।' পাকিস্তানিদের মিলিটারি অ্যাকশন এবং মারণযজ্ঞের মধ্যে প্রভেদ কোথায়—এ প্রশ্ন ছাড়াও তথ্যগতভাবে তাঁর এই উক্তি মেনে নিতে পারছি না। আমদের পূর্ববর্তী কমান্ডিং অফিসার কর্নেল মাসুদ মারফত ক্যাপ্টেন আজিজ ২৬ তারিখ ভোরবেলায়ই জানতে পারেন ঢাকাতে সৈন্য নেমেছে। মেজর জিয়াউর রহমানের (পরলোকগত রাষ্ট্রপতি) নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিদ্রোহ সম্পর্কেও আমরা ঐ সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মারফত শুনি। দুপুরের মধ্যেই অবসরপ্রাপ্ত

কর্নেল রেজা খুব সম্ভব ২৬ তারিখ লোক মারফত ঢাকার তাণ্ডবলীলা সম্পর্কে অমাদের কাছে খবর পৌঁছান। ২৬ তারিখ রাত্রেই বিদ্রোহ করব কি না এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পর সাব্যস্ত হয় যে লোকবল, অস্ত্রবল, গোলাবারুদ, Support Equipment ইত্যাদি না নিয়ে খালিহাতে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো অর্থই হয় না এবং এর ফলশ্রুতি হিসেবেই সম্ভব হয় গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানা লুণ্ঠন—সুবেদার চাঁদ মিয়ার নেতৃত্বে যার Strong room-এ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিপুল পরিমাণ রাইফেল এবং জয়দেবপুর থেকে হালকা কামান, মর্টার, মেশিনগান, গোলাবারুদ এবং যানবাহন ইত্যাদি নিয়ে আসা সম্ভব হয় যা দ্বারা কালক্রমে বিভিন্ন বাহিনীকে সুসজ্জিত করে তোলা হয় এবং যাঁরা ময়মনসিংহ ও অন্যান্য এলাকায় দীর্ঘকাল ধরে পাকিস্তান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে রাখতে সক্ষম হন।

২৭ তারিখ রাত্রে টঙ্গীতে পাকিস্তানিদের আক্রমণের পরে যে দৃশ্যের অবতারণা তিনি করেছেন তাও সঠিক নয়। তিনি ব্যতীত রেজিমেন্টের অন্য কারো 'মৌন' হয়ে থাকার অবকাশ বা কারণ ১৯ তারিখেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আচার-আচারণ ও দোটানা ভাব শুরু থেকেই আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছিল।

২৮ মার্চ মেজর শফিউল্লাহ টাঙ্গাইল যাত্রার প্রাক্কালে ইউনিফরমের ব্যাপারে লেফটেন্যান্ট মুর্শেদকে সাক্ষী মেনেছেন। প্রকৃতপক্ষে ২৪ তারিখ থেকেই লেঃ মুর্শেদ টাঙ্গাইলে অবস্থান করছিলেন এবং মেজর শফিউল্লাহর মাধ্যমে তাঁকে আমরা ২৮ তারিখ রাত্রে রেজিমেন্ট-এর প্রধান দলটি ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে টাঙ্গাইলে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য খবর পাঠাই। যাই হোক, সকালবেলা মেজর শফিউল্লাহ্ জয়দেবপুর থেকে যাত্রা করার পরেই ঠিক হয় যে কর্নেল রকীব সন্ধে সাতটার দিকেই বেরিয়ে যাবেন এবং তাঁর জন্য বিকেল ৫টা থেকে হাবিলদার (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার) সাইদুল হক চালিত একটি জিপগাড়ি জয়দেবপুর পোস্ট অফিসের পেছনে অপেক্ষা করতে থাকে। জিপচালককে টাঙ্গাইলের পথ ধরতে আগে থেকেই নির্দেশ দেয়া হয়। ক্যাপ্টেন আজিজকে (যিনি বিকেল থেকেই চৌরাস্তার মোড়ে সশস্ত্র অবস্থায় পাহারা দিচ্ছিলেন) বলা হয় যে জিপটি অন্য কোনো পথ ধরলে যেন বাধা দেয়া হয়। সন্ধে ৬টার দিকে তাঁর সঙ্গে আমি জয়দেবপুর রাজবাড়ির গেট পর্যন্ত হেঁটে আসি এবং বিদায় নিই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমরা তাঁর বেসামরিক পোশাক পরে থাকার ব্যাপারে যদিও খুবই ক্ষুব্ধ ছিলাম— এ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করার মতো মানসিক অবস্থা কারো ছিল না। পাকিস্তানি অফিসারদের সাথে আমি ছাড়া ক্যাপ্টেন নাসিম ও এজাজ বসে খাচ্ছিলাম। মেসে থাকাকালেই সর্বপ্রথম গুলিবিনিময়ের শব্দ শোনা যায়। Wireless

সেট-এ কর্তব্যরত পাকিস্তানি সৈন্যরা হঠাৎ ভীত-চকিত হয়ে গুলি ছুড়তে শুরু করে এবং আর কিছুক্ষণ পরেই মেসের ভেতরে এবং বাইরে পাকিস্তানি এবং আমাদের সৈন্যদের মধ্যে গুলিবিনিময় শুরু হয়ে যায়। রাত্র ন'টার দিকে যখন প্রায় সমস্ত রেজিমেন্ট জয়দেবপুর ত্যাগ করে চলে গেছে, কর্নেল রকীবের সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে আমি সর্বশেষে জয়দেবপুর ত্যাগ করি এবং পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যাপ্টেন আজিজ এবং তাঁর সাথের সৈন্যগণকে চৌরাস্তা থেকে তুলে নিয়ে টাঙ্গাইলের পথে যাত্রা করি। বলা বাহুল্য যে ২য় বেঙ্গলের সামরিক এবং এমনকি বেসামরিক কর্মচারীদের মধ্যে কর্নেল রকীব ছাড়া এমন দ্বিতীয় কোনো বাঙালি ছিলেন না যিনি আমাদের সঙ্গে জয়দেবপুর ত্যাগ করতে পারেননি।

২৯ তারিখের ঘটনার কথা আমাদের জানার কথা নয় তবে অগণিত প্রাণদানের বিনিময়ে এবং শুধুমাত্র ২য় বেঙ্গলেরই শতাধিক শহীদের রক্তের বিনময়ে অর্জিত স্বাধীনতার উন্মেষলগ্নে ১৬ই ডিসেম্বর যখন ২য় বেঙ্গলের অধিনায়ক হিসেবে ঢাকায় প্রবেশ করি তখন যুদ্ধবন্দি পাকিস্তানি অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করে অন্যান্য ঘটনার মধ্যে ২৯ তারিখের জয়দেবপুরের ঘটনাবলি সম্পর্কেও অবহিত হই। তাঁদের বক্তব্য উল্লেখ করে এই বিবরণের কলেবর বৃদ্ধি করা আমার অভিপ্রায় নয়।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে অনেক বিতর্কের ঝড় এই ১২ বছরে বয়ে গেছে। আজ নতুন করে এই নিয়ে যশ ও খ্যাতির লড়াইয়ের মারপ্যাঁচ আর এক দফা হয়ে যাক—এই রকম উদ্দেশ্য নিয়ে যেমন আমার বক্তব্য লিখতে বসিনি ঠিক তেমনি যখন প্রভাববিস্তারের বুনো লতার বাঁধনে দেখি—মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বিপন্ন করার প্রয়াস তখন স্বভাবতই নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকতে বিবেকের কাছ থেকে বাধা আসে। মুক্তিযুদ্ধের বিশ্লেষণ বিভিন্ন মতবাদ এবং দৃষ্টিকোণ থেকেই হয়েছে— শুধু এই সত্যটাই বোধহয় আজ পর্যন্ত অক্ষত থেকে গেছে যেসব বীর দেশমাতৃকার সন্তানেরা আমাদের দেশের পটভূমিকায় সর্বকালের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে নয় বরং স্বেচ্ছায় আদর্শ ও দেশপ্রেমে বলীয়ান হয়ে মুক্তিযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে অজানার পথে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ২২ জুলাই, '৮৩; ৫ই শ্রাবন, ১৩৯০।

জয়দেবপুর ঃ '৭১ মার্চ

রাত প্রায় নয়টা। গোলাগুলির তাণ্ডব থেমে গেছে। বিজলিবাতি নেই বলে গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে জয়দেবপুরের প্রাচীন রাজবাড়ি—দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাসস্থান। আমি অপেক্ষমাণ জিপটিতে উঠে জয়দেবপুর চৌরাস্তার দিকে যেতে বললাম হাবিলদার সাইয়েদুল হককে। দেখলাম লেঃ কঃ রকীব শেষ পর্যন্ত আসেননি। চৌরাস্তার মোড় থেকে আমি ক্যাপ্টেন আজিজকে উঠিয়ে নিলাম। নির্দেশ অনুসারে গোলাগুলীর সময়ে বাহিনীর সকল সৈন্যকে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে একত্র হয়ে একসঙ্গে টাঙ্গাইলের পথে অগ্রসর হবার নির্দেশ আগেই দেয়া ছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী সবাই রওয়ানা হলো এবং পথে যোগদান করলো গাজীপুর ও রাজেন্দ্রপুরের সৈন্যদল। স্বল্পতম রক্তব্যয়ে পাকসৈন্যের বিরুদ্ধতা ভেঙে সমস্ত সৈন্য, ভারী ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ও রসদসামগ্রী নিয়ে আমরা জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হতে পারলাম বলে অত্যন্ত স্বস্তিবোধ করছিলাম। সংগ্রাম প্রস্তুতির অতিবাহিত দিনগুলোর উৎকণ্ঠা, রক্তপাতের শঙ্কা, ব্যর্থতার বিপদ সরে গিয়ে জন্ম নিল সশস্ত্রসংগ্রামের উদ্দীপনা, বিজয়ের প্রতিজ্ঞা ও সুবর্ণদিনের স্বপ্ন। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও অবদান স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবময় অধ্যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের উপর প্রকাশিত কিছু পুস্তক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লেখকগণ প্রধানত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি। তাই পুস্তকগুলো ইতিহাস না হয়ে জীবনী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জাতীয় পুস্তক প্রকাশনা অবশ্যই উৎসাহব্যঞ্জক। সঠিক ইতিহাস রচিত হবার জন্য এ সমস্ত পুস্তক ও প্রবন্ধের তথ্য ও বর্ণনা ঐতিহাসিকদের বিশেষ কাজে লাগবে। তবে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে জড়িত ছিলেন তাঁদের পক্ষে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিগোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে উঠে ইতিহাস লেখা অত্যন্ত দুরূহ। একটি উদাহরণ মনে

পড়ছে–যিনি কোনো নাটকে অংশগ্রহণ করেছেন, তার পক্ষে নিজে কতটুকু দক্ষতা ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার বিচার সঠিক হয় না। যাঁরা দর্শক তাঁরাই নায়কের সার্থকতা বিচার করতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে আমি আরও একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সকল বীর সৈনিক অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন। উৎসাহী ইতিহাস লেখক তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে বহু সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। আর কিছু বছর পর তা আর সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর হিসেবে আমি প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সশস্ত্রসংগ্রামে লিপ্ত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। ভবিষ্যতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস প্রণয়নে সাহায্য হতে পারে এই বিশ্বাসে ব্যাটালিয়নের 'ওয়ার ডায়েরি' থেকে কিছু ঘটনা তুলে ধরছি। 'ওয়ার ডায়েরি' থেকে তুলে ধরা ঘটনাবলি দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের স্বাধীনতাযুদ্ধের ভূমিকার উপর আলোকপাত করবে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের গড়িমসি দেখে আমরা বাঙালি সৈন্যরা অনেকেই বিক্ষুব্ধ ছিলাম। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পায় ১৬৯টির মধ্যে। ফলে ৩১৩টি আসনবিশিষ্ট পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় ও সরকার গঠনের অধিকার লাভ করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে জয়লাভ করে। ৬ দফায় রাষ্ট্রের ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব ছিল। নির্বাচনের ফলাফলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এতদঅঞ্চলের জনগণ ৬ দফার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ভাগ-বাঁটোয়ারা চায়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বিরতিহীন বঞ্চনার ফলে এই অবস্থার জন্ম হয়। পাকিস্তানের ইয়াহিয়ার সরকার মনে করেছিল নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এমন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। কিন্তু ফলাফল অন্যরূপ হওয়ায় তাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। কাজেই সামরিক শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করার গোপন আঁতাঁত করছিল।

পাকিস্তানের সামরিক শাসক আমাদের দমন করবার উদ্দেশ্যে পাশবিক সামরিক শক্তি প্রয়োগের জন্য সময় নিচ্ছে বলে আমাদের আশঙ্কা দৃঢ় হচ্ছিল। এই উদ্দেশ্যে বাঙালি সৈন্যদের বিভক্ত করে যে আমাদের আক্রমণ-ক্ষমতা তিরোহিত করবে সে সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার জাহানজেব আরবাব ভারতীয় আক্রমণের ধুয়া তুলে দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ানকে ভাগ করে একটা কোম্পানি টাঙ্গাইল ও আরেকটি ময়মনসিংহে পাঠিয়ে দিলেন। টাঙ্গাইল কোম্পানির অধিনায়কত্ব দেয়া হলো পাকিস্তানি মেজর কাজেম কামালকে। এই কোম্পানিতে সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায়

একশতের মতো। ময়মনসিংহে যে কোম্পানি পাঠানো হলো তার অধিনায়ক ছিলেন মেজর নুরুল ইসলাম (এখন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল)।

ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলে যে কোম্পানি দুটি পাঠানো হয়, তার হেডকোয়ার্টারস করা হয় টাঙ্গাইলে, আর মেজর সফিউল্লাহকে (বর্তমানে রাষ্ট্রদূত ও অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল) অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। জয়দেবপুর সদর দফতরে ব্যাটালিয়ানের অবশিষ্ট প্রায় চারশত সৈন্য রয়ে যায় এবং ব্যাটালিয়ান কমান্ডার ছিলেন লেঃ কঃ মাসুদুল হোসেন খান।

১ মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সহসা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ পিছিয়ে দিলেন। ফলে দেশের সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। ১ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত যে গুমোট অবস্থার সৃষ্টি হলো সারাদেশে, জয়দেবপুরের সামরিক ঘাঁটিতেও তার প্রতিফলন ঘটলো। যদি ৭ মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তা হলে পাকিস্তান বাহিনী সামরিক পদক্ষেপ নেবে। এক্ষেত্রে আমাদের বিদ্রোহ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। প্রস্তুতি ছাড়া বিদ্রোহের ফল ভয়ঙ্কর হবে একথা স্মরণ রেখে আমরা ক্রমে ক্রমে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানে অবস্থানরত সৈন্যবাহিনীতে পরিবর্তন আসলো। ইস্টার্ন কমান্ডে লেঃ জেঃ সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের বদলে লেঃ জেঃ টিক্কা খান যোগদান করলেন। বিদায়ের পূর্বে লেঃ জেঃ ইয়াকুব হেলিকপ্টারে জয়দেবপুরে আসলেন লেঃ জেঃ টিক্কা খান ও মেঃ জেঃ খাদেম হোসেন রাজার সাথে। আমি মেঃ জেঃ খাদেম হোসেন-এর এডিসি ছিলাম একসময়। কথা প্রসঙ্গে উনি আমাকে ছুটিতে যেতে চাই কি না জানতে চাইলেন। এতে আমার সন্দেহ ঘনিভূত হলো যে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ছুটির প্রয়োজন হলে আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে লিখবো বলে জানালাম। ইতিমধ্যে ২য় লেঃ এম. এ. মান্নানকে ৫৭ ব্রিগেডের সদর দফতরে লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে নিয়ে যাওয়া হলো। ২য় লেঃ ইব্রাহিমকেও টেনিং-এর নামে একই সদর দফতরে বদলি করা হলো। আমি লেঃ কঃ মাসুদুল হোসেন খানকে এইসব পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত দিলাম। আমাদের সাথে পাকিস্তানি অফিসার ছাড়া সৈন্য ও বেসামরিক কর্মচারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ জন। যাতে তারা কোনোপ্রকার সন্দেহ না করে সেজন্য আমরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের ব্রিগেড সদর দফতরের ব্রিগেড মেজর খালেদ মোশাররফকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় আনা হলো আর্মার্ড কোরের অফিসার লেঃ জাফরকে।

বাঙালি মেজরদের মধ্যে আমি অবিবাহিত ছিলাম। এ জন্য সহকর্মী ক্যাপ্টেন নাসিম (বর্তমানে মেজর জেনারেল), ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান

(বর্তমানে মেজর জেনারেল), লেঃ এজাজ (বর্তমানে কর্নেল) এবং ইব্রাহিম (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার)-এর সাথে সবসময় জয়দেবপুরেই থাকতাম। লেঃ কঃ মাসুদ ও মেজর সফিউল্লাহ বিবাহিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের পরিবারের সঙ্গে রাত্রিতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে থাকতেন। সৈনিকদের সঙ্গে থাকায় আমাদের পক্ষে তাদের সঠিক মনোভাব অনুভব করা সম্ভবপর হয়েছিল। ১ মার্চের পর থেকে আমি বাস্কেটবল খেলার মাঠে সুবিধামতো সরাসরি কথাবার্তা বলে সৈন্যদের মনোভাব যাচাই করছিলাম। এরপর ৫ মার্চ বাস্কেটবল খেলাশেষে শ্মশান ঘাটে সিনিয়র জেসিওদের সাথে খোলাখুলি অবস্থায় আলোচনা করি ও লেঃ কঃ মাসুদকে আলোচনার ফলাফল অবহিত করি। ৭ মার্চ সকালে আমি ব্যাটালিয়নের ইনটেলিজেন্স হাবিলদার মুসাব্বিরকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অপারেশন মনচিত্রসমূহ আমাকে দিতে বলি এবং এই মানচিত্র নিয়ে লেঃ কঃ মাসুদের সাথে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কার্যক্রম আলোচনা করি। আলোচনা অনুসারে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গতিবিধি লক্ষ করার জন্য সার্বক্ষণিক সশস্ত্র পাহারা মোতায়েন করা হলো জয়দেবপুর চৌরাস্তায়, সিনেমা হলে ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। এইসব সৈন্যরা সকলেই ছিল বাঙালি। গোপনে তাদের মোতায়েন করা হয়। এদিকে মেজর সফিউল্লাহ শ্বশুরের মৃত্যুসংবাদে দু'দিনের ছুটিতে ১০ মার্চের দিকে টাঙ্গাইল থেকে কুমিল্লায় যান। ছুটির পর টাঙ্গাইল যাবার পথে তিনি জয়দেবপুরে আসলে লেঃ কঃ মাসুদ তাঁকে জয়দেবপুরে থেকে যাবার নির্দেশ দিলেন।

১৫ মার্চের পর আরেকটি ঘটনার সূত্রপাত হলো। কিছুদিন পূর্বে ৩০৩ কেলিবার রাইফেল বদলিয়ে নতুন চাইনিজ রাইফেল দেয়া হয়েছিল। পুরনো রাইফেলগুলো জমা দেয়ার প্রস্তাব সত্ত্বেও ঢাকা সদর দফতর এগুলো নিতে বিলম্ব করে। ১৫ মার্চে ব্রিগেড সদর দফতর সহসা ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে এই সমস্ত অস্ত্র ফেরত দেবার নির্দেশ দিল। এই নির্দেশ স্বল্প সময়েই বাঙালি সৈন্যদের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার হয়ে পড়ে যে বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করা হচ্ছে। সুযোগ ও সুবিধা পেলে পাকিস্তানিরা যে নিয়ন্ত্র করতে চাইবে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ছিল না। নিরস্ত্র করতে চাইলে যে বিদ্রোহ ঘটবে, তা তারা বুঝতে পেরেছিল। পুরনো অস্ত্র জমা দেয়ার বিষয়টি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায় বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ ঢাকা-জয়দেবপুর সড়কে ৪০ থেকে ৫০টি ব্যারিকেড স্থাপন করে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে লেঃ কঃ মাসুদ জানালেন, অস্ত্র নিয়ে এ মুহূর্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যাওয়া বিপজ্জনক হবে। ঢাকা সদর দফতর এর মধ্যে সম্ভবত: অন্য কিছুর আন্দাজ পেল। তারা কড়া হুকুম দিল : "বলপূর্বক ব্যারিকেড সরিয়ে ঢাকায় অস্ত্র জমা দিতে হবে।"

ইতিমধ্যে আমার সহকর্মীরা এবং আমি যারা রাতে জয়দেবপুরে থাকতাম তারা লেঃ কঃ মাসুদের জ্ঞাতসারে রাত্রিকালীন প্রহরা দ্বিগুণ করে দিলাম। আমরা সবাই ব্যক্তিগত অস্ত্র ও গোলাবারুদ সঙ্গে রাখতাম। জনতার আক্রমণের ভয়ে ব্যক্তিগত অস্ত্র ও গোলাবারুদ আমরা সাথে রাখি বলে পাকিস্তানিদের বলা হয়েছিল। পাকিস্তানিরাও অবশ্যই আমাদের ব্যাখ্যা যে বিশ্বাস করত তা মনে হয় না। কিন্তু মুখে কিছু বলত না। হয়তোবা তারা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যাতে অগ্নিতে পরিণত না হয়, সেইদিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল।

আমাদের ওরা সন্দেহের চোখে দেখছিল তাই আমাদের ব্রিগেড সদর দফতর কর্তৃপক্ষ অনুমান করলো যে আমরা ব্যারিকেড সরানোর জন্য বল প্রয়োগ এড়িয়ে চলছি। ১৯ মার্চ ব্রিগেড কমান্ডার আরবাব একটি বৃহৎ রক্ষীদল নিয়ে জয়দেবপুরে আসবেন এবং আমাদের সাথে মধ্যাহ্নভোজন করবেন বলে জানালেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, আমার অধীনস্থ কোম্পানি রাস্তায় ব্যারিকেড সরিয়ে এগিয়ে এসে ব্রিগেড কমান্ডারকে নিয়ে যাবে। আমি বুঝলাম যে আমার আনুগত্য পরীক্ষিত হচ্ছে। স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আমরা আগেই যোগাযোগ স্থাপন করেছিলাম। ব্যারিকেড সরানোর ব্যাপারে আমি তাঁদের সাথে যোগাযোগ করলাম এবং দূত মাধ্যমে জানালাম যে অসময়ে আমরা কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে চাই না। কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকেই রাস্তার ব্যারিকেড সরানো সম্ভব হলো। ব্রিগেডিয়ার আরবাব যে এখানে আসবেন সে খবর জনতা আগে জানত না। উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার সশস্ত্র রক্ষীদল নিয়ে জয়দেবপুরে আসার খবর তীরবেগে ছড়িয়ে পড়লো। জনতা মনে করলো, বাঙালিবাহিনীকে নিরস্ত্র করা হচ্ছে। ফলে জয়দেবপুর বাজারের কাছে রেল ক্রসিং-এ তারা প্রথম ব্যারিকেড স্থাপন করলো একটি লম্বা মালগাড়ি লাইনের উপর দাঁড় করিয়ে। তারা ইঞ্জিনটা সরিয়ে ফেললো এবং রেল লাইনের নিচ থেকে স্লিপার সরিয়ে নিল।

ব্রিগেডিয়ার আরবাব আমাকে পুনরায় বলপূর্বক ব্যারিকেড সরানোর নির্দেশ দিলেন। এটি ছিল আমার জন্য আরেকটি বিরাট পরীক্ষা। ব্রিগেডিয়ার আরবাব তাঁর সঙ্গে ৭০ জন সৈন্য এনেছিলেন এবং প্রত্যেকেরই হাতে ছিল হাল্কা মেশিনগান। আমাকে ব্যারিকেড সরাবার নির্দেশ দিয়ে ব্রিগেডিয়ার আরবাব সাথের রক্ষীসহ আমার সৈন্যবাহিনীর সাথে সাথেই ব্যারিকেডের দিকে অগ্রসর হলেন। রাজবাড়ির সদর দরজা থেকে ব্যারিকেডের দূরত্ব ছিল মাত্র কয়েকশো গজের মতো। আমার বুঝতে বাকি ছিল না যে ব্রিগেডিয়ার আরবাবের রক্ষীরা ব্যারিকেড না উঠালে মেশিনগান দিয়ে গুলি ছুড়তে পিছপা হবে না। আমার জন্য এটা অগ্নিপরীক্ষার শামিল হলো। আমি ঘটনাস্থলে

পৌঁছে মোতালেব ও হাবিবুর রহমানসহ উপস্থিত নেতাদের বাংলায় বললাম "আমি বাঙালি, আমার সাথের সৈন্যরাও বাঙালি। তবে এখানে যে অন্যান্য সৈন্য রয়েছে তারা বিশেষ রণসজ্জায় সজ্জিত, সামান্য উসকানিতে চরম রক্তক্ষয় হতে পারে। আমাদের উপর বিশ্বাস রেখে ব্যারিকেড সরিয়ে নিন।" নেতাদের কথা জনতা মেনে নিল না। আমাদের ব্যাটালিয়ান কমান্ডার লেঃ কঃ মাসুদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার আরাবাব ক্রুদ্ধস্বরে লেঃ কঃ মাসুদকে বললেন, "মইন কেন আপসের কথাবার্তা বলছে?" আরও বললেন, 'প্রয়োজন হলে তিনি নিজেই সৈন্যবাহিনীর কমান্ড নিবেন।' এমন সময় জনতার মধ্য থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল। সতর্ক করবার জন্য গুলি ছুড়বার পূর্বাভাস হিসেবে আমি আমার কোম্পানির হাবিলদার নূর মোহাম্মদকে মাটির দিকে গুলি ছুড়তে বললাম। ব্রিগেডিয়ার ক্ষিপ্ত হয়ে আমার দিকে চেঁচিয়ে বললেন, "ফায়ার ফর অ্যাফেক্ট।" আমি তাঁর হাবভাব দেখে বুঝতে পারলাম যে, উনি আমাদের আনুগত্য যাচাই করতে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে কোনো সময় দিতে চাচ্ছিলেন না যাতে আমি জনতাকে বুঝিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের সরিয়ে দিতে সক্ষম হই।

ইতিমধ্যে আরও একটি ঘটনার খবর আসলো। টাঙ্গাইলে আমাদের যে কোম্পানি ছিল তারা একটি তিন টনের ট্রাক জয়দেবপুরে পাঠিয়েছিল। সিদ্দিকুর রহমানের নেতৃত্বে এই ট্রাকটি পাঁচজন সৈন্যসহ জয়দেবপুর বাজারে পৌঁছালে জনতা তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে চারজনকে ধরে নিয়ে যায়। একজন কোনোক্রমে পালিয়ে এসে ঘটনার বিবরণ দেয়। এই পাঁচটি অস্ত্র ছিল এসএমজি। জনতার মধ্য থেকে কম করে একটি অস্ত্র ব্যবহার করবার চেষ্টা চলছিল। জনতার একটি অংশ আমার কোম্পানির পাকিস্তানি সুবেদার মোহাম্মদ আইয়ূবের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে সুবেদার আইয়ুব গুলি চালায়। ব্রিগেডিয়ার আরবাব পুনরায় আমাকে "অ্যাফেক্টের" জন্য গুলি চালাতে বললেন। পরিস্থিতির আরও অবনতি যাতে না ঘটে তার জন্য আমি বাংলায় শূন্যে ও মাটিতে গুলি ছুড়তে বললাম। জনতা ক্রমে ক্রমে সরে গেল। ব্রিগেডিয়ার আরবার ঢাকায় ফিরে গিয়েই লেঃ কঃ মাসুদের কাছে জানতে চাইলেন যে এত গুলি চালানো সত্ত্বেও মাত্র দুজন নিহত হলো কেন? আমি লেঃ কঃ মাসুদ সাহেবকে জানালাম যে আমাকে যদি ঢাকায় সরিয়ে নেয়া হয় তা হলে আমি যাবো না। এবং আমি যে পরিকল্পনা সৈন্যদের মনোভাব জানতে পেরে আপনাকে জানিয়েছি তা বাস্তবায়িত করবো। পরে জানতে পেরেছি জিওসি মেঃ জেঃ খাদেম হোসেন রাজা, আমি যার এ.ডি.সি. ছিলাম। তাঁর বাধাদানের জন্য ব্রিগেডিয়ার আরবাব আমার প্রতি কোনো 'অ্যাকশন' নিতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, আমি একসময়ে তাঁর ছাত্রও ছিলাম এবং আমাদের দীর্ঘদিনের পারিবারিক পরিচয় ছিল।

ঐদিন সন্ধ্যায় জয়দেবপুরে কারফিউ ঘোষণা করা হলো এবং দুটি কোম্পানি ও হেডকোয়ার্টার কোম্পানিসহ কারফিউ রক্ষার জন্য জয়দেবপুর বাজার, চৌরাস্তা এলাকা ইত্যাদি স্থানে মোতায়েন করা হলো। আপাতত: কারফিউ ২১ মার্চ পর্যন্ত বলবৎ করা হলো। পরিস্থিতির উন্নতি হলে কারফিউ উঠিয়ে নেবার চিন্তা করা হবে। ১৯ মার্চ লেঃ কঃ মাসুদকে জানালাম বিদ্রোহের পক্ষে জে.সি.ও., এন.সি.ও ও সিপাহিদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। ইতিমধ্যে এমপি শামসুল হক (পরে মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত), আজিজুল হাকিম মাস্টার, স্থানীয় নেতা হাবিবুল্লাহ ও শ্রমিকনেতা মোতালেব লেঃ কঃ মাসুদের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকে বসলেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯ মার্চ রাতে আমি যখন কারফিউ এলাকায় কর্মরত ছিলাম তখন এমপি শামসুল হকের (পরে মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত) সাথে বাজারে আমার বিস্তারিত আলাপ হয়। আমি তাঁকে ইঙ্গিত দিই যে আমরা দেশবাসীর সাথে রয়েছি। কোন সময় ও কীভাবে কার্যক্রম নেয়া হবে তা আমরা সময়মত জানাবো। খেয়াল রাখবেন যে জনতা যাতে পরিস্থিতির অবনতি না ঘটায়, কেননা এতে পাকিস্তান বাহিনী আমাদের প্রস্তুতির পূর্বেই আঘাত হানতে সমর্থ হবে।

ব্রিগেডিয়ার আরবাব জয়দেবপুরে এসেছিলেন সৈন্যবাহিনীর অবস্থা দেখতে। তিনি পরিষ্কার ধারণা নিয়ে গেলেন যে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করা সহজ হবে না। পাকিস্তানের মেজর সালেক তার 'Witness to Surrender' গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠায় এ-কথা উল্লেখ করেছেন। ব্রিগেডিয়ার আরবাব আরও বুঝতে পারলেন যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সত্ত্বেও বাঙালি অফিসার ও সৈন্যরা জাতিভাই'র প্রতি গুলি চালাবে না। কারফিউ বলবতের নামে আমার ও অন্য চারজন অফিসারের সিপাহি অর্ডারলিদেরও স্টেনগান ও রাইফেল দেয়া হলো। তারা এই স্টেনগান ও রাইফেলসহ বাহিনী পরিত্যাগ করে জনতার সঙ্গে যোগ দেয়।

টাঙ্গাইলে অবস্থানরত কোম্পানি কমান্ডার অফিসার ছিলেন পাকিস্তানের মেজর কাজেম কামাল। আরেকজন পাকিস্তানি অফিসার ক্যাপ্টেন নোকভি সেখানে কর্মরত ছিলেন। দুজন পাকিস্তানি অফিসার সেখানে থাকা আমরা নিরাপদ মনে করিনি। ক্যাপ্টেন নোকভিকে লেঃ কঃ মাসুদের মাধ্যমে জয়দেবপুরে আসতে বলা হলো এবং বিভিন্ন অজুহাতে তাকে জয়দেবপুরে রাখা হলো। পরিকল্পনা অনুসারে লেঃ মোর্শেদ (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার)কে টাঙ্গাইলে পাঠানো হলো এবং যাওয়ার পূর্বে তার অংশের সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা আমি তাকে জানালাম।

১৯ মার্চে আমাদের বাহিনীর কার্যকলাপে পাকিস্তানিদের কাছে পরিষ্কার হলো যে দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টে বিদ্রোহের অবস্থা বিরাজ করছে ('Witness to Surrender' দ্রষ্টব্য)। পাকিস্তান বাহিনীর কর্মকর্তারা লেঃ কঃ মাসুদকে সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ২৪ মার্চ আমাদের জানানো হলো যে ব্রিগেডিয়ার এম. আর. মজুমদার, তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেন্টার কমান্ডার, তিনি ২৫ তারিখ সকালে জয়দেবপুরে ব্যাটেলিয়ান দরবার করবেন। তিনি জানালেন যে লেঃ কঃ মাসুদকে সরিয়ে আরেকজন বাঙালি অফিসার লেঃ কঃ রকীবকে নিয়োগ করা হয়েছে। লেঃ কঃ মাসুদকে সরিয়ে নেবার জন্য আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে কেননা তাঁর প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা ছিল।

দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহ প্রস্তুতির দ্রুত সম্পাদন করার প্রয়োজন দেখা দিল। আমি, ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান, ক্যাপ্টেন নাসিম ও ক্যাপ্টেন এজাজ সৈন্যবাহিনী ও সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছিলাম। নতুন অধিনায়ক লেঃ কঃ রকীব বিদ্রোহের ব্যাপারে কতখানি আগ্রহান্বিত সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত ছিলাম না। মেজর মোহাম্মদ সফিউল্লাহ টাঙ্গাইলে না যাওয়ায় অবশ্য প্রস্তুতির সপক্ষে কাজ করবার সুবিধা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় সতর্কতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আমরা সার্বক্ষণিক বিশ্বস্ত সৈন্যদের নিয়োগ করেছিলাম। আমরা সতর্কতার সঙ্গে কাজ করেছিলাম এইজন্য যে সদর দফতর ছাড়াও রাজেন্দ্রপুর অমুনিশন ডিপো এলাকায় কিছু পাকিস্তানি সৈন্য ছিল। আমাদের আরেকটি সমস্যা ছিল যে দেশের অন্যত্র যেসব বাঙালি বাহিনী ছিল—যেমন যশোরে ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট ব্যাটালিয়ান, রংপুরে ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং কুমিল্লায় ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট, তাঁরা যে কী করতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারস ঢাকার সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল না, কেননা ব্রিগেড হেকোয়ার্টারস আমাদের ওয়ারলেস সেটের চ্যানেল পরিবর্তন করে দিয়েছিল যাতে আমরা কোনো সংবাদ 'ইন্টারসেপ্ট' করতে না পারি। তা ছাড়া ওয়ারলেস সেট চালনা করত পাকিস্তানিরা। নিজেরা না গিয়ে পাকিস্তানি মেজর লতিফ, যার চেহারা বাঙালিদের মতো, তাকে পাঠানো হলো। সাথে গেল বাঙালি ড্রাইভার, যাকে বলে দেওয়া হলো মেজর লতিফ কী করে সেটা ফিরে এসে জানাতে। মেজর লতিফকে এইজন্য পাঠানো হয়েছিল যে বাঙালি ভেবে পাকিস্তানি সৈন্যরা তার সাথে প্রাথমিক ব্যবহার কীরকম করে এবং তার পাকিস্তানি পরিচয় জানবার পর মেজর লতিফ আমাদের সম্পর্কে কী বলেন। আমরা যে শঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটলো। টঙ্গীতে পাহারারত পাকিস্তানি সৈন্য তাঁকে বাঙালি ভেবে বন্দুক উঁচিয়ে তাদের কমান্ডারের কাছে নিয়ে যায় এবং মেজর লতিফ আমরা কে

কোন ঘরে থাকি তার একটা নকশা পাকিস্তানি কমান্ডারের কাছে দেয়। এসব ঘটনা ড্রাইভারের কাছ থেকে জানতে পারলাম।

২৮ মার্চে আমরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে জয়দেবপুর ত্যাগ করবো বলে নির্ধারণ করলাম। আমাদের যে প্লাটুন দুটি অর্ডিনেন্স ফ্যাক্টরি ও রাজেন্দ্রপুর অ্যামুনিশন ডিপোতে ছিল তাদের এবং মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্টাবুলারির ৭০ জনের মতো বাঙালি সৈন্য ঐ এলাকায় ছিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হলো। সৈনিকদের পরিবারকে সরিয়ে নেয়ার জন্য ইউনিটের মওলানাকে ভার দেয়া সাব্যস্ত হলো। সিদ্ধান্ত হলো যে পাকিস্তানী অফিসারদের বন্দি করে কোয়ার্টার গার্ডস সেলে রাখা হবে। ঠিক সন্ধে সাড়ে সাতটায় নির্ধারিত স্থানে সমস্ত সৈন্য জড়ো হবে এবং টাঙ্গাইল অভিমুখে যাত্রা করা হবে। গাজীপুর ও রাজেন্দ্রপুরে ক্যাপ্টেন আজিজকে পাঠানো হলো সিদ্ধান্ত জানাতে যে ২৮ মার্চ রাত্রিতে বিস্ফোরক দিয়ে ডিপোর দরজা ভেঙে চাইনিজ রাইফেলগুলো শ্রমিকনেতা মোতালেবের মাধ্যমে জনতার মধ্যে বিতরণ করা হবে। আমাদের উপদেশমতো ২৮ তারিখে সকাল দশটায় নতুন কমান্ডার লেঃ কঃ রকীব দরবারে জানালেন যে ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলে আমাদের সৈন্যরা ভীষণ চাপের মুখে রয়েছে। ফলে কিছু সৈন্য টাঙ্গাইলে পাঠাতে হচ্ছে। দিনের মধ্যভাগে মেজর শফিউল্লাহ টাঙ্গাইল অভিমুখে চলে গেলেন। সাথে গেলেন ত্রিশজনের মত সৈন্য, কিছু অস্ত্র, একটা ডজ গাড়ি ও জিপ। মেজরদের মধ্যে আমি রয়ে গেলাম পরিকল্পনা অনুসারে অবশিষ্ট তিনশোর অধিক সৈন্য নিয়ে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করতে।

এ পর্যন্ত আমরা প্রকাশ্যভাবে আদেশ অমান্য করিনি। লেঃ কঃ রকীবের উপর আমরা ভরসা পাচ্ছিলাম না। পরিকল্পনার বিস্তারিত বিষয় নাসিম, আজিজ, এজাজ ও ইব্রাহিমের মধ্যেই সীমিত রাখা হল। ২য় লেঃ ইব্রাহিমকে অ্যাডজুটেন্ট অফিসে বসিয়ে রাখা হলো, অবস্থা যে স্বাভাবিক এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি করতে এবং পাকিস্তানী অফিসাররা যাতে টেলিফোন ব্যবহার করতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে। আমি মূল কোঅর্ডিনেশন করার কাজ হাতে রাখলাম। জয়দেবপুর চৌরাস্তার মোড়ে মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রসহ এক প্লাটুন সৈন্য মোতায়েন করা হলো। দুপুরের দিকে ইউনিটের মওলানার সঙ্গে আমি সৈনিকদের পরিবারকে ছয় মাইল দূরে একটি গ্রামে পাঠিয়ে দিলাম। রসদপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈনিকদের টাঙ্গাইল যাত্রার জন্য আমাদের ইউনিটের গাড়ি ছাড়াও আরও গাড়ির প্রয়োজন ছিল। মেশিনটুলস ফ্যাক্টরির শ্রমিকনেতা মোতালেবের সঙ্গে লেঃ ইব্রাহিমকে যোগাযোগ করতে বলা হলো। মোতালেব ফ্যাক্টরির কয়েকটি ট্রাক ও মাইক্রোবাস জোগাড় করে দিলেন।

ইতিমধ্যে আমাদের কার্যকলাপে পাকিস্তানি অফিসার ও সৈন্যরা বিদ্রোহের আন্দাজ করেছে বলে লেঃ কঃ রকীব জানালেন ও বিদ্রোহের সময় পিছিয়ে দিতে চাইলেন। ইতিমধ্যে আমাদের ময়মনসিংহ কোম্পানি সেখান থেকে জানালো যে ২৭/২৮ মার্চ রাত্রিতে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ময়মনসিংহের ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলসের উপর হামলা চালিয়েছে। লেঃ কঃ রকীবের প্রস্তাব মানা সম্ভব ছিল না কাজেই ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান দুপুরের দিকে গাজীপুর ও রাজেন্দ্রপুরে গিয়ে নায়েব সুবেদার আবদুল মোমেন (শহীদ) যিনি রাজেন্দ্রপুরে ছিলেন এবং সুবেদার চান মিঞা (এখন মৃত) যিনি গাজীপুরে ছিলেন তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে আসলেন। পরিকল্পনা অনুসারে গাজীপুর ও রাজেন্দ্রপুরে বিদ্রোহ ঘটলো। গাজীপুর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হলো। জয়দেবপুরে আমাদের নির্দেশমতো সন্ধ্যা থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা হলো। ক্যাপ্টেন আজিজ একটা প্লাটুন নিয়ে বেরিয়ে চৌরাস্তার মোড়ে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন সম্ভাব্য পাকিস্তানী আক্রমণ রুখতে। অন্ধকারে সৈন্য বাহিনী পূর্বনির্দেশ অনুসারে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। সাড়ে সাতটার ভেতরে আমাদের সবারই জয়দেবপুর পরিত্যাগ করার কথা। কিন্তু লেঃ কঃ রকিব যাত্রার সময় পিছিয়ে দেবার প্রস্তাবে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে কিছু সৈন্যের প্রস্তুতিতে বিলম্ব ঘটলো। আমি অনতিবিলম্বে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম। অবস্থার আঁচ করে দু'জন পাকিস্তানী সৈন্য তাদের ওয়ারলেস জীপ থেকে আমাদের পাহারারত সৈনিকদের প্রতি গুলি বর্ষন শুরু করলো। ফলে আমাদের সৈন্যরা পাল্টা গুলি চালাতে বাধ্য হয় এবং পাকসৈন্যদের নিরস্ত্র করা হয়। এ সময়ে অন্ধকারে আমি দেখলাম ক্যাপ্টেন নকভীকে অফিসারদের মেসের উপরতলায় চলে যেতে। আমাদের অধিনায়ক লেঃ কঃ রকিবকে কাছাকাছি দেখলাম না। টংগীতে অবস্থানরত পাকিস্তানী সৈন্য যে কোন সময় জয়দেবপুর অভিমুখে আসতে পারে বলে মনে করছিলাম। লেঃ কঃ রকিবকে নিয়ে যাবার জন্য জীপসহ সাইদুল হককে নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করতে বলা ছিল। সৈন্যদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে আক্রান্ত হলে তারা শ্মশান ঘাটে সমবেত হবে। অন্যথায় বয়েজ হাই স্কুলের ময়দানে জমায়েত হবে। গোলাগুলি শুরু হওয়ায় কিছু সৈন্য শ্মশান ঘাটে জমায়েত হয় এবং আগেই যারা বেরিয়ে এসেছিল তারা স্কুল ময়দানে যায়। দুই স্থানেই সিপাহী পাঠিয়ে যোগাযোগ করে স্থান ত্যাগ করবার সময় আমি ড্রাইভার হাবিলদার সাইদুল হককে দেখে অবাক হলাম। সিদ্ধান্ত অনুসারে তার ছয়টার দিকেই লেঃ কঃ রকিবকে নিয়ে লে যাবার কথা ছিল। সাইদুল জানালো যে উনি আসেননি। ক্যাপ্টেন এজাজ লেঃ কঃ রকিবকে খুঁজলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উনাকে পাওয়া গেল না। পরে শুনেছিলাম যে উনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

আর দেরী করা সম্ভব ছিল না। অতঃপর আমি সাইদুল হকের জীপে উঠে চৌরাস্তা থেকে ক্যাপ্টেন আজিজকে উঠিয়ে নিলাম। সৈন্যবাহিনী ইতিপূর্বেই তাদের সকল অস্ত্রশস্ত্র, ভারী কামান, রসদ, ঔষধ-পত্র, সামরিক বাহিনীর গাড়ী, আর, আর, জীপ, মর্টারস ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। পাকিস্তানের সৈন্যরা যাতে বাধা দিতে না পারে তার জন্য সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আমাদের পক্ষে সাথে নেওয়া সম্ভব হলো না সেগুলি আমরা ফায়ারিং পিন সরিয়ে নিয়ে অকেজো করে ফেললাম। অনতিবিলম্বে রাজেন্দ্রপুর ও গাজীপুর এর দ্বিতীয় বেঙ্গলের সৈন্য ও ডিফেন্স কনসটাবুলারির ৭০ জন বাঙালী সৈন্যসহ আমরা টাঙ্গাইলের পথে রওয়ানা হলাম। টাঙ্গাইলে পৌঁছে ক্যাপ্টেন মোর্শেদের কাছে জানতে পারলাম যে মেজর শফীউল্লাহ্ ময়মনসিংহে চলে গেছেন। পথে জনসাধারণ জানালো যে আমাদের কিছু সৈন্য মুক্তগাছার দিকে গেছে। এটা আমাদের পরিকল্পনার বাইরে ছিল। মুক্তগাছায় যেয়ে আমরা মেজর শফীউল্লাহকে নিয়ে ময়মনসিংহের দিকে যাত্রা করলাম। ময়মনসিংহে জমায়েত হয়ে আমরা কমান্ড নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং বাঙালী অফিসারদের মধ্যে মেজর শফীউল্লাহ সবচাইতে সিনিয়র হওয়ায় ব্যাটালিয়ান কমান্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন পর্যায় শুরু হলো।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, বিজয় দিবস সংখ্যা, '৯০; ১৯ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা; ১৪ ডিসেম্বর, '৯০; ২৯ অগ্রাহায়ন '৯৭।

হে স্বাধীনতা তোমাকে পাওয়ার জন্য

স্বাধীনতা রক্তক্ষয় ব্যতিরেকে আসে না। কবি শামসুর রাহমানের ভাষায় "তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্য আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়"। বিনা রক্তক্ষয়ে পৃথিবীতে কোনো স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি। নেপোলিয়ান বলতেন (Give me blood I will give you freedom) আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। তবে এই রক্তক্ষয় সুপরিকল্পিত হতে হবে। লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে, স্থিরচিত্তে এবং সুনিশ্চিত পরিকল্পনার মাধ্যমে রক্তদানের প্রস্তুতি নিতে হবে স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে। পরিকল্পনাহীন চেষ্টায় কেবল অর্থহীন রক্তই ক্ষয় হয়। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সনে যে বিজয় অর্জিত হয় তা এসেছে অনেক রক্তের বিনিময়ে। বাংলাদেশের নবীনদের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ধারণা নেই, তাই স্বাধীনতার মূল্যবোধকে উজ্জীবিত রাখা এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রেরণার জন্য স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসকে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধকরণ ও সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

আজকাল কোনো কোনো মহলে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে প্রকৃত দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখার মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের স্বল্পতার জন্যই এ-রকম ঘটছে বলে আমি মনে করি। তাই মুক্তিযুদ্ধের তথ্যনির্ভর ইতিহাস প্রণয়ন করা ও জনসমক্ষে তুলে ধরা প্রয়োজন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্রবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি অফিসার ও অন্যান্য সদস্য, যথা সামরিক বাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসারবাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসে এবং পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পাশাপাশি তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলা এবং অস্ত্রশস্ত্র,

গোলাবারুদ ও রসদসামগ্রী জোগাড় করবারও পদক্ষেপ নেয়। সশস্ত্র বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসার সময় আমাদের নিয়মিত বাহিনীকে পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে যে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয় তাতে আমাদের অনেক বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো নষ্ট হয়। তবে জয়দেবপুরে অবস্থানত সামরিক বাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পরিকল্পিত ও অক্ষত অবস্থায় আনতে পেরেছিল। কুমিল্লায় অবস্থানরত ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল, রংপুরে ৩য় বেঙ্গল ও চট্টগ্রামে অবস্থিত ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মোটামুটি ভালো অবস্থায় ছিল। কিন্তু যশোরে অবস্থিত ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অনেকেই বিদ্রোহকালে শহীদ ও গ্রেফতার হন। এ রেজিমেন্টকে নতুন করে সংগঠিত করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। এ ছাড়া বিডিআর, পুলিশ ও আনসারবাহিনীর যাঁরা পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ এড়িয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন, তাঁদের সকলকে মুক্তিযুদ্ধের নিয়মিত বাহিনীর কমান্ডভুক্ত করে পাকিস্তানের সুসজ্জিত ও ব্যাপক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা করবার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পরিকল্পনায় সৈন্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সহজ মনে হয়, কিন্তু বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ দুঃস্বপ্নের মতো।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে আমাদের রসদ, গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের কোনো নিয়মিত ব্যবস্থা ছিল না। আমরা যে-সমস্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম তা নিয়মিত দীর্ঘযুদ্ধের জন্য অপর্যাপ্ত ছিল। তাই প্রথম পর্যায়ে অস্ত্রসংগ্রহের জন্য উদ্যোগ নেয়া ছিল অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়া ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে রণকৌশলের জন্য আমরা 'সেট পিস' (Set Piece) যুদ্ধ পরিহার করতে চেষ্টা করি। পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য আমরা স্বাভাবিকভাবেই মূলত গেরিলাপদ্ধতির আশ্রয় নিই। এর উদ্দেশ্য ছিল শত্রুবাহিনীর মনোবল ভেঙে ফেলা ও সরবরাহব্যবস্থা বিনষ্ট করা। গত ভিয়েতনাম যুদ্ধে গেরিলা-পদ্ধতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মিত বাহিনীর ৬ লক্ষ সৈন্যকে নাজেহাল করে মনোবল ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের মনোবল ক্রমে ক্রমে এমনই ভেঙে পড়ে যে ভিয়েতনামের মুক্তিবাহিনী তাদেরকে ছোট ছোট সম্মুখসমরে পরাজিত করে এবং অবশেষে মার্কিন সৈন্যরা হটে যেতে বাধ্য হয়। পরে চূড়ান্ত পর্যায়ে ভিয়েতনামের নিয়মিত বাহিনী সায়গন দখল করে নেয়।

স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে প্রাথমিক পর্যায়ের পর আমরা পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীকে মোকাবেলার জন্য প্রচলিত ছোট ছোট 'সেট পিস' (Set piece) যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। আমি দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টসহ জয়দেবপুর

ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমে ময়মনসিংহ পরে সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় হেডকোয়ার্টার্স স্থাপন করি। সমস্ত যুদ্ধকালীন সময়ে তেলিয়াপাড়ার আশপাশে দ্বিতীয় বেঙ্গলের মূল ছাউনি ছিল। আমি জুন মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত বাহিনীর কিছু অংশ নিয়ে মুকুন্দপুর, হরসপুর ও মনতলা এলাকায় সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাইওয়েতে পাকিস্তান বাহিনীকে পর্যুদস্ত ও যোগাযোগব্যবস্থা নষ্ট করায় নিয়োজিত ছিলাম। তদানীন্তন সংসদ সদস্য কর্নেল (অবঃ) রব ১২ জুন হরসপুরে এসে আমাকে জানালেন যে মুক্তিবাহিনী প্রধান কর্নেল (অবঃ) ওসমানী আমাকে সত্বর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কলকাতায় যেতে বলেছেন। তিনি আমাকে আরও জানালেন যে যশোর ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসা ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। মাত্র একজন অফিসার ক্যাপ্টেন হাফিজ একশো পঞ্চাশ জনের মতো সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। ১ম রেজিমেন্টকে যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য আরও লোকবল ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে যে নয়জন তৎকালীন মেজরকে কেন্দ্র করে নিয়মিত মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠে তাঁরা হচ্ছেন মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর সফিউল্লা, মেজর মীর শওকত আলী, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর ওসমান চৌধুরী, মেজর নাজমুল হক, মেজর নূরুল ইসলাম, মেজর সাফাত জামিল এবং মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী। এরপর আগস্ট মাসে তিনজন মেজর পাকিস্তান বাহিনী ত্যাগ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। তাঁরা ছিলেন মেজর মঞ্জুর, মেজর তাহের ও মেজর জিয়াউদ্দিন। উক্ত অফিসারবৃন্দের তৎকালীন এবং বর্তমান অবস্থানের একটি তালিকা সংযুক্ত করা হলো :

তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্তব্যরত এই বারোজন মেজরই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অফিসারদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র ছিলেন

ক্রমিক নং	পদবি ও নাম	
১।	মেজর জিয়াউর রহমান (পরে লেঃ জেনারেল) ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট	প্রয়াত রাষ্ট্রপতি
২।	মেজর শফিউল্লাহ (পরে মেজর জেনারেল) ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট	অবসরপ্রাপ্ত (বর্তমানে রাষ্ট্রদূত)
৩।	মেজর মীর শওকত আলী (পরে লেঃ জেনারেল) ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট অবসরপ্রাপ্ত	(বর্তমানে এমপি)
৪।	মেজর খালেদ মোশাররফ (পরে মেজর জেনারেল) ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট	প্রয়াত

৫। মেজর ওসমান চৌধুরী (পরে লেঃ কর্নেল) ইপিআর — অবসরপ্রাপ্ত
৬। মেজর নাজমুল হক, আর্টিলারি ইপিআর — শহীদ
৭। মেজর নূরুল ইসরাম (পরে মেজর জেনারেল)
২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট — অবসরপ্রাপ্ত
৮। মেজর সাফাত জামিল (পরে কর্নেল) ৪র্থ বেঙ্গল — অবসরপ্রাপ্ত
৯। মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী
(বর্তমানে মেজর জেনারেল) — বর্তমানে রাষ্ট্রদূত (ডেপুটেশনে)

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে ১৯৭১-এর আগস্ট মাসে যে তিনজন মেজর যোগ দেন :
১০। মেজর মঞ্জুর (পরে মেজর জেনারেল) — প্রয়াত
১১। মেজর তাহের (পরে কর্নেল) — প্রয়াত
১২। মেজর জিয়াউদ্দীন (পরে লেঃ কর্নেল) — অবসরপ্রাপ্ত

মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অবসরপ্রাপ্ত ছুটি ভোগের সময় স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দেন। পরে সামরিক বাহিনী থেকে মেজর জেনারেল হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

এই বারোজনের সঙ্গে অফিসার পর্যায়ে ছিলেন আরো অনেক ক্যাপ্টেন ও লেফটেন্যান্ট। তাঁরাও মুক্তিবাহিনী সংগঠিত করার জন্য বিশেষ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মেজর ও ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীতে কয়েকজন বাঙালি লেঃ কর্নেল পর্যায়ের অফিসারও ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন কারণে স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগদান করতে সক্ষম হননি। স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রারম্ভেই নিয়মিত ব্যাটালিয়ান তৈরি করা, প্রশিক্ষণ দেয়া, সেক্টর ভাগ করা ইত্যাদি প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অভিজ্ঞতার জন্য আমাকে ও শাফাত জামিলকে সেক্টর কমান্ডে না রেখে দুটি নিয়মিত বাহিনীর কমান্ডে শত্রুর সরাসরি মোকাবেলার জন্য অগ্রগামী অবস্থানে রাখা হয়। আমাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তাঞ্চল গঠন করা ও সেগুলি আয়ত্তাধীন রাখা। ফলে আমাকে কয়েকবার পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করতে হয়েছিল।

পূর্বে বলেছি যে জুন মাসের দিকে আমাকে যশোর থেকে আগত প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সংগঠিত করবার ভার দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পাকিস্তান আমলে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার একসময়ে ছিলেন কর্নেল ওসমানী। এই বাহিনীর প্রতি তাঁর যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। আমি কোনো সময় প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলাম না। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর প্রধান কর্নেল

ওসমানীর ইচ্ছায় ও মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থে আমি প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ড গ্রহণ করতে রাজি হলাম।

জয়দেবপুর থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসার সময় আমরা যাবতীয় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ফেলে এসেছিলাম। শুধু অস্ত্র, গোলাবারুদ, সামরিক যানবাহন ও সামরিক পোশাক নিয়ে বেরিয়ে আসি। তাই আমার সাথে বেসামরিক কোনো পোশাক ছিল না। কর্নেল ওসমানীর সাথে দেখা করবার জন্য আমাকে ভারতের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ভারতের মধ্য দিয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য কর্নেল রব আমাকে বেসামরিক কাপড় ও আগরতলা থেকে কলকাতায় যাবার জন্য দিলেন প্লেনের টিকেট। আমি 'মেজর ব্যানার্জি' এই ছদ্মনামের টিকেটে কলকাতায় আসলাম। সেখানে জাকির খান চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রাক্তন উপদেষ্টা ও মন্ত্রী, একটা বুশ শার্ট, ট্রাউজার ও জুতা কলকাতার নিউমার্কেট থেকে কিনে দিলেন এবং হাতে ৫০টি ভারতীয় মুদ্রা দিলেন। স্মৃতি হিসেবে এই শার্ট ও ট্রাউজারটি আমি এখনও রেখে দিয়েছি।

১৩ জুন রাতে কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে যুদ্ধ ও কৌশলাদি সম্পর্কে আলোচনা হলো। আমি পূর্বাঞ্চলের সুবিধা ও অসুবিধার কথা বললাম। আমাদের প্রস্তুতির পর্যায়ও জানালাম। কর্নেল ওসমানী বললেন যে, প্রথম রেজিমেন্টকে গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত রেজিমেন্টের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার জন্য ভাবনাচিন্তা করে আমাকে ভার দেয়া হয়েছে। তিনি আরো বললেন যে, মেজর শাফাত জামিলকে ৩য় ও ক্যাপ্টেন (পরে মেজর) আমিনকে ৪র্থ রেজিমেন্টের ভার দেয়া হয়েছে। এই তিনটি রেজিমেন্ট নিয়ে মেজর জিয়াউর রহমানের কমান্ডে জেড ফোর্স গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আলোচনার সময়ে মুক্তিবাহিনী প্রধানকে আমি আমার মতামত জানালাম যে, সুসজ্জিত পাকিস্তান বাহিনীর মোকাবেলায় আমাদের এখনও সরাসরি সংঘর্ষে অবতীর্ণ হওয়ার সময় আসেনি। কেননা আমাদের বাহিনীতে অনেক নতুন সদস্য আছে যারা এখনও সম্মুখযুদ্ধে অভিজ্ঞ নয়। এমতাবস্থায় সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হলে আমাদের লোকক্ষয় ও মনোবল ভেঙে পড়তে পারে।

আমি কলকাতা থেকে গৌহাটি হয়ে আসামের গারো পাহাড়ের সীমান্তঅঞ্চলে আসলাম। আমার সৈন্যদের অবস্থান ছিল মানকা চরের নিকটবর্তী তেলতালা এলাকার গভীর জঙ্গলে। প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম রেজিমেন্ট নিয়ে মেজর জিয়াউর রহমানের কমান্ডে জেড ফোর্সের সংগঠন ও প্রশিক্ষণ শুরু হলো। প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টে অফিসারদের মধ্যে ছিলেন লেফটেন্যান্ট মান্নান, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন হাফিজ, ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন

ও ফ্লাইট লেঃ লিয়াকত। অফিসারসহ এই বাহিনীর মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৮৫০ যার মধ্যে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, আনসার, শ্রমিক ও ছাত্ররাও ছিলেন। আমি ১৭ জুন থেকে সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণ আরম্ভ করলাম। বিভিন্ন অস্ত্রচালনা থেকে শুরু করে সত্যিকার গোলাগুলির (Live Firing) মধ্যে অগ্রসর হবার প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

আমরা ছিলাম এক গহিন জঙ্গলে যেখানে সরবরাহ ছিল অত্যন্ত দুরূহ। আমাদের অবস্থান থেকে সবচাইতে নিকটবর্তী শহর ছিল 'তুরা' যার দূরত্ব ছিল প্রায় ৩০ কিলোমিটার। নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল ছিল আমাদের খাদ্যক্রয়ের স্থান। অন্যান্য রসদপত্র ও সামগ্রী তুরা শহর থেকে সংগ্রহ করা হতো। এই অঞ্চলে ভারতীয় 101 Communication Zone কমান্ড করতেন মেজর জেনারেল গুরবত সিং গিল। স্বাধীনতাযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি গুরুতররূপে আহত হন। তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল। সমস্ত বাধা বিপত্তির মধ্যেও গারোপাহাড়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আমরা প্রশিক্ষণ পূর্ণ উদ্যমে চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মেজর জিয়া আমাকে বললেন যে, পাকিস্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি কামালপুর সম্মুখ যুদ্ধ করে দখল করতে হবে এবং ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে যুদ্ধে যেতে হবে। আমি তাঁকে বললাম যে, এ পর্যায়ে বড় আকারে Set Piece যুদ্ধে আমাদের যাওয়া ঠিক হবে না। আরও অধিক যুদ্ধ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আমরা যেভাবে 'হিট এন্ড রান' পদ্ধতিতে ছোট ছোট দল দিয়ে আক্রমণ করছি এটা আরও কিছুদিন চালিয়ে যেতে হবে। আমি আরও বললাম যে, কোম্পানির (৯৫০ জন সম্মিলিত) শক্তির উর্ধ্বে Set Piece আক্রমণে যাওয়া এই পর্যায়ে আত্মঘাতি হবে। পুরো ব্যাটালিয়নকে অধিক সজ্জিত পাকিস্তানী ব্যাটালিয়ানের সামনে পাঠানো ঠিক হবে না। এতে সমগ্র ব্যাটালিয়ানের যুদ্ধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমার যুক্তি মেজর জিয়া গ্রহণ করলেন বলে মনে হল না। কোম্পানী পর্যায়ের আক্রমণের নেতৃত্ব দেয় কোম্পানী অধিনায়ক। কোম্পানী পর্যায়ের উর্ধ্বে আক্রমণ না করার কথা বলায় আমার মনে হল যে মেজর জিয়া হয়তো ভাবতে পারেন আমি নিজে আক্রমনের নেতৃত্বে দিতে চাই না। কেননা ব্রাটালিয়ান পর্যায়ে যুদ্ধ করলে অবশ্যই আমাকে নেতৃত্ব দিতে হবে। আমাদের প্রস্তুতি পর্যায়ে ও যুদ্ধের কলাকৌশল বিবেচনা করেই আমি এ কথা বলেছিলাম। যা হউক আমি আমার উচ্চ কমান্ডের নির্দেশ মেনে নিলাম।

কামালপুরে পাকিস্তান সৈন্য বাহিনীর একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। ৩১ বেলুচ রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি ও ই পি এ এ এফ (ইষ্ট পাকিস্তান সিভিল

আর্মড ফোর্স) এর দুই প্লাটুন এই ঘাঁটিতে ছিল। এই ঘাঁটিটি সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ এই স্থানটি জামালপুর, টাঙ্গাইল ও ঢাকার যোগাযোগ সড়কের উপর অবস্থিত ছিল। আক্রমণ প্রস্তুতির অংগ হিসাবে রেকি (Recommaissance) করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। সুযোগ বুঝে এই কাজ করবার জন্য ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন ও লেঃ মান্নানের নেতৃত্বে ছয় জন সৈন্য সহ একটি দল ঘঠন করা হলো। আক্রমণের দিক নির্ণয়, বাংকারের অবস্থান, কতজন সৈন্য থাকতে পারে, কি জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার হতে পারে, কোথাও মাইনফিল্ড ও অন্যান্য বাধাবিপত্তি আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় জানাই লি উক্ত রেকির উদ্দেশ্য। কয়েকদিন ধরেই এই সমস্ত প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল। আক্রমনের তিন দিন আগে আমাদের রেকি দলটি পাকবাহিনীর ক্লোজ-আপ নেবার জন্য খুব কাছে আসে এবং অন্ধকারে ঘাঁটি এলাকার ভিতরে ঢুকে পড়ে। এই সময় একটি পাকিস্তানী পাহারাদার সৈন্যের সামনা সামনি পড়ে যাওয়ায় তাকে আক্রমণ করে রেকি বাহিনী মেরে ফেলে ও তার রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে চলে আসে।

এরকম একটা ঘটনা ঘটবে তা আমি চাইনি। কেননা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ অতর্কিতে পাকিস্তান ঘাঁটিতে আক্রমণ চালানো। এই ঘটনার ফলে পাকিস্তান সৈন্যরা নিকটেই আমাদের অবস্থানের আভাস পায় এবং অতর্কিত আক্রমনের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সতর্ক হয় ও প্রস্তুতি নিতে সুযোগ পায়। রেকি করবার পরে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন ও লেঃ মান্নান আক্রমনের পক্ষে মতামত দেন। এরপর আমরা দীর্ঘ বৈঠকে সকল সম্ভবতার কথা আলোচনা করি ও আক্রমনের বিস্তারিত পরিকল্পনাপ্রনয়ণ করি। বৈঠক কালে মাটির উপর এলাকার একটি মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়, ঘাঁটি আক্রমনের অংশগুলি চিহ্নিত করা হয় এবং রাত সাড়ে তিন ঘটিকা, ৩১ জুলাই অভিযানের সময় ও তারিখ নির্ণয় করা হয়।

পূর্ব নির্দ্ধারিত আক্রমনের রাত্রে মেজর জিয়া সহ ব্যাটালিয়ন নিয়ে আমাদের আস্তানা ছেড়ে পাকিস্তানী অবস্থানের দিকে যাত্রা করি এবং রাত্রি দুইটার দিকে পাকিস্তানি ঘাঁটি থেকে এগার/বারশো গজ দূরে বাঁশ ঝাড় ও ঝোপের ভিতরে একত্রিত হই। আক্রমণে অগ্রসর হবার পূর্বে আমরা সেখানে পরিকল্পনা চুড়ান্ত করে নেই। প্রস্তুতিপর্ব ৩০/৪০ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হয়। এখান থেকে একটি কোম্পানী ক্যাপ্টেন মাহবুব (শহীদ)-এর নেতৃত্বে শত্রু কোম্পানীর পিছনে ডানদিকে প্রায় ৮০০ গজ দূরে অবস্থান নিয়ে আমার আদেশের অপেক্ষায় থাকতে বলা হয়। অন্য দুটি কোম্পানি যথাক্রমে ক্যাপ্টেন

হাফিজ ও ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন-এর নেতৃত্বে ছয়শো গজের মতো এগিয়ে গিয়ে একটি কেটে নেয়া পাট-ক্ষেতের মধ্যে অবস্থান নিতে নির্দেশ দিলাম। ফ্লাইট লেঃ লিয়াকত, লেঃ মান্নান ও আমার ওয়ারলেস অপারেটরসহ আমি তাদের সঙ্গে একই স্থানে অবস্থান নিলাম। এদিকে বৃষ্টি হওয়ার জন্য পাটক্ষেতের মধ্যে প্রায় এক ফুটের মতো পানি জমে ছিল। এই প্রাকৃতিক ঘটনাটি আক্রমণের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। এই মুহূর্তে আক্রমণ স্থগিত রাখারও কোনো উপায় ছিল না। কেননা পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে আমাদের অবস্থান নেবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পাহাড়ে বসানো হালকা কামানের গোলাবর্ষণ শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে শত্রু বাহিনীও তাদের কামানের গুলিবর্ষণ আরম্ভ করলো। এতে আমার বুঝতে বাকি রইলো না যে, তারা আমাদের আক্রমণ প্রতিহতের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। একথাও বোঝা গেল যে তারা ইতিমধ্যে সৈন্যসংখ্যা ও গোলাবর্ষণক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। এতৎসত্ত্বেও আমি আমার সৈন্যদের অগ্রসর হবার জন্য নির্দেশ দিলাম। তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটা। দুটি কোম্পানির একটি ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন ও আরেকটি ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে শত্রুর ঘাঁটির দিকে দ্রুতবেগে বীর বিক্রমে অগ্রসর হল। সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে দুই প্লাটুনের মতো সৈন্য সুরক্ষিত শত্রুঘাঁটিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। যত সময় যেতে লাগলো শত্রুর গোলাগুলির মাত্রা ততই বেড়ে চললো। আমি দেখতে পেলাম যে, আমাদের হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছে। এদিকে কামালপুরে শত্রুব্যূহের মধ্যে হাতাহাতি এমনকি বেয়নেটের ব্যবহারও শুরু হল।

আমি আমাদের আক্রমণরত সেনাবাহিনীকে নির্দেশ প্রদান ও সমন্বয় রক্ষা করবার জন্য নিকটস্থ একটি ছোট গাছের আড়াল থেকে বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করছিলাম। এই সময় একজন আহত সৈন্য আমাকে জানায় যে, ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন শত্রু-ঘাঁটির ভিতরে শাহাদত বরণ করেছেন এবং তাঁর সাথে অনেক সৈন্যও হতাহত হয়েছেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, সালাউদ্দীনের কোম্পানির আর বিশেষ যুদ্ধক্ষমতা নেই। তাই আমি বেতার মাধ্যমে ক্যাপ্টেন মাহবুব, যাকে শত্রুঘাঁটির ডানদিকে পিছনে আমার আদেশের অপেক্ষায় থাকতে বলেছিলাম, তার সঙ্গে যোগাযোগ করে বলতে চেষ্টা করলাম যে সে যেন এখন তার দিক থেকে শত্রুঘাঁটির উপর আক্রমণ আরম্ভ করে।

কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় আমি ওয়ারলেস অপারেটরকে নিয়ে একটু খোলাস্থানে সরে গিয়ে আবার যোগাযোগ করতে চেষ্টা করলাম। এই সময় আমার ওয়ারলেস অপারেটর মেশিনগানের একঝাঁক গুলিতে শাহাদত

বরণ করে এবং ওয়ারলেস সেট অকেজো হয়ে যায়। আমি পুনরায় গাছের আড়ালে এসে চিৎকার করে আদেশ দিতে থাকলাম। ইতিমধ্যে চারদিকে ভোরের আলো ফুটে উঠলো। একটু দূরে দেখি ক্যাপ্টেন হাফিজও আহত হয়ে পড়ে রয়েছেন। আমি উপায়ান্তর না দেখে ফ্লাইট লেঃ লিয়াকত ও অন্যান্য আহত সৈনিকদের উদ্ধারকাজ আরম্ভ করার জন্য নির্দেশ দিলাম। শত্রুদের গোলাগুলির তীব্রতা পূর্ণভাবে চলছিল। এই সময় মেজর জিয়া এসে আমার সাথে যোগ দিলেন। লেঃ মান্নানও আহত অবস্থায় আমার নিকটে আসলেন এবং জানালেন যে, চারদিকে আমাদের অনেক আহত সৈন্য পড়ে রয়েছে। আমরা সকলে গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যেই আহতদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে শুরু করলাম। শত্রুর জনবল, অস্ত্রবল ও পাকা বাংকারে অবস্থানের ফলে আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণ ও অনেক প্রাণের বিনিময় সত্ত্বেও শত্রুকে পরাজিত করে ঘাঁটিটি নিজ দখলে আনা সম্ভব হয়নি।

বীরের মতো যুদ্ধ করে আমাদের অমিতবিক্রমী যোদ্ধাদের অনেকেই একে একে শাহাদত বরণ করেন। যুদ্ধশেষে দেখা যায় ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীনসহ বাংলার অকুতোভয় ৩৫ জন দামাল সন্তান মাতৃভূমির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন এবং ক্যাপ্টেন হাফিজ ও লেঃ মান্নানসহ আরও ৫৭ জন আহত হয়েছেন।

পাকিস্তানের মেজর সালেক তাঁর 'Witness to Surrender' গ্রন্থে দাবি করেছেন যে এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ২০০ সৈন্য মারা যায়। এতেই এই যুদ্ধের ভয়াবহতা ও রক্তক্ষয় সম্পর্কে ধারণা করা যায় এবং শত্রুপক্ষেরও ক্ষয়ক্ষতির আভাস পাওয়া যায়। আহতদের নিয়ে আস্তানায় ফিরে আসার সময় দুটি পাকিস্তানি হেলিকপ্টারকে সম্ভবত তাদের যুদ্ধে মৃত ও আহত সৈন্যদের নেবার জন্য আসা যাওয়া করতে দেখলাম। পরের দিন ভারতীয় আর্মি প্রধন জেনারেল মানিকশ হেলিকপ্টারযোগে জেডফোর্স হেডকোয়ার্টার্সে আসেন এবং আমাদের সাহসিকতার বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি একপর্যায়ে বলেন যে, পাকিস্তানের মতো সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধারা যে এরকম সাহিসিকতার সাথে সম্মুখযুদ্ধ করতে পারেন তা তিনি ভাবতে পারেননি।

এই ঘটনাটি আমি এইজন্য উল্লেখ করতে চাই যে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে গিয়ে কেবল বিজয়ের ঘটনাই উল্লেখ করার প্রবণতা দেখা যায়। আমার মতে এতে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসের প্রতিফলন হয় না। কোনো একটি বিশেষ সংঘর্ষে পরাজিত হওয়ার অর্থ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে পরাজিত হওয়া নয়।

প্রতিটি সংঘর্ষের মূল্যায়ন এই দৃষ্টিকোণ থেকে করতে হবে যে, আমাদের যোদ্ধারা কী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, কর্তব্যে কতটা নিষ্ঠা নিয়ে সাহস, মনোবল ও স্বাধীনতায় কতটুকু বিশ্বাস রেখে অনিশ্চয়তার পথে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে এটিই ছিল সুপরিকল্পিত উল্লেখযোগ্য সম্মুখযুদ্ধ। এই অভিযানটি আমাদের জন্য যুদ্ধের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা প্রদান করে এবং শত্রুকে সরাসরি আক্রমণ করতে প্রেরণা যোগায়। এই যুদ্ধে আমাদের সৈন্যরা যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং হাসিমুখে স্বাধীনতার জন্য শহীদ হয়ে ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের শেষ দিন যে অবিশ্বাস্য আত্মদানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তারই নীরব সাক্ষী জামালপুরের উত্তরে ছোট্ট গ্রাম কামালপুর।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, বিজয় দিবস সংখ্যা ১৯ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ২৯ মার্চ '৯১।

রক্ত, স্বাধীনতা ও ইতিহাস

জুন ১৯৭১। রাজশাহীর সীমান্তবর্তী রোহনপুর আর্মি ক্যাম্প। হাতবাঁধা এক কিশোরকে পাকবাহিনীর এক মেজরের সামনে আনা হল। তার চোখ-মুখ ফোলা, জায়গায় জায়গায় আঘাতের দাগ এবং নির্যাতনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। মেজর সাহেবকে জানানো হল যে গত কয়েকদিন বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এই 'মাক্ষিটা' (পাকিস্তানিরা স্বাধীনতাযুদ্ধের আগে থেকেই বাঙালিদের মাছি ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে মজা পেত) কিছুতেই মুখ খুলছে না। মেজর যেন একবার শেষ চেষ্টা করে দেখেন। ভীতি প্রদর্শন এবং নির্যাতনেও কাজ হয়নি দেখে মেজর নতুন কৌশল প্রয়োগ করার প্রায়াসে তাকে সহানুভূতিসূচক গলায় বললেন যে সময়ে তার মা-বাবার কাছে থাকার কথা, সে-সময় কতগুলি বদমাশ লোকের প্ররোচনায় বিপথগামী হয়ে সে তার 'মুসলমান ভাইদের' বিরুদ্ধে লড়ছে। এদের অবস্থান সম্পর্কে যদি সে খোঁজ দেয় তবে তিনি নিজে তার বাড়ি ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। একথার পর সে কিশোর দুহাতে মাটিকে আলিঙ্গন করে সেই হাত ঠোঁটে স্পর্শ করল। তারপর উঠে শান্ত স্বরে বলল— 'আমি এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। আমার রক্ত নিশ্চয়ই পবিত্র মাতৃভূমির স্বাধীনতাকে আরো কাছে নিয়ে আসবে।' ছেলেটিকে এরপর বাইরে নিয়ে যাওয়া হল এবং কিছুক্ষণ পরে একঝাঁক গুলির শব্দ শোনা গেল।

এটা কোনো কাল্পনিক ঘটনার বর্ণনা নয়। আবেগআক্রান্ত কোনো বাঙালির লেখা মুক্তিবাহিনীর প্রশংসার গল্প নয়। পাকিস্তান বাহিনীর সংবাদ সংযোগ অফিসার, মেজর সালেক স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে বাঙালির বহু বীরত্বগাথা চেপে গেলেও উপরোক্ত ঘটনা বোধ করি তাঁর দোষভারাক্রান্ত কলমের

অজান্তেই এসে তার বইয়ে স্থান পেয়েছিল। অবশ্য শেষরক্ষা তিনি করেছেন— গুলির আওয়াজ উহ্য রেখেছেন।

এই মৃত্যু বীরের মৃত্যু। এ তো জীবনভিক্ষা নাকচ হওয়া, কুঁকড়ে পড়ে থাকা মৃত্যু নয় বা অতর্কিত গুলি লেগে লুটিয়ে পড়া মৃত্যুও নয়, স্থিরচিত্তে, কাপুরুষতা পায়ে ঠেলে, আদর্শের ঝাণ্ডা সমুন্নত রেখে মৃত্যুকে নির্ভীক আলিঙ্গন। এ মৃত্যু তাই অনন্য, অম্লান।

কী মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল এ কিশোর— যে মন্ত্রাদর্শে বলীয়ান হয়ে জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য ভাবতে বুকে এতটুকুও কাঁপন ধরেনি তার? এই মন্ত্রই ছিল মুক্তিযুদ্ধের স্পৃহা জাগরূক রাখার পেছনের প্রধান শক্তি। এ মন্ত্র হচ্ছে আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের প্রতি বাঙালির সহজাত বিশ্বাস। তাই জীবন-মৃত্যু সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কর্তব্য নির্ধারণে কোনো সংশয়ের দোলাই তার মনে জাগেনি। বাঙালি মানসের সবচেয়ে বড় সম্পদের মধ্যে একটি হচ্ছে এই বিশ্বাস। যুগ যুগ ধরে এ বিশ্বাস তাকে যুগিয়েছে সংগ্রামী প্রেরণা—অন্যায়ের সঙ্গে যুঝবার মনোবল। স্মরণাতীতকালের কথা বাদ দিয়ে তাই শুধু ইংরেজ এবং পাকিস্তান আমলেই এর একটা খতিয়ান নিয়ে দেখা যাক।

ইংরেজরা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে নিশ্চিন্তে রাজত্ব করে গেলেও এই বাংলার মাটিতে প্রতিনিয়ত বাধা পেয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সংগঠিত বিদ্রোহের বীজ এই পাবনা-রংপুরের ক্ষেতমজুরেরাই সর্বপ্রথম রোপন করে গেছে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যান্য ভারতীয় রেজিমেন্টে বিদ্রোহ বিক্ষিপ্তভাবে হলেও, ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে প্রত্যেকটি বাঙালি রেজিমেন্টে বিদ্রোহ হয়েছে। বাংলার সন্ত্রাসবাদী দল ব্রিটিশ রাজার ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। প্রাণের ভাষায় কথা বলার আন্দোলনে নির্ভীক আত্মত্যাগ এদেশেই ঘটেছে। দেখা গেছে ঐ কিশোরের মতো হাজার হাজার প্রাণের প্রত্যক্ষ এবং সুমহান আত্মদান। এই আত্মদান যদি সংশয়মুক্ত না হত বা কোনো বিক্ষিপ্ত বা খণ্ডিত ঘটনা হত, বা পরোক্ষ আত্মদান হতো, তব ১৯৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসের ধারা নিঃসন্দেহে অন্য খাতে প্রবাহিত হতো।

আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ তুলনামূলক বিচারে স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল সত্য, তাই বলে পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীনতাযুদ্ধের তুলনায় কম রক্তক্ষয়ী হয়নি। এর প্রধান কারণ হিসেবে আগেই বলা হয়েছে যে মুক্তিবাহিনীতে যারা যোগ দিয়েছিল, তারা অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে নয় বরং স্বেচ্ছায় আদর্শ ও দেশপ্রেমে বলীয়ান হয়ে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার তোয়াক্কা না করেই যোগ দিয়েছিল।

আজ পেছনে দৃষ্টিপাত করে এও সত্য বলে প্রতীয়মান হয় যে এই প্রচুর রক্তক্ষরণ, এই তুলনাবিহীন আত্মত্যাগ হানাদার বাহিনীর মনোবল গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল এবং তাদের কথিত 'মাছির' হাতে তাদের লজ্জাকর পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। এই রক্তক্ষরণ না হলে তাদের ইংরেজ-ভূষিত 'জাতযোদ্ধার' শ্রেষ্ঠত্ব ১৬ ডিসেম্বর চিরতরে রমনার রেসকোর্স ময়দানে কবরস্থ হতো না। এবং অন্যদিকে এও আজ বিচারসাপেক্ষ যে মুক্তিবাহিনী নিষ্ঠা এবং ত্যাগের এই অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন না করলে মিত্রবাহিনী আমাদের সাহায্যে কবে এবং কতটুকু এগিয়ে আসত ?

মুক্তিযুদ্ধের দুই-একটা বিবরণ তুলে ধরা বোধহয় প্রয়োজন, যেখানে মুক্তিবাহিনীর জয় এবং পরাজয় দুটোরই দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

জামালপুরের উত্তরে অবস্থিত ছোট একটি গ্রাম— নাম কামালপুর, এইখানে মুক্তিবাহিনীর অবিশ্বাস্য আত্মদানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল জুলাই মাসের শেষ দিনটিতে। কামালপুরে শক্ত ঘাঁটি গেড়েছিল শত্রুরা। রাত তিনটার সময় মুক্তিবাহিনী তাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে। কিন্তু শত্রুর অস্ত্রবল এবং জনবলের দরুন সেই আক্রমণ ও অগ্রযাত্রা সুসংহত করা সম্ভব হয়নি অনেক প্রাণের বিনিময়েও। বীরের মতো যুদ্ধ করে আমাদের অমিতবিক্রমী যোদ্ধারা একে একে মৃত্যুবরণ করতে থাকেন। যুদ্ধশেষে দেখা যায় বাংলার অকুতোভয় ৩৫ জন দামাল সন্তান মাতৃভূমির সম্মানে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন এবং ৫৭ জন আহত হয়েছেন।

আবার ৩০ নভেম্বর তার ঠিক উল্টোটা ঘটে। আখাউড়া সীমান্তের ঘাঁটিদখলের যুদ্ধ দুইদিন স্থায়ী হয় এবং সে যুদ্ধে আমাদের বীর সন্তানরা উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়। যুদ্ধশেষে দেখা যায় আখাউড়া থেকে ঢাকা আসার পথ প্রায় উন্মুক্ত এবং সেখান থেকে শুরু হয় হানাদার বাহিনীর পশ্চাদপসরণ এবং মুক্তিবাহিনীর বিজয়গৌরবে ঢাকার পথে অগ্রযাত্রা, এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর বীরযোদ্ধারা ১২ জন হানাদারকে খতম করা ছাড়াও ৩ জনকে বন্দি করতে সক্ষম হয়।

এ দুটো যুদ্ধের বর্ণনা প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে এই ঘটনা কোনো মেজর সালেকের বইয়ে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি বা ডি কে পালিত বা সুব্রামনিয়াম'এর বইয়ে স্থান পায়নি। অবশ্য না পাওয়ারই কথা। পাকিস্তানিরা তো আর শত্রুর জয়গান লেখার জন্য বই প্রকাশ করেনি, বিশেষ করে সেই শত্রুর হাতে যখন সে পরাজিত। তা ছাড়া বাঙালিদের প্রতি তাদের জাত ক্রোধ এবং অবজ্ঞার কথা তো কারো অজানা নয়। আর ভারতীয়রাই বা বাঙালির

বীরগাথায় তাদের বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করতে যাবে কেন। হবে বইকী, তবে সেই বই সত্যিই যদি কোনোদিন লেখা হয়। আজ ক্ষুব্ধ হতে হয় এই দেখে যে সেই গৌরবোজ্জ্বল যুদ্ধের এত বছর পরেও সে কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়নি। ক্ষুব্ধ হতে হয় এই ভেবে যে সে স্মৃতি আজ জীর্ণ মলিন এবং অচিরেই স্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাওয়ার পথে। কিন্তু কেন হয়নি সেটারও একটা কারণ আছে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পরে বাঙালি আত্মগর্বে এমনই বিভোর ছিল যে স্বাধীনতার সঠিক মুল্যায়নের প্রয়োজন মনে করেনি। ইতিহাসের অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধের ভাগ্যে কিন্তু এ দৈন্যের মুকুট জোটেনি। ইতিহাসের পথে বেশি পেছনে যাওয়ার দরকার হয় না। আজ থেকে মাত্র কয়েক দশক আগে ফ্রান্সে ঘটেছিল এ ঘটনা। মিত্রবহিনীর সাহায্যে ফ্রান্সের মুক্তিবাহিনী তাদের দেশ শত্রু কবলমুক্ত করেছিল। আজ সেখানে গ্রামে স্মৃতিস্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে সেই বীর শহীদদের নাম। সেখানে বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে আজও তাদের নামে গান রচিত হয়। তাদের বীরত্বকীর্তির কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। সেসব যুদ্ধক্ষেত্র আজ তাদের তীর্থস্থান এবং এই বীরযোদ্ধাদের জীবনী আজ তাদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত। মুক্তিবাহিনীর সেই কীর্তিআলেখ্য আজ তাদের পূর্বপুরুষের আত্মদানকে মহিমামণ্ডিত করে আর তাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার প্রেরণা জোগায়। অথচ আজ বিক্ষুব্ধচিত্তে আমাদের দেখতে হয় পালিত ও সুব্রামনিয়াম যে বই লিখেছেন সেখানে তাঁদের নিজেদের বীরত্বকীর্তি আমাদের চেয়ে বেশি লেখা হয়েছে। তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবে আমাদের নিজেদের লেখা বইয়ে আমাদের তরুণদের বীরগাথা নিশ্চয়ই তার স্বীয় মর্যাদায় আসীন হবে। আমাদের যোদ্ধাদের সেই বীরত্বকীর্তি আমাদেরকে কুণ্ঠিত করে। আজ আমরা ভেবে দেখি না যুদ্ধে পরাজয় ঘটলে চিরতরে এক দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধা বাঙালি জাতির বংশধর জন্ম নিত। আর সেই শৃঙ্খল পায়ে নিয়েই তারা মৃত্যুবরণ করত। এই কুণ্ঠার ফলস্বরূপ বাঙালি জাতি সর্বাপেক্ষা গৌরবের বস্তুটি নিয়ে গর্ব করতে ভুলে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে সে না লিখেছে কোনো কালজয়ী সাহিত্য, না সৃষ্টি করেছে কোনো হৃদয়স্পন্দন থামানো ভাস্কর্য, না পদ্মা-মেঘনার তরঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছে দিগন্তপ্রসারী কোনো সুর। এখনও দেখতে হয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক, যশ ও খ্যাতির লড়াইয়ের মারপ্যাঁচ, বারেবারে নতুন করে ইতিহাস লেখা হচ্ছে আর বারেবারে সেই ইতিহাসের পাতা বদলে নতুন পাতার সংযোজন ঘটছে। প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কি কোনোদিনই লেখা হবে না? রাজশাহীর সীমান্তবর্তী আর্মিক্যাম্পে যে কিশোর একঝাঁক গুলির সামনেও মাথা

নোয়ায়নি সে কোন মায়ের আদরের দুলাল তা আমরা আজও জানতে পারলাম না। এ দৈন্য আমরা রাখব কোথায়! এ লজ্জা ঢাকব কী দিয়ে!

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যদি আবার লেখা হয় তবে তা যেন বস্তুনিষ্ঠ এবং পক্ষপাতহীন হয়। এই অমিততেজী দেশমাতৃকার ছেলেরা কী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, কর্তব্যে কতটা নিষ্ঠা নিয়ে, সাহস, মনোবল ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস কতটা দৃঢ় রেখে অনিশ্চিতের পথে ঝাঁপ দিয়েছিল—আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর যেন সেই মূল্যায়নে স্থান পায়। হাজার হাজার শহীদের মতো তা হলে ঐ কিশোরের আত্মাও হয়তো সেদিন শান্তি পাবে।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, স্বাধীনতা দিবস '৮৯; বিশেষ সংখ্যা।